হরর কাহিনি

দানব

অনীশ দাস অপু



হরর কাহিনী

অনীশ দাস অপু

দানব

গুলি ভরা শটগান নিয়ে পার্টিতে হাজির হলো জেনি বার্টন। চোখের পলকে দু'জনকে উড়িয়ে দিল সে। আরও মানুষ হত্যা করতে চাইছিল জেনি, কিন্তু তাকে থামাল তার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী পল্লবী কেয়া পিংকি ও পুলিশ। পরদিন পিংকি জেলে গিয়ে জেনির কাছে জানতে চাইল সে কেন অমন করল। জবাবে জেনি বলল, 'ওরা আর মানুষ ছিল না।' পিংকি প্রথমে ভেবেছিল তার বান্ধবীর মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সে যখন ঘটনার গভীরে প্রবেশ করল, অকল্পনীয় এক আতঙ্কের জগৎ উন্মোচিত হলো তার সামনে।



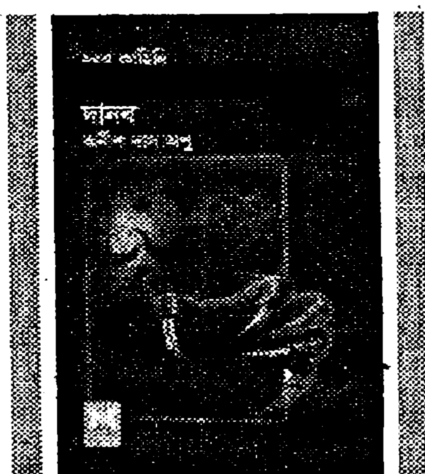
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হরর কাহিনী

দানব

অনীশ দাস অপু





সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-0286-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

রচনা: বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩



একশ' তেতাল্লিশ টাকা

DANOB
A Collection of Horror Stories
By: Anish Das Apu

সূচি

দানব

এক লোককে চিনতাম আমি কোন কিছুতেই ভয় পেত না। ভূত-প্রেতে তার ডর ছিল না, অতিপ্রাকৃত বিষয় তার মনে সৃষ্টি করত হাস্যরস। সাহসই ছিল তার সমস্ত শক্তির উৎস। তবে সবকিছুতে সাহস দেখানো যে ভাল না, বিশেষ করে আমস্টারডামের রাস্তার নিচের অন্ধকার টানেলগুলোতে, এ শিক্ষা সে পায়নি। আর সে জন্যেই...যাক, সে কথা পরে।

তার নাম হেন্‌কে। পিতৃপুরুষের দিক থেকে সে ফিনিশীয়। অনেক আগেই তার বাবা-মা মারা গেছে। তার পরিচিতরা বলে সাহসের ব্যাপারটা হেন্‌কে পেয়েছে পৈতৃক সূত্রে।

হেন্‌কের সঙ্গে আমার পরিচয় ইউরোপ সফরকালে। রাইটার্সব্লকে পড়েছিলাম কিছুদিন ধরে। মাথায় কিছু আসছিল না। তাই মাথা সাফ করতে ব্যাগ-ব্যাগেজ গুছিয়ে নিয়ে সেবার আমি ইউরোপ ভ্রমণে যাই। খরচ বাঁচাতে যে ইয়ুথ হোস্টেলে রুম বুক করেছিলাম, ঘটনাক্রমে সেখানে হেন্‌কে তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ওঠে। ওদের সবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তবে বয়সের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও হেন্‌কের সঙ্গে খুব দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্যপ্রেমী হেন্‌কে গানবাজনা ভালবাসত, আমিও। আর আমি লেখক শুনে সে আমার ব্যাপারে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে।

ইউরোপ সফর শেষে দেশে ফেরার পরেও হেন্‌কের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে ভাটা পড়েনি। ই-মেইলে যোগাযোগটা ছিল। একবার আমার আমন্ত্রণে বাংলাদেশ ঘুরে গেল। কই মাছের কালিয়া, সর্ষে ইলিশ আর কুমড়ো ফুলের বড়াকে ও ঘোষণা করল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার হিসেবে। লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে রিকশায় চক্কর দিল গোটা ঢাকা শহর। যাওয়ার সময় বরিশালের গুঠিয়ার বিখ্যাত গুড়ের সন্দেশ আর কুমিল্লার মাতৃভাণ্ডারের রসমালাই নিয়ে গেল চার বাক্স। ফুর্তিবাজ হেন্‌কে দেশ ঘুরতে খুব ভালবাসত। পরের বার আমি যখন আবার ইউরোপ যাই পুরো ব্যয়ভার বহন করেছে সে। আমাকে একটা পয়সাও খরচ করতে দেয়নি। আমি হেন্‌কের সঙ্গে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশগুলো ঘুরে বেরিয়েছি। কোন্ শহরের লোকাল পাবে সবচেয়ে ভাল বিয়ার পরিবেশন করা হয় আর কোন্ রেস্টুরেন্টের ধারেকাছেও ঘেঁষা উচিত নয়, এসব বিষয়ে হেন্‌কের জানাশোনা ছিল তাক লাগানোর মত।

গত বছর আমি আমস্টারডাম গিয়েছিলাম আন্তর্জাতিক বইমেলায় অংশ নিতে

ওখানকার এক প্রকাশকের আমন্ত্রণে। সে আমার একটি বই ডাচ ভাষায় বের করবে। এই ডাচ শহরটা হেন্‌কের খুব প্রিয়। এ নগরের অগুনতি খাল, ব্রিজ আর ওয়াকওয়ে প্রতিবছর লাখ লাখ পর্যটকের ভিড়ে থাকে সরগরম। হেন্‌কের কাছে আমস্টারডাম হলো জীবন এবং রোমাঞ্চের প্রতিমূর্তি। ও এ শহরেরই বাসিন্দা। ওই সময় ওকে রিকস মিউজিয়ামের কিছু সংস্কার কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এটি আমস্টারডামের বিখ্যাত একটি ভবন। ভবনটি ভবঘুরে হেন্‌কের এতই প্রিয় যে সে এর প্রেমে পড়ে গিয়ে অনেকদিন ধরে এ শহরেই থাকছে, যেটি আদৌ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যায় না।

হেন্‌ককে ই-মেইলে জানিয়েছিলাম আমি আমস্টারডাম যাচ্ছি। বইমেলায় ব্যস্ততার ফাঁকে একদিন একটি স্থানীয় পাবের অন্ধকার কোণে ওর সঙ্গে আমার দেখা হলো। পাবটি দর কষাকষি করা ট্যুরিস্ট থেকে মুক্ত। হেন্‌ককে দেখে আমি দারুণ চমকে গেলাম। যে মানুষটিকে আমি চিনি জীবনের চেয়েও বড় এক ব্যক্তি হিসেবে, তার একী দশা! স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল, সদা হাস্যময়, সর্বদা আত্মবিশ্বাসী হেন্‌কে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাথার চুল পেকে সাদা। কুঁজো হয়ে হাঁটছে। এবং তার চেহারায় স্থায়ী ছাপ ফেলেছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। আত্মপ্রত্যয় একেবারেই উধাও অবয়ব থেকে। হেন্‌কের এমন অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তবে সেই সঙ্গে কৌতূহলও জাগছিল কী এমন ঘটেছে যে কারণে চিরচেনা সেই মানুষটিকে আজ এমন অচেনা লাগছে! নিজের চেহারার এমন অবনতির গল্পটি আমাকে শোনাল হেন্‌কে থেমে থেমে, হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে। মাঝে মাঝে সে শিউরে উঠল ঘটনার বর্ণনায়। আর তার কাহিনী শুনে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে নামল বরফ জল। আমি যেহেতু হরর গল্প লিখি তাই ভাবলাম আপনাদেরকেও শোনাই সেই সীমাহীন আতঙ্কের ইতিবৃত্ত।

হেন্‌কে যে পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তা বলতে ভুলে গেছি। আমস্টারডামের অন্যতম বিখ্যাত ভবন রিকস মিউজিয়াম সংস্কার এবং মেইনটেনের চ্যালেঞ্জটি সে হাসি মুখেই নিয়েছিল। এ বিল্ডিংয়ের রয়েছে লম্বা এবং মনোমুগ্ধকর ইতিহাস। মিউজিয়ামটি নানান চমৎকার ঐতিহাসিক নিদর্শনে ভরপুর। তবে এর কিছু জায়গায় সাধারণ দর্শকদের ঢুকতে মানা। আর নিষিদ্ধ সব বিষয়ের প্রতি হেন্‌কের আকর্ষণ দুর্নিবার।

হেন্‌ককে আনা হয়েছিল মেইনটেনেন্স ক্রু হিসেবে। তার কাজ বিল্ডিংয়ের ফাউণ্ডেশন মেরামত এবং নিরূপণ। কাঠামোটির সবচেয়ে পুরানো অংশটির বয়স একশো অতিক্রম করেছে বহু আগে এবং এর নাকি একটি ভয়াল ইতিহাস আছে। রিকস মিউজিয়াম তৈরি করা হয় ১৮৮৫ সালে তবে যে ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর ভবনের কাঠামো নির্মিত হয় তার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আরও অনেক আগের।

বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরভাগে, মার্বেল পাথর এবং লাল ইটের মেঝের নিচে শুয়ে আছে পরিত্যক্ত টানেলের এক গোলক ধাঁধা যা একদা পুরানো নগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বহুদিন ধরেই ওগুলো ব্যবহার করা হয় না এবং মেরামত করাও হয়নি। তবু ওই ভূগর্ভস্থ পয়োনালির বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তরের প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে ভূমিকা রয়েছে। এগুলো নিরূপণ এবং মেরামত না করলে

গোটা কাঠামো ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে।

জাদুঘরের গ্রাউণ্ড এবং আপার লেভেল বেশ দৃষ্টিনন্দন। ওখানে সারা বিশ্বের প্রচুর চমৎকার চমৎকার ঐতিহাসিক নিদর্শন রাখা হয়েছে প্রদর্শনের জন্য। ভবনের এমন দারুণ ও উষ্ণ আবহ দেখে কল্পনা করা কঠিন এর নিচেই রয়েছে ভীতিকর আঁধার। বিল্ডিং ম্যানেজারের সঙ্গে গুটিকয়েক প্রয়োজনীয় কথা সেরে হেন্‌কে গেল জাদুঘরের পেছন দিকে একটি পুরানো ঘরে। এ কামরা কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়। এখানে খাঁচার মত একটি এলিভেটর রয়েছে যা দিয়ে নিচের লেভেলে এবং সিউয়ারে নামা যায়।

ময়লা, হলুদ রঙের ওভারঅল গায়ে চাপাল হেন্‌কে। মাথায় পরে নিয়েছে শক্ত টুপি এবং হেডল্যাম্প। সে প্রবেশ করল এলিভেটরে। ভাবছে জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে এবং অত্যন্ত নির্জন বলেই হয়তো অনেকে ওখানে যেতে চায় না। এর আগে যারা মেরামতের কাজে এসেছিল তারা ওই পিচকালো অন্ধকার করিডোরের শীতল মেঝেতে বেশিক্ষণ থাকতে চায়নি, তড়িঘড়ি চলে এসেছে।

এলিভেটরের কপিকল এবং ইঞ্জিন ঘট ঘট শব্দে চালু হয়ে গেল। চার লেভেল নিচে বেসমেন্টের উদ্দেশে রওনা হলো হেন্‌কেকে নিয়ে। প্রতিটি ফ্লোরে মিটমিটে আলো দেখতে পেল সে, প্রতিটি পাতালঘরের লেভেল বিরল ঠেকল। এলিভেটরে একটি ফলক লাগানো রয়েছে। বয়সের কারণে মরচে পড়েছে। ওতে লেখা ১৯৩২। হয়তো ওই সময় শেষবার মেইনটেনেন্স করা হয়েছে। এর কয়েক বছর পরেই তো ইউরোপ জুড়ে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। এবং শুরু হয় ইহুদিদের নিদারুণ যাতনার কাল।

এ অঞ্চলের লজ্জাকর সেই ইতিহাস খুব ভালই জানে হেন্‌কে কারণ সে নিজেও ইহুদি আর গণহত্যার সময় তার প্রপিতামহ খুন হয়েছে। ১৯৩০-এর শুরুর দিকে নাৎসী শাসন থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই পালিয়ে এসেছিল আমস্টারডামে আশ্রয়ের খোঁজে, কিন্তু হিটলারের ধ্বংসাত্মক লম্বা বাহু অবশেষে হল্যাণ্ডের সীমান্তে এসে পৌঁছায় এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে মেরে ধরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বর্বর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

এলিভেটর গা কাঁপিয়ে থেমে গেল। জং ধরা স্লাইডিং ডোর এক পাশে ঠেলে সরিয়ে নেমে পড়ল হেন্‌কে। টানেলগুলো ছড়িয়ে আছে আমস্টারডামের অব্যবহৃত সিউয়ার নেটওঅর্ক জুড়ে—এগুলোর বয়স জাদুঘরের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। হেন্‌কের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে বলে দিয়েছেন টানেলের লে আউট জান্‌তে সে যেন রিপেয়ার ক্রুদের সাহায্য নেয় এবং অ্যাসেসমেন্টের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ জায়গাটি বড়ই গোলমেলে আর যেহেতু লাইটিং সিস্টেম মেরামতির পর্যায়ে রয়ে গেছে এবং সমস্ত বাতি এখনও লাগানো হয়নি কাজেই এখানে হেন্‌কের পথ হারিয়ে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা।

দলের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় সাধারণত টু-ওয়ে রেডিও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মাটির নিচের এই টানেলগুলোতে কাছেপিঠে ধাতব সরঞ্জামের স্তূপ থাকার কারণে রেডিও প্রায়ই কাজ করে না। তার মানে যোগাযোগ করতে হলে সঙ্গীদেরকে চেঁচিয়ে ডাকতে হবে কিংবা টর্চের আলো মেরে মোর্স কোডের মাধ্যমে

মেসেজ পাঠাতে হবে। লম্বা টানেলগুলোতে এসব কাজ করা যায়। হেন্‌কের মনে হতে থাকে পাতালপুরীর সমাধিগুলো সত্যি খুব নির্জন এবং বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা।

ওকে সাবধান হতে হবে।

হেন্‌কের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড জোনসের। গাঁট্টাগোট্টা জোনস হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ। সে তার নতুন দলকে নিয়ে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে হেন্‌কেকে সংক্ষেপে জানাল। বলল টানেল নিয়ে প্রারম্ভিক মানচিত্র তৈরি এবং অ্যাসেসমেন্টের কাজটি ঠিকঠাক এগিয়েছে। ওদের টিমে সব মিলে ষোলো জন ফোরম্যান ক্রু, এদের প্রত্যেকের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সিউয়ার মেরামতির। দু'জন ক্রুর ওপর খবরদারী করবে হেন্‌কে। এরা অত্যন্ত নির্জন একটি টানেল নিয়ে কাজ করছে।

মিনিট পনেরো হেঁটে হেন্‌কে তার গন্তব্যে পৌঁছাল। এখানেই তাকে আগামী কয়েক মাস কাজ করতে হবে। দূর থেকে ভেসে এল ড্রিল মেশিনের শব্দ। ওখানে কোথাও লাইটিং সিস্টেম ইনস্টলের কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। হেন্‌কের লোকেরা অন্যান্য ক্রুদের কাছ থেকে বেশ দূরেই কাজ করবে। ওখানে সবার শেষে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

প্রতিটি প্যাসেজওয়েই কেমন বিদঘুটে। এগুলোর দুটো টানেলের চেহারা কখনও একরকম নয়। সিউয়ারের গোটা সেকশন বড্ড সেকেলে। বোঝা যায় বহু আগে যখন এটি তৈরি করা হয় তখন কন্সট্রাকশনের কাজে সযত্ন কোন পরিকল্পনাই ছিল না। দেখা যাচ্ছে একটা টানেল অদ্ভুত অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে কয়েকশো মিটার সামনে এগিয়েছে, আবার অন্য টানেলগুলো কোনাকুনিভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে মিশেছে অন্ধকারে। হেন্‌কে এমন একটি প্যাসেজওয়েও দেখতে পেল যেটি একবার উঁচু আরেকবার নিচু হয়ে ইংরেজি S-অক্ষরের মত অস্বাভাবিক আকার নিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে। কিছু টানেলের যেন সমাপ্তি নেই। অন্যগুলো দুম করে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন মূল নির্মাণকারীরা তাদের কাজ শেষ করতে পারেনি, অসমাপ্ত রেখেই চলে গেছে তড়িঘড়ি। হেন্‌কে গত দুই মাসে বিভিন্ন টানেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। সঙ্গীদেরকে সেই সব অভিজ্ঞতা বয়ান করে পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করল ও হাঁটতে হাঁটতে। তবে এই পাতালপুরীতে পথ দেখানোর জন্য একজন গাইড আছে বলে সে খুশি।

বড়সড় একটি চোরকুঠুরির মত জায়গায় হেন্‌কের দলের চারজন লোক অপেক্ষা করছিল। তারা দিনের বেলা টানেলের এ অংশে কাজ করবে। অন্যরা পরের শিফটে, রাতের বেলায়। জোনস এদের সঙ্গে হেন্‌কের পরিচয় করিয়ে দিল। লোকগুলোকে পছন্দই হলো হেন্‌কের তবে তাদের সবাই মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে দেখে বিস্মিত হলো। তার অভিজ্ঞতা বলে এরকম বদ্ধ, ভাঙাচোরা জায়গায় একঘেয়ে কাজের মধ্যে একটু হাসিঠাট্টা করলে ক্রুদের মনে ফুর্তি থাকে, কাজে উৎসাহ পায়। কিন্তু এই ক্রুরা একটি কথাও বলছে না, চুপচাপ বসে আছে চোরকুঠুরিতে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বা সহমর্মিতার কোন চিহ্নই লক্ষ করা যাচ্ছে না। এরা যে পাতালপুরীর কতগুলো মূর্তি নয়, মানুষ, তা বোঝা যায় শুধুমাত্র তারা যখন মাঝে মধ্যে মাথার সঙ্গে আটকানো হেডল্যাম্প নাড়িয়ে তাদের

চারপাশের ছায়াগুলোর আকারে পরিবর্তন ঘটায়।

এদেরকে দেখে মনে হয় এরা কেবল পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যে পরিবেশে তারা কাজ করছে সেটা থেকেও পুরোপুরি বিযুক্ত।

হেন্‌কে অস্বস্তি ভাবটা দূরে ঠেলে সরিয়ে রেখে এদের সঙ্গে আলাপচারিতা চালাবার সিদ্ধান্ত নিল। এই লোকগুলো যদি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে কিংবা একে অপরের সংস্পর্শে সংশয় বোধ করতে থাকে তাহলে এর প্রভাব অন্যদের ওপরেও পড়তে বাধ্য। মনে ফুর্তি না থাকলে ভালভাবে কোন কাজই করা সম্ভব নয়।

এখানে প্রথম কাজ হলো টানেলের এই অংশটি জরিপ করে সিদ্ধান্ত নেয়া কোথায় কোথায় মেরামতি সবচেয়ে জরুরি। প্রাথমিক নিরূপণ আগেই হয়েছে তবে যে কোন রিপেয়ার প্রজেক্টে একদম প্রথম থেকে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ হেন্‌কের পছন্দ। সে ভূগর্ভস্থ এই সমাধিতে তার দল নিয়ে হাঁটতে লাগল এবং শীঘ্রি আবিষ্কার করল এরা কেমন যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। হেন্‌কে কোন প্রশ্ন না করলে কেউ আগ বেড়ে কিছু বলতে যায় না। ওরা অসংখ্য টানেলে ঘুরছে, সেফটি হেলমেটে বাঁধা ছোট টর্চের আলোয় পথ দেখে হাঁটছে, নোট নিচ্ছে ভেঙে পড়া দেয়াল, ওয়াটার ড্যামেজ এবং মেরামত করতে সম্ভাব্য কত সময় লাগতে পারে; হেন্‌কে তার লোকদেরকে চেপে ধরল তারা কীসের ভয়ে শংকিত, জানতে চাইল তাদের মত অভিজ্ঞ ক্রু, যারা এর আগে বহু টানেলে কাজ করেছে, কেন এসব ইট-পাথরের দেয়ালের মধ্যে আতংকে জড়সড় হয়ে আছে।

এ প্রশ্নটি এড়িয়ে গেল তারা, নার্ভাস ভঙ্গিতে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বদল করল প্রসঙ্গ। বলতে থাকল পুরানো সিউয়ার লাইনে তারা কে কী ধরনের কাজ করেছে কিংবা তাদের আগের বসরা হঠাৎ করেই বা কেন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এইসব গতানুগতিক, হাবিজাবি বিষয় নিয়ে। হেন্‌কের মনে হলো তার ক্রুদের এসব প্রসঙ্গ শুধু টেনশনের জন্য নয়, গভীরভাবে তাদের মধ্যে গেড়ে বসেছে ভীতি। কিন্তু ভয়টা কীসের সেটাই বুঝতে পারছে না হেন্‌কে। তবে তার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার যে তার ক্রুরা সময় গুনতে শুরু করেছে কখন শেষ হবে তাদের কাজের পালা এবং তারা এ অন্ধকার রাজ্য ত্যাগ করে উপরের নিরাপদ পৃথিবীতে যেতে পারবে।

হেডল্যাম্পের আলোক রেখা পড়ছে টানেলের স্যাঁতসেঁতে, ভাঙা, ফাটল ধরা দেয়ালে। কেমন গা ছমছমে, ভৌতিক। হেন্‌কে ভাবছে এ পরিবেশ অন্যের কাছে ভীতিকর মনে হতে পারে কিন্তু সে এসব থোড়াই কেয়ার করে। এখানে যারা কাজ করছে, তাদের হঠাৎ হঠাৎ চমকে ওঠার কারণ স্রেফ কুসংস্কারে বিশ্বাস, হেন্‌কের ধারণা। তাছাড়া এমন অন্ধকার, রুদ্ধ এবং সংকীর্ণ জায়গায় কাজ করলে তা শরীর এবং মন উভয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এমনকী জোনস, যে অসংখ্য ভূগর্ভস্থ সমাধিতে ঘুরে বেড়িয়েছে হাসিমুখে, সবসময় মজা করেছে, তারও চেহারা কেমন অন্যদের মত থমথমে, গম্ভীর।

প্যাসেজগুলো এঁকেবেঁকে, সর্পিল পথ ধরে চলে গেছে, মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বাঁকের মুখে পড়েছে। তখন হেন্‌কের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে হঠাৎ করে

প্যাসেজগুলো কোনদিকে মোড় নিল। আঁকাবাঁকা করিডোরের যেন শেষ নেই। হেন্‌কের নিজেরই বিভ্রান্তি লাগছে। ভাবল তার লোকদেরকে ঠাট্টা করে বলে ওরা যদি ওকে বস হিসেবে পছন্দ না করে ফেলে রেখে চলে যায় তাহলে এই গোলকধাঁধা থেকে ইহজীবনে বেরুতে পারবে না হেন্‌কে।

কিন্তু লোকগুলো ওর সঙ্গে নেই।

সে একটা টানেলের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল করেনি একাই হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছে। তার লোকজন কুড়ি ফুট পেছনে, তার দিকে ভাবলেশশূন্য মুখে তাকিয়ে আছে। আলো-আঁধারির খেলার কারণে হেন্‌কে বুঝতে পারল না স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর ফাঁকা অভিব্যক্তির আড়ালে লুকিয়ে আছে চেপে রাখা ভয়।

সে যখন জানতে চাইল ওরা কেন তার সঙ্গে আসছে না, তারা ফিসফিসিয়ে জবাব দিল যেখানটায় তারা দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই মেরামতির শেষ কাজটি করার কথা। পকেট থেকে ম্যাপ বের করে হেডল্যাম্পের আলোয় তাতে চোখ বুলিয়ে হেন্‌কে বুঝতে পারল তারা সিউয়ার নেটওঅর্কের সবচেয়ে দূরবর্তী অংশে চলে এসেছে। এটি পাতালপুরীর সমাধির পেছন দিকটা। টানেল এখান থেকে সামনে এগিয়েছে। এ জায়গাটি রিকস মিউজিয়ামের ফাউণ্ডেশনের বাউণ্ডারি হিসেবে চিহ্নিত করা।

তবে হেন্‌কের গোলমেলে লাগল সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটি রিপেয়ার করার জন্য চিহ্নিত হয়ে রয়েছে ম্যাপে। একটি নির্দোষ টানেলের প্রবেশ মুখে সে দাঁড়ানো। টানেলের খোলা মুখের দেয়ালে কেউ একটি আইডেন্টিফিকেশন ফলক লাগিয়ে রেখেছে এটি মেরামত করা হবে সে ঘোষণা দিয়ে। ফলকে লেখা: 'Tunnel 72F: water damage failing brick work.'

ম্যাপে আরেকবার চোখ বুলিয়ে হেন্‌কের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল 72F টানেলটি এখনও রিকস মিউজিয়াম ফাউণ্ডেশনের মধ্যেই রয়েছে এবং এটির সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা তার লোকদেরকে বললে তারা নির্লিপ্ত গলায় জানিয়ে দিল তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই রিপেয়ার কর্মের শেষ সীমানা, কেউই আগে বাড়তে রাজি নয়।

মেজাজ খচে গেল হেন্‌কের। হতাশ হয়ে বুঝল এদের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া বড্ড কঠিন হবে তার জন্য। সে ওদের সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করল, হুকুম দিল টানেলে ঢুকতে কিন্তু লোকগুলো এক চুল নড়ল না। পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে নাক গলাল জোনস। 'আমরা এখানে দুই মাস কাজ করেছি, হেন্‌কে। তোমার ক্রুরা খুবই দক্ষ, পরিশ্রমী এবং ভাল। তুমি যা বলবে তারা তা করতে রাজি। কিন্তু আমাদের কাজ এই সংযোগস্থল পর্যন্তই। আমাদের কেউই টানেল ৭২এফ-এ যাবে না। তুমি বিশ্বাস করো বা না-ই করো, ওখানে কিছু একটা আছে।'

গভীর একটা দম নিয়ে নিজেকে শান্ত করল হেন্‌কে। বলল, সে বুঝতে পারছে দিনের পর দিন মাটির নিচে বদ্ধ পরিবেশে কাজ করতে করতে তার লোকদের হাঁফ ধরে গেছে কিন্তু ওই টানেলে যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তা তাদের করা উচিত। তবে যেহেতু তারা ওখানে এখন যেতে চাইছে না কাজেই সে একাই যাবে।

নিষিদ্ধ চেহারার টানেলটির দিকে পা বাড়িয়েছে হেন্‌কে, জোনসসহ সবাই প্রবল আপত্তি জানাল। জোনস চেঁচিয়ে বলল হেন্‌কে যেন এখুনি প্যাসেজওয়ে থেকে চলে আসে। কিন্তু হেন্‌কে তা করল না। তার কাছে গোটা ব্যাপারটাই মনে হচ্ছিল হাস্যকর কুসংস্কার। এ টানেলে ভয় পাবার মত কিছু নেই এবং হেন্‌কে প্রমাণ করবে তার লোকেরা এখানে ঢুকতে বেহুদাই ভয় পাচ্ছিল। দেখিয়ে দেবে সে কতটা ডাকাবুকো।

শুরুতে টানেলটিকে আর দশটি সাধারণ টানেলের মত মনে হলেও অন্ধকারে যত ভেতরে যাচ্ছিল হেন্‌কে, মনে হচ্ছিল এরকম পয়োনালি সে কখনও দেখেনি। এবড়ো খেবড়ো জমিন; অন্যান্য কিছু টানেলের মত এটির মেঝেও ঢেউ খেলে গেছে। তবে পায়ের নিচে সারাক্ষণ কেমন ভাঙা ঠেকছে। গোটা জমিন ঢেকে আছে ঘন, তেলতেলে জলে, কোথাও কোথাও তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল। বিশ্রী, পূতিগন্ধ জল ঠেলে এগোতে থাকল হেন্‌কে।

টানেলের দেয়াল ইটের। তবে বহু প্রাচীন। এরকম ইটের দেয়াল আজ তক কোন সিউয়ারে চোখে পড়েনি হেন্‌কের। কে জানে কী দিয়ে বানানো হয়েছে এসব ইট তবে শতবর্ষী এ দেয়াল ভেঙে পড়তে শুরু করেছে, বিরাট বিরাট ফাটল গায়ে, ছাত পর্যন্ত ঠেকেছে।

হেন্‌কের মাথার হেডল্যাম্প টানেলের সামনের অনেকটাই আলোকিত করে রেখেছে। তবে সামনে এগোতে এগোতে ওর মনে হলো এটি বেখিকরি একটি কানাগলি। ক্রমে চেপে আসছে প্যাসেজওয়ে, তবে টানেলের সমাপ্তি এখানে ঘটেনি, কানাগলিতে বাঁক নেয়ার আগে সামান্য সরু হয়ে গেছে ওটা।

হেন্‌কের অনুমান সে সিউয়ারের আশি ফুট ভেতরে এসেছে। ওই বাঁকের পরে কী আছে জানার অদম্য কৌতূহল তাকে ওদিকে টেনে নিয়ে চলল। এখন সে তার লোকদেরকে বলতে পারে কোন ভয় নেই, তারা যেন চলে আসে টানেলে। ময়লায় কালো হাত দিয়ে সে রেডিও ধরল, জোনস এবং অন্যান্যদেরকে অনুরোধ করল তারা যেন টানেলের মোড়ে চলে আসে।

কারও কোন সাড়া পেল না হেন্‌কে, শুধু রেডিও স্পীকারে খড়মড় শব্দ ছাড়া। মনে পড়ল তাকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল টানেলে অনেক সময়ই রেডিও কাজ করে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার লোকদেরকে হাঁক দিয়ে ডাকতে যাবে হেন্‌কে, এমন সময় কী যেন ওর নজর আটকাল।

কিছু নেই তো!

প্রাচীন টানেলে স্থির পচা পানি আর সে ছাড়া অন্য কিছু নেই। কিন্তু হেন্‌কে তো টানেলের শেষ মাথায় কী যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে এক ঝলক তাতে কোন সন্দেহ নেই। হেন্‌কে ওদিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। হ্যাঁ, তার ভুল হয়নি। দেখা যাচ্ছে তো! কিনার দিয়ে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় বেরিয়ে আছে। জামার আস্তিন। একটা হাতসহ জামার আস্তিন।

অবিশ্বাস্য!

কালো জল ঠেলে ওদিকে এগোল অকুতোভয় হেন্‌কে। অন্য কেউ হলে এমন ভুতুড়ে টানেলে এরকম দৃশ্য দেখলে ভয়েই অক্কা পেত। কিন্তু আমাদের হেন্‌কে

কোন কিছুতে ভয় পায় না। সে জিদ্দি এবং একগুঁয়ে। তার যখন রোখ চেপেছে টানেলের কিনারে ওটা কী জিনিস দেখবে, সে ওই রহস্য ভেদ করে ছাড়বেই।

ছপছপ করে কানাগলির বাঁকটির দিকে এগিয়ে চলল হেন্‌কে। তার বুক মমতায় ভরে উঠল যখন দেখল ওখানে করুণ চেহারা নিয়ে জীর্ণশীর্ণ একটি বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির বয়স তেরো-চোদ্দ হবে। মুখ এবং হাতে ময়লা। পরনে ছেঁড়া, ঢোলা একটা জামা। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে।

কিশোরীর মাথা ভর্তি আলুথালু কালো কেশ। তবে দেখতে ভারী সুন্দরী। তার মুখখানা ভয়ে-আতংকে শুকিয়ে আছে। হেন্‌কে ভাবল মেয়েটি যে কোন কারণেই হোক হয়তো সিউয়ারে ঢুকেছিল এবং পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাকে নরম সুরে প্রশ্ন করা হলেও কোন জবাব মিলল না। ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় মেয়েটি কথাই বলতে পারছে না।

রেডিওতে আবারও যোগাযোগের চেষ্টা করল হেন্‌কে। কিন্তু সেই বিরক্তিকর ঘ্যাড়ঘেড়ে আওয়াজই হলো কেবল। মেয়েটিকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তার দেখানো দরকার। চেঁচিয়ে সে তার লোকদের ডাকতে পারে। কিন্তু বাচ্চাটা তাতে আরও ভয় পেয়ে যাবে ভেবে ক্ষান্ত দিল হেন্‌কে। ঠিক করল ওকে নিয়ে প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে পড়বে। মেয়েটির দিকে পা বাড়াল হেন্‌কে বলতে বলতে সে ওকে ওপরে, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার নমনীয়, শান্ত গলাও মেয়েটির ত্রাস দূর করতে পারল না। বরং মনে হলো ওকে দেখে ভয় পাচ্ছে সে।

তবে মেয়েটি পিছু হটল না বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না। কোন কথাও বলছে না। হেন্‌কে কাছে আসতে সে হাত তুলে ওর মাথার হেলমেটে আটকানো আলো দেখাল। হেন্‌কে বুঝল এই আলোটা ওকে ভড়কে দিচ্ছে। সে মাথা থেকে হেলমেট খুলে হাতে নিল। টর্চের আলো এখন মেয়েটির শার্টটিকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তুলল। আলোর অ্যাঙ্গল বদলে যেতে একটা জিনিস চোখে পড়ল হেন্‌কের। মেয়েটির জামার বুকে হলুদ রঙের একটা তারা লাগানো। কাপড়ের তৈরি হলদে তারা। তারাটি বড্ড চেনা লাগছে হেন্‌কের। তার খুব অবাকও লাগল। তবে স্মৃতি হাতড়াতেই হলুদ তারার রহস্য উন্মোচিত হলো: নাৎসী আমলে ইহুদিদেরকে পোশাকের ওপর এরকম হলুদ তারা লাগাতে হতো যাতে অ-ইহুদি থেকে সহজেই তাদেরকে আলাদা চেনা যায়। কিন্তু এই মেয়ে হলুদ তারা লাগানো জামা পরে আছে কেন? এর কোন সদুত্তর পেল না হেন্‌কে। তবে এ নিয়ে বেশি মাথাও ঘামাল না সে। দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েটিকে এখন সে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারলেই খুশি। কারণ এরকম ভয়ঙ্কর একটা জায়গায় কত না দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বেচারীকে। হেন্‌কের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

সে মেয়েটির অনেকটা কাছে এসেছে, হাতে জ্বলছে টর্চ, তাকিয়ে আছে বাচ্চাটার দিকে। মাঝে মাঝেই আলো পড়ে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হচ্ছে কিশোরীর চেহারা। দরকার হলে ওকে কোলে করে সিউয়ার থেকে নিয়ে যাবে হেন্‌কে। তবে এই কর্তব্যবোধ এবং সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে হঠাৎই কেন জানি গা-টা ছমছম করে ওঠে তার। মেরুদণ্ড বেয়ে অভিশংকার একটা স্রোত নেমে যায় হেন্‌কের, পেটের ভেতরটা যেন খামচে ধরে নির্জলা আতংক, ভীতি তাকে গ্রাস

করে, একটা বিভীষিকা তাকে হঠাৎ দারুণ দুর্বল করে দেয়।

ভয়ের এই প্রায় অচেনা অনুভূতির সঙ্গে হেন্‌কের আকস্মিক মোলাকাতের কারণ মেয়েটির আচরণ। খুব সূক্ষ্ম একটি বিষয় তার আগে নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। এখন চোখে পড়ছে। হেন্‌কে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু ওর দিকে আঙুল তুলেই রেখেছিল। যেন কিছু নির্দেশ করছে। কিশোরীর হাতখানা লম্বা, টানটান। সে যে হেন্‌কের দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে না এটা বুঝতে পারা মাত্র ওর সমস্ত শরীর ঝিন্‌ন্‌ করে উঠল।

মেয়েটি আলোর দিকে হাত তুলে দেখায়নি, দেখাচ্ছে হেন্‌কের পেছন দিকটা।

ওই টানেলে এরপর কী ঘটেছে হেনকের মনে নেই, তবে স্মরণে আছে সে সত্যি পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ (স্বাভাবিক অবস্থায় হলে সে মোটেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত না) যে জোনস এবং তার লোকজন খুব বেশি দূরে যায়নি কারণ ওই অন্ধকার টানেলের রোমহর্ষক পরিবেশ সম্পর্কে তারা যথেষ্টই সচেতন ছিল এবং হেন্‌কেকে নিয়ে টেনশনও করছিল। ফলে তার গগনবিদারী চিৎকার শোনামাত্র তারা প্যাসেজওয়ে ধরে ছুট দেয়।

তরাসে বিস্ফারিত চোখ, থরথরিয়ে কাঁপতে থাকা হেন্‌কেকে তারা নিয়ে আসে সেই চোরকুঠুরিতে। কিন্তু হেন্‌কে বলতে থাকে সে আর এই টানেলে থাকবে না। তখন তার সঙ্গীরা তাকে টানেলের বাইরে নিয়ে যায়।

রিকস মিউজিয়াম এলিভেটর রুমে আসার পরে তারা হেন্‌কেকে ঘিরে বসে খোলাখুলিই বলাবলি করতে থাকে গত কয়েক মাসে ওই টানেলে কী ঘটেছে। জোনস জানায় প্রথম সার্ভে টিম যারা ওই বিশেষ সিউয়ার প্যাসেজওয়েটিতে গিয়েছিল তারা ওখানে এক রাত থাকার পরে পরদিনই কাজ ছেড়ে চলে যায়। এক সপ্তাহ বাদে ওখানে তাদের এক সহকর্মী গিয়েছিল। বলেছিল ওই টানেলের কাছে কাজ করার সময় সে টানেলে কাদের যেন ফিসফাস গলা শুনেছে। তারপর ওই লোক আত্মহত্যা করে। জোনসের আগের সুপারভাইজর টানেল 72F-এর মুখে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সে ওদেরকে অনুসরণ করে টানেলে ঢুকে পড়ে। এক পরিচ্ছন্নতা-কর্মী ওই সুপারভাইজরকে দেখেছে চার হাত-পায়ে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে সিউয়ার থেকে বেরিয়ে আসছে মৃগীরোগীর মত কাঁপতে কাঁপতে আর চিৎকার করতে করতে।

সুপারভাইজরের তারপর অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু কেউ জানে না সে ওখানে ঠিক কী দেখেছিল। সে এ নিয়ে আর কোন কথা বলেনি। তবে যে লোকটি তাকে উদ্ধার করেছিল সে নাকি শুনেছে সুপারভাইজর বারবার উন্মাদের মত একটি শব্দই উচ্চারণ করছিল:

'নাৎসী!'

ওই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পরে মানসিকভাবে দারুণ ভেঙে পড়েছিল হেন্‌কে। এক রাতের মধ্যে তার সমস্ত চুল পেকে যায়, এক সপ্তাহের মধ্যে তার ওজন নেমে আসে অর্ধেকে। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখত সে (এখনও দেখে)। ঘুম ভেঙে দেখে সমস্ত গা ঘামে ভিজে সপসপে। কিন্তু কী স্বপ্ন দেখেছে তা তার মনে নেই।

ওই ঘটনার পরেও হেন্‌কে সিউয়ারে কাজ করেছে কিন্তু টানেল 72F-এর

ধারেকাছেও যায়নি। তার সহকর্মীদের যেতেও মানা করেছে। এমন ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস কিছু একটা সে দেখেছিল যার কথা জোর করে ভুলে থাকতে চেয়েছে। তবে ওই সিউয়ারের ইতিহাস সে ঘেঁটেছে এ কারণে যে তার মনে হয়েছিল ওই টানেলগুলোর নেপথ্য কথা জানা থাকলে সিউয়ার সম্পর্কিত সদ্য জন্ম নেয়া ভীতি আস্তে আস্তে কেটে যাবে। পণ্ডিতরা বলেন জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান দিয়ে জয় করা যায় সমস্ত ভয়।

তবে ওই জাদুঘরের ইতিহাস হেন্‌কেকে যে খুব একটা সাহায্য করতে পেরেছে তা নয় তবে স্থানীয় একটি কিংবদন্তি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

গুজব বলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কয়েকটি ইহুদি পরিবার রিকস মিউজিয়ামের নিচের টানেলে আশ্রয় নিয়েছিল। হিটলারের কুখ্যাত গোয়েন্দা পুলিস SS-এর দুই কর্মকর্তা ওদের অবস্থান টের পেয়ে যায় এবং স্থানীয় কয়েকজন ভলান্টিয়ার নিয়ে টানেলে ঢুকে পড়ে ইহুদি পরিবারগুলোকে গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়ার মতলবে। শোনা যায়, ওই পরিবারগুলো SS অফিসার এবং তাদের নাৎসী সমর্থকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে হত্যা করে সিউয়ারের কোথাও লাশগুলো পুঁতে ফেলে। তীব্র আক্রোশে দুই নাৎসী কর্মকর্তা এবং তাদের চামচাদেরকে ইহুদি পরিবারের সদস্যরা পিটিয়েই মেরে ফেলেছিল। ওরা নাকি বাধা দেয়ার সুযোগই পায়নি। এমন বীভৎসভাবে পেটানো হয় কারও চেহারা চেনার জো ছিল না। তবে ওই পরিবারগুলোরও শেষতক রেহাই মেলেনি। ওই টানেল থেকে তারা আর বেরুবার সুযোগ পায়নি। সম্ভবত টানেলের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল বা অন্য কিছু, ঠিক পরিষ্কার জানা যায় না। তবে পরিবারগুলো না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় ওখানেই। সত্য না মিথ্যা কে জানে, খিদের জ্বালায় নাকি সিউয়ারে কবর দেয়া লাশ খুঁড়ে বের করে সেগুলো কেটে, টুকরো করে গলিত পচা মাংস খেয়ে উদর পূর্তি করেছিল লোকগুলো!

এ হলো গল্প। বারবার শিউরে উঠে গল্পটি আমাকে বলেছিল হেন্‌কে। আমি জানতে চেয়েছিলাম টানেলে সেদিন সে ঠিক কী দেখেছিল। হেন্‌কে বলেছে তার নাকি সত্যি কিছু মনে নেই। তবে খুবই ভয়ঙ্কর কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই নইলে এক রাতের মধ্যে তার সমস্ত চুল পেকে সাদা হলো কেন?

আমি হেন্‌কের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছি। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরন কোন কোন ঘটনা স্মৃতি থেকে একদম বিলোপ করে দেয়, শত চেষ্টাতেও মনে পড়ে না। হেন্‌কের গল্প শোনার সময় আমার হুমায়ূন আহমেদের কথা মনে পড়ছিল। কিংবদন্তির এই লেখককে একাত্তরে ছাত্রাবস্থায় পাক সেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি বেশ কিছুদিন এদের হাতে বন্দি ছিলেন। কিন্তু সেই বন্দি জীবনের স্মৃতি তিনি শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারেননি। হয়তো খুবই ভয়াবহ ছিল সেই অভিজ্ঞতা যা তাঁর স্মৃতি ধারণ করতে চায়নি।

তবে আমার গল্প কিন্তু এখানে শেষ নয়। আমি আন্তর্জাতিক বইমেলার পরে দেশে ফিরে আসি। হেন্‌কের সঙ্গে ই-মেইল যোগাযোগটা আগের মত নিয়মিত ছিল না নানা কারণে। তবে শুনেছিলাম সে আবার সিউয়ারে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। কিছু মানুষ আছে এরকম—বড্ড বেপরোয়া, কোন কিছুতেই তাদের শিক্ষা হয় না।

ইগো বা অহংকার তাদের ওপর বোঝা হয়ে চেপে থাকে। এই ইগোতে কোনরকম আঘাত লাগলে তারা কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে না। হেন্‌কেও তাই। সে টানেল 72F থেকে ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এ ঘটনা তার অহংবোধে লেগেছিল খুব। তার মত সাহসী মানুষ, ভূত-প্রেত-আত্মায় যার আদৌ বিশ্বাস নেই সে কেন সেদিন জুজুর ভয়ে পালিয়ে এসেছিল? একটা ই-মেইলে হেন্‌কে জানিয়েছিল সে আবার ওই ভুতুড়ে টানেলে যাবে, ওখানকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ছাড়বেই। আমি ওকে মানা করেছিলাম। বলেছিলাম এত সাহস দেখিয়ো না। হেন্‌কে বলেছিল সে যদি ওই টানেলে আরেকবার না যায় সারা জীবন এই ভয়টা তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। আর এটা সে সইতে পারবে না কিছুতেই।

পাঠক, অসমসাহসী হেন্‌কে আবার সেই টানেলে ঢুকেছিল। তিন দিন পরে 72F টানেলের মুখে ওর লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন হার্টঅ্যাটাকে মারা গেছে হেন্‌কে। কিন্তু কে তার লাশটার হাত-পা-ঘাড় ভেঙে, দুমড়ে মুচড়ে একটা ছেঁড়া, পচা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল কেউ জানে না। পুলিস জানিয়েছে হেন্‌কেকে যে বস্তার মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল সেটি জার্মানীতে তৈরি। ওই রকম বস্তা এখন আর কোথাও উৎপাদন করা হয় না। বস্তার গায়ে সাল লেখা ছিল ১৯৪১।

সুহাসিনী

আর্কিওলজিস্ট স্যর সেডরিক হারবিন ক্যানভাসের ক্যাম্প খাটে শুয়ে বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা এপাশ-ওপাশ করছেন। *জারু*-জাগুয়ারের গর্জনে এবারে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। ঘণ্টা দুই আগে নিশাচর বানরদের হুল্লোড় তাঁর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়েছে, তারও আধঘণ্টা আগে জঙ্গলের অদ্ভুত সব শব্দ তাঁর নিদ্রার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল।

চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। গত আট রাত্তির ধরে গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে এভাবেই শুতে হচ্ছে তাঁকে। স্যর হারবিন কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোর শাভান্তি উপজাতি ছেলেটার দিকে। সে ফার্নগাছের মস্ত একটা পাতা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছে, মশা এবং খুদে, বিষাক্ত পিয়াম মাছি তাড়াচ্ছে। এগুলো বড্ড জ্বালাতন করছে তাঁকে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। তাঁর চাউনি দেখে ভড়কে গেল কিশোর ছেলেটা। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হেসে দ্বিগুণ শক্তিতে গাছের পাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। সজোর আন্দোলনে তার নিচের ফুটো করা ঠোঁটে লাগানো ক্যাপিবারার দাঁতটি নড়তে থাকল। ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন হারবিন। চোখের মধ্যে ঘাম ঢুকে গেছে। পিটপিট করছেন চোখ। নগ্ন বুকে অ্যাডহেসিভ টেপ লাগানো থাকা সত্ত্বেও তিনি উঠে বসার চেষ্টা করলেন। না পেরে গুঙিয়ে উঠে পিঠ ছেড়ে দিলেন ক্যাম্প খাটে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে স্যাঁতসেঁতে রাত্তির মধ্যে বেরিয়ে এল এক সুন্দরী যুবতী।

'ডার্লিং? শুনলাম তুমি ককাচ্ছ। ব্যথা লাগছে?'

'তেমন নয়। আসলে শুয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। বিশ্রী লাগছে সবকিছু। তুমি এখনও ঘুমাওনি!'

স্যর সেডরিক নারীটির দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালেন। সে তাঁর মুখ এবং ঘাড় থেকে সযত্নে ঘাম মুছে দিচ্ছে। মেয়েটি তেমন লম্বা নয়, স্বর্ণকেশী এবং অপরূপ সুন্দরী। উলুঝুলু শার্ট এবং যোধপুরী পাজামাতেও তাকে দুর্দান্ত লাগছে। তবে তাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে যখন সে হাসে। তার অদ্ভুত সুন্দর হাসিমুখ যে কোন পুরুষের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে বাধ্য। তার মিষ্টি চওড়া মুখের বাঁক আর ঝলমলে নীল চোখ দিয়ে যেন উৎসারিত হয় হিউমার, যেন সে জোক শোনাবার জন্য কাউকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং কৌতুকটা এখুনি বলবে। ব্রাজিলিয়ান ইণ্ডিয়ান ছেলেটা যুবতীর দিকে তাকিয়ে উদ্ভাসিত হলো হাসিতে। দেখেই বোঝা যায় মেয়েটিকে সে খুব পছন্দ করে। হারবিন–মেয়েটির স্বামী, যদিও দেখায় তার

বাপের মত—স্ত্রীর হাত ধরলেন কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে।

'ডায়ানা,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, 'মাই ডিয়ারেস্ট। এই অভিযানে তোমাকে নিয়ে এসে এত সব ঝামেলার মধ্যে ফেললাম তারপরও তুমি কী করে এমন হাসিখুশি থাকো? আমি সেদিন ওই বোয়া কন্সট্রিকটরটার মুখোমুখি হয়ে পড়ি নিতান্তই বেকুব ট্যুরিস্টের মত যে কিনা কোনদিন মাত্তো গ্রেসোতে আসেনি!' নিজেকে ভর্ৎসনা করলেন তিনি। 'কেন যে ফাউণ্ডেশনকে এই প্রমোদবিহারের কথা বলতে গিয়েছিলাম। এটা একটা হানিমুন হলো! তোমাকে তো আমি গুমট নরকের মধ্যে নিয়ে এসেছি।'

'আহ্হা থামো তো!' ডায়ানা হারবিন স্বামীর ঠোঁটে দুটো চম্পক কলি আঙুল চাপা দিল। আদর করে তুলে ধরল মাথা, লাউয়ের শুকনো খোল দিয়ে বানানো কলসী থেকে এক চুমুক *herva matte* খাওয়াল। তারপর এক মাসের বাসী একটি পত্রিকা দিয়ে বলল, 'নাও এটা পড়ো এবং রিল্যাক্স করো। তিনটে ভাঙা পাঁজর নিয়ে তোমাকে হারানো নগরীর খোঁজে যেতে হবে না। এ নিয়ে আর খিটখিট কোরো না। মারিও পরিস্থিতি খুব ভালভাবে সামলে নিয়েছে।'

স্যর সেডরিকের চেহারায় একটা অদ্ভুত ভাব ফুটল। তবে তাঁর স্ত্রী লক্ষ করার আগেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল মুখমণ্ডল থেকে। যদিও কণ্ঠস্বরের আড়ষ্ট ভঙ্গিটা ডায়ানার নজর এড়াল না।

'মারিও—ও হ্যাঁ,' টেনে টেনে বললেন তিনি। 'আমাদের হ্যাণ্ডসাম এবং ড্যাশিং যুবক গাইড।'

'হ্যাণ্ডসাম?' হেসে উঠল ডায়ানা—এমন লঘু সুরের হাসি যে স্যর সেডরিক স্ত্রীর দিকে পরিহাসের দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারলেন না। 'তাই নাকি? লক্ষ করিনি তো...সত্যি, সেডরিক!' হারবিনের চাউনি ফিরিয়ে দিল সে, ঝিকমিক করছে চোখ। 'আমার তো ধারণা তুমি মারিওকে হিংসে কর!' আধবোজা চোখে সে সিনেমার রোমিওর মত করে নাটকীয় গলায় বলল, 'আ-হ, সেনোরা! আপনি যেন জঙ্গলের অর্কিড।' ভেংচাল সে, তারপর ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। 'ডার্লিং, ও বড্ড সাদামাঠা!'

স্ত্রীর রসিকতায় যোগ দিতে পারলেন না হারবিন। তাঁর ধূসর চোখ সরু এবং শীতল হয়ে এল।

'হারামজাদা!' বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'ও সত্যি তোমাকে এ কথা বলেছে? হারামীর সাহস কত! আমি এক্ষুণি ওর চাকরি খাব!'

'তুমি এসব কিছুই করবে না!' হাসল ডায়ানা, চুম্বন করল স্বামীর কপালে। 'সেডরিক, এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তর আমেরিকান মেয়েদের দেখলে প্রতিটি ব্রাজিলিয়ানই কোন না কোন মন্তব্য করে। এ হলো ওদের সখ্য গড়ার কৌশল!' সে হার্ভে মাত্তে বা পুষ্টিদায়ক চা আরেক চুমুক খাওয়াল স্যর হারবিনকে। স্বামী চটে যাওয়ায় বেশ মজা পেয়েছে। 'মারিও,' বলল সে, 'খুবই দক্ষ একজন গাইড। আমরা যখন অন্য উপজাতিদের এলাকা দিয়ে যাই তখন যুদ্ধ-প্রেমী এই শাভান্তিদের সঙ্গে যেন তাদের ঝগড়া না লাগে সেই দিকে কিন্তু খেয়াল রাখে এই মারিও। আমাদের কাছে যে *মেণ্ডিওকা* এবং *রাপাডুরা*'র রসদ

আছে তা মারিওর সাহায্য ছাড়া জোগাড় করতে গেলে আমাদের অর্ধেক ইকুইপমেন্টই দিয়ে দিতে হতো। আর সে-ই বেলেমে একমাত্র গাইড তোমাদের হারানো নগরীতে পৌঁছাবার ক্ষীণতম ধারণা যে রাখে। অবশ্য হারানো নগরী বলে সত্যি যদি কিছু থাকে।' শুকনো গলায় যোগ করল সে। 'ভুলে যেয়ো না তোমার কাছে প্রমাণ বলতে রয়েছে শুধু রিওতে পাওয়া বাইব্লিওটেকা ন্যাশনাল-এর কিছু হাবিজাবি পুরানো কাগজপত্র। মারিও যদিও বিশ্বাস করে না এরকম কোন শহরের অস্তিত্ব আছে।'

'মারিও!' নাক সিটকালেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। 'লেফটেনেন্ট-কর্নেল ফসেট এবং তাঁর ছেলেরা যদি সত্যি ১৯২৫ সালে এটির সন্ধান করতে গিয়ে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে—ওহ্, কবে যে খাটিয়া থেকে ছাড়া পাব!' তিনি ফুঁসতে লাগলেন। 'আমরা ওই জায়গা থেকে আর মাত্র দুই দিনের দূরত্বে রয়েছি বাজি ধরে বলতে পারি। আমি—'

'বেশ, বেশ,' তাঁর সুন্দরী স্ত্রী তাঁর হাতে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে চাপড় দিল। 'আরেকটা এক্সপেডিশন হবে, ডিয়ার। আমরা আবার চেষ্টা করব। এখন তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা দরকার যাতে তোমাকে বেলেমে নিয়ে যেতে পারি। তোমার হয়তো শরীরের ভেতরে কোন ইনজুরি হয়েছে আমরা জানি না। এহ্, ওই ভয়ঙ্কর সাপটা! গাছের ওপর দিয়ে তোমার গায়ে ঝুপ করে পড়ল, তোমাকে জড়িয়ে ধরে পিষে মারতে চাইছিল—' শিউরে উঠল সে, তারপর হারবিনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ঠাণ্ডা গালে চেপে ধরল তাঁর হাত। 'ওহ, সেডরিক, সেদিন তুমি মারা যেতে পারতে!'

পেশীতে ঢিল পড়ল হারবিনের, স্ত্রীর গমরঙা সোনালি লম্বা চুলে হাত বুলাতে বুলাতে তাঁর মুখ থেকে তেতো এবং হতাশ ভাবটা কেটে যেতে লাগল।

'প্রিয়তমা,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'আমি জানি না তোমার মত এমন সুন্দরী একটি মেয়ে আমার মত বদরাগী, বুড়ো হাবড়ার মধ্যে কী পেয়েছ! তবে রিওতে এক্সপ্লোরার'স ক্লাবে যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম, সেই রাতে আমার গোটা জীবন যেন বদলে গেল। তুমি তখন ওই ফালতু ফরেস্টারটার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে! আমার দিকে তাকিয়ে! যখন—যখন তোমার হাসি প্রথম দেখলাম, ডায়ানা, জীবনের সেরা ঘটনাটি ঘটে গেল আমার জীবনে। মনে হলো এই প্রথম সূর্য উদয় হলো আমার—ধ্যাত্তেরিকা কী সব আবোল তাবোল বকছি!' বিব্রত বোধ করছেন স্যর সেডরিক। 'আমি আসলে আমার অনুভূতিগুলো কখনওই ঠিকঠাক প্রকাশ করতে পারি না!'

'খুব পারো!' ফিসফিস করল তার স্ত্রী। 'বিশ্বখ্যাত স্যর সেডরিক হারবিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সেই অনুভূতি আমি কোনদিন ভুলব না। আহা!' হারবিন ডায়ানাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলেন সে চট করে সরে গেল। 'এখন নয়! আমি আর মারিও আগে মাতুরা থেকে সাপ্লাই নিয়ে ফিরি, তারপর। ডার্লিং, এখন একটু ঘুমাও। তাহলে আমিও ঘুমাতে পারি। কাল খুব ভোরে রওনা হতে হবে তুমি তো জানোই।'

চোখে রাজ্যের খিদে নিয়ে স্ত্রীর হাসিটুকু ফিরিয়ে দিলেন হারবিন। 'ঠিক

আছে। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরছ তো?'

ডায়ানা ঝুঁকে আরেকবার হালকা চুমু খেল তাঁকে। 'অবশ্যই তাড়াতাড়ি ফিরব।' ফিসফিসাল সে। 'আগামী বৃহস্পতিবার আমাদের প্রথম অ্যানিভারসারি। দেখতে না দেখতে বিয়ের এক মাস কেটে গেল! তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না ওইদিন আমি মারিও আর কতগুলো টাপিরাপের সঙ্গে কাটাব যারা *"টিকাণ্টো! টিকাণ্টো!"* বলে আগড়ম-বাগড়ম বকবে! অমনটি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই।'

মুখ টিপে হাসলেন স্যর সেডরিক। শুয়ে রইলেন চুপচাপ। চোখ দিয়ে অনুসরণ করলেন তাঁর স্ত্রী নিতম্বে চমৎকার দুলুনী তুলে তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাতুরা একটি নদীবাহিত গ্রাম, জানেন তিনি। রিওনাসমর্তেস বা মৃত্যু নদী থেকে কয়েক মাইল ভাটিতে। এই নদী একদা ইণ্ডিয়ানদের হাতে খুন হওয়া একদল পর্তুগীজ খনি ইঞ্জিনিয়ারের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। এখন ওখানে একটি ট্রেড-পোস্ট গড়ে উঠেছে। একচক্ষু এক ডাচ ওটার মালিক। ওখান থেকে ডায়ানা ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠাতে পারবে বেলেম হয়ে। ফাউণ্ডেশনকে বলতে পারবে—ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হারবিন—তিনি পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন, অভিযানের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। ওখান থেকে মারিও তাদের ক্রমে ফুরিয়ে আসা রসদও জোগাড় করতে পারবে—কফি, কুইনাইন, ম্যাণ্ডিওকা ইত্যাদি। মারিও হয়তো তার দলে নতুন যোগ দেয়া নেটিভদের জন্য কিছু মনোহারী সামগ্রী কিনবে। শাভান্তিদের আবার এ সব তুচ্ছ অলংকার পছন্দ নয়। তাদের *কাপিতাও* বা সর্দার বুরিটি অবশ্য আগেই বলে দিয়েছে এতসব মালপত্রসহ আহত সাদা অভিযাত্রীকে বহন করে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

হারবিন মাত্তেতে চুমুক দিতে দিতে নতুন পোর্টারদের কথা ভাবছিলেন। চার কুৎসিত দর্শন বেঁটে ইণ্ডিয়ান। এদেরকে মারিও ভাড়া করেছিল। পরনে নোংরা, ছেঁড়া ল্যাঙট, মাথায় হেডব্যাণ্ড জড়ানো, লম্বা লম্বা আঠালো চুল সাপের মত এঁকেবেঁকে আছে। এরা উরুবু উপজাতির লোক। স্যর সেডরিক ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন বেলেমে ইণ্ডিয়ানদের ইন্সপেক্টর এদের সম্পর্কে যেন কী বলেছিল? 'শকুন মানব'—এ নামেই এদেরকে অভিহিত করেছিল সে। এদের কি নরমাংস ভক্ষণের ইতিহাস আছে? মনে পড়ছে না হারবিনের। চার উরুবুই ছিল সম্পূর্ণ সশস্ত্র—ধনুক, পাঁচ ফুট লম্বা তীর, বর্শা আর ব্লো-গানে সজ্জিত। এরা ছিল একটা শিকারী দল। পথ চলতে লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মারিওর। এদের কেউ একটা রুপোলি-কালচে রঙের ইগুয়ানার দিকে ব্লো-গান দিয়ে বিষাক্ত বাণ ছুঁড়েছিল, অল্পের জন্য মারিওর গায়ে লাগেনি। অস্বস্তি নিয়ে জানিয়েছিল ব্রাজিলীয় গাইড।

'অল্পের জন্য ফাঁড়া কেটেছে ব্যাটার,' তাঁবুর তালিমারা ছাতের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন হারবিন। 'ওদেরকে কক্ষনো বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে যখন সঙ্গে থাকে ডায়ানার মত সুন্দরী, অল্পবয়েসী, রোমাণ্টিক মেয়ে!'

'হাহ্? সেনর কিছু বললেন?' কালো বাদামি মঙ্গোলিয়ান মুখে সাদা ধবধবে

দাঁত ছড়িয়ে জানতে চাইল শাভান্তি ছোকরা। ফার্ন দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করে চলেছে স্যর সেডরিককে।

'কী? ওহ্! না। কিছু বলিনি।' খেঁকিয়ে উঠলেন হারবিন। 'আমার মাথার ওপর ঝুলে থাকা হারামজাদা ট্যারানটুলাটাকে সরাও। ওটা আমার গায়ে পড়বে।'

'সি, সেনর।' দ্রুত নির্দেশ পালন করল ছেলেটি। ডায়ানা কথা দিয়েছে ঠিকঠাক কাজ করলে সে ওকে ওর ফোঁড়ানো কানের জন্য তার স্বামীর একজোড়া কাফলিংক দেবে।

চোখ বুজলেন হারবিন। ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ আর ঝিঁঝির ঐকতানে ঘুমঘুম ভাব আসছে। তবে মাঝে মধ্যেই চমকে উঠছেন কাছেপিঠে কোন অ্যানাকোণ্ডার হিসহিস শব্দে কিংবা কোন অ্যালিগেটরের ঝপাৎ করে পানিতে নেমে পড়ার আওয়াজে। কুমিরগুলো নদীর ধারে আস্তানা গেড়েছে। পিয়াম মাছিদের যন্ত্রণা সয়েও অস্বস্তিকর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন হারবিন। একটা স্বপ্ন বারবার দেখলেন–তাঁর পরমাসুন্দরী স্ত্রীটি লায়ানার ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। সে হারবিনের নাম ধরে ডাকছে আর হাসছে, সামনে কোথাও আছে সে। তবে নাগালের বাইরে। তিনি *ফাসাও* নামে ধারালো ম্যাশেটি দিয়ে জঙ্গলের সবুজ দেয়াল কেটে কেটে অসহায়ের মত এগোতে চেষ্টা করছেন কিন্তু ঘামে ভেজা, অস্ত্রটি তাঁর হাত পিছলে পড়ে যেতে চাইছে–

ঘুম থেকে জাগার পরে নিজেকে অসাড় লাগল স্যর সেডরিক হারবিনের। মাথাটা ব্যথা করছে। দুপুরের উত্তাপে তেতে আছে তাঁবু। শাভান্তি ছেলেটা তাঁর জন্য নাস্তা নিয়ে এল–সারসপাখির রোস্ট, ফারিনহা নামে প্রচণ্ড মিষ্টি মিঠাই, টফি স্বাদের রাপাডুরা এবং গেঁজানো আখের রস দিয়ে তৈরি কফি। হারবিন বিরক্তির মুখভঙ্গি করলেন, তির্যক দৃষ্টিতে দেখলেন ছেলেটাকে, তার কালো চোখজোড়া অদ্ভুত উত্তেজনায় চকচক করছে। তবে শান্ত গলায় কথা বলার সময় তার আচরণে কিছুই প্রকাশ পেল না।

'*Bon dia! Senhor durmiou bem?*' মৃদু গলায় জানতে চাইল সে।

'*Muita bem,*' ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন হারবিন। হাই তুললেন। 'সেনোরা কোথায়? সে ব্রেকফাস্ট খেয়েছে?'

এবারে উজ্জ্বল হাসল ছেলেটা, তার মুখ যেন এখন এক দুর্ভেদ্য মুখোশ, ধারণ করে আছে জঙ্গলের রহস্য।

'*সেনোরা, পে পে,*' ঘোষণা করল সে, তারপর পর্তুগীজ এবং ইংরেজির মিশেলে বলল, 'সেনোরা চলে গেছেন, সেনর। সেনর মারিও চলে গেছেন। বলেছেন আপনি ঘুমাবেন। আপনি অসুস্থ। জাগানো যাবে না।'

'কী! এরই মধ্যে ওরা চলে গেছে?' হতাশ দেখাল স্যর সেডরিককে। তারপর কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'বেশ–অবশ্য কাল সূর্যাস্তের মধ্যে ওরা ফিরে আসবে। মাতুরা এখান থেকে কয়েক মাইলের পথ। ওরা–' থেমে গেলেন তিনি শাভান্তি ছোকরার হাসি মুখ আর চোরা চাহনি দেখে। অবাক লাগল তাঁর। 'এই, তুই হাসছিস কেন রে?' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

জবাবে ছেলেটা দৌড়ে গেল তাঁবুর দরজায় এবং ইশারায় কাউকে ডাকল।

সন্ত্রস্ত চেহারার এক বৃদ্ধ, বোধহয় ছেলেটার বাপ কিংবা বড় ভাই–শুকনো মুখে ভেতরে ঢুকল। সাদা মানুষটা রেগে উঠলে ঝেড়ে দৌড় দেয়ার জন্য প্রস্তুত।

'সেনর? প্লিজ!' তোতলাচ্ছে সে। 'এ হলো বুরিটি, সর্দার।' নিচের ঠোঁটে ঝুলতে থাকা তালগাছের শুকনো পাতা দেখেই তাকে চিনে ফেললেন হারবিন। পাতাটা তার লোমশূন্য বুকের ওপর সুচাল দাড়ির মত ঝুলছে। 'সেনর?' বলল সে আবার। 'উপহার দেবেন? বুরিটি বললে উপহার দেবেন?'

'কী বললে তুমি, বকবকে বানর?' ধমকের সুরে বললেন স্যর সেডরিক। তিনি কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হওয়ার চেষ্টা করলেন। পেটের পেশীতে টান লাগল। 'অ্যাঁ? ঠিক আছে, ঠিক আছে উপহার পাবে। এখন বলো!'

শাভান্তি সর্দার দুলছিল, তাঁবুর খুঁটি ধরে সামলে নিল নিজেকে। হারবিন বুঝলেন ব্যাটা মদ খেয়েছে। মদের গন্ধ বেরুচ্ছে ভকভক করে। বার দুই কথা বলার চেষ্টা করল বুরিটি, পিটপিট করল চোখ, হাসল বেকুবের মত, তারপর হড়বড় করে বলল:

'সেনোরা। সেনোরা এবং সেনর মারিও রিও যায়নি। মাতুরা যায়নি। ছেলেদের নিয়ে গেছে–' সে প্রথমে একটি, পরে দুটি আঙুল তুলল। 'তারা ভেগেছে। গোয়াজ গেছে। তারা আর ফিরবে না কো।'

'কী!' ভাঙা পাঁজরে তীব্র ছুরির খোঁচা বিস্মৃত হয়ে উঠে বসলেন হারবিন। 'তুমি মিথ্যা বলছ!' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। 'আমি–আমি তোমার মাথা ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলব, মিথ্যাবাদী শয়তান! হাবিজাবি কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব।'

কুঁকড়ে গেল বুরিটি, প্রবল বেগে মাথা নাড়ছে। 'মিথ্যা না! মিথ্যা না, *কাপিতাও*! সত্যি! আমি মিথ্যা বলছি না–আমি ভাল ইণ্ডিয়ান!'

লোকটার গায়ে কিছু ছুঁড়ে মারার জন্য উন্মত্তের মত খুঁজলেন স্যর সেডরিক। তার আগেই পাঁই করে ঘুরে এক লাফে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে শাভান্তি সর্দার, শুনল পেছন থেকে তাকে গালাগালি দিচ্ছেন সাদা মানুষটা।

ক্যাম্প খাটে এলিয়ে পড়লেন হারবিন। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। ব্যাণ্ডেজের নিচে ব্যথাটা ঘাই মারছে বুকে; আধা মেরামত হওয়া-পাঁজরগুলো বোধহয় আবার আলগা হয়ে গেছে। নির্জলা অসহায়ত্বের ক্রোধ এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে নিস্পেষণ করল। ইণ্ডিয়ানটা মিথ্যা বলছে; অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে! তাঁর শরীরের এরকম অবস্থায় ডায়ানা তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। নাকি পারে? একজন প্রৌঢ় স্বামী তার পরমাসুন্দরী, তরুণী স্ত্রীর ব্যাপারে আদৌ কি নিশ্চিত থাকতে পারে?

দাঁতে দাঁত চেপে, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ, জোর করে খাটিয়ায় শুয়ে রইলেন স্যর সেডরিক। একটি গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল শাভান্তি কিশোর, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে তাঁকে বাতাস করতে লাগল। হারবিন বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তাকে চলে যেতে বললেন। পরে আবার পিছু ডাকলেন।

'খোকা–?' ইতস্তত করছেন তিনি, দ্বিধাগ্রস্ততার কারণে নিজের ওপরেই রেগে

উঠলেন। 'খোকা? তুমি—? তুমি কি জানো সেনর মারিও কোথায় গেছে? নদীর উজানে নাকি ভাটিতে?'

'জানি না, *কাপিতাও*,' শ্রদ্ধাভরে চোখ নামাল ইণ্ডিয়ান ছেলেটা তবে তার ভাবলেশশূন্য চেহারায় গোপন অবজ্ঞা চোখ এড়াল না হারবিনের।

'কেউ কি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে পারবে? কোন ট্র্যাকার? একজন ট্র্যাকার বলতে পারবে *বাতালাও* কোন্ পথে গেছে, তাই না?' চাপ দিলেন স্যর সেডরিক।

'ট্র্যাকার, *কাপিতাও?*' বলল শাভান্তি। 'জি, ট্র্যাকার বলে। তবে ব্রুহো আরও বেশি জানে। সেনোরার বাতালাওকে নিয়ে ব্রুহোকে জিজ্ঞেস করুন। ব্রুহো সব দেখতে পায়—আজ, গতকাল, আগামীকাল।'

'ব্রু—? ও হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

হাসি গোপন করলেন স্যর সেডরিক। মাত্তো গ্রেসোর ওই স্থানীয় উপজাতিদের অগাধ শ্রদ্ধা তাদের ব্রুহো বা ভূতের ওঝাদের প্রতি। ব্রুহোদের নাকি অসীম ক্ষমতা, শুনেছেন সেডরিক। ইণ্ডিয়ানদের ইন্সপেক্টর এবারের অভিযানে তাঁকে সঙ্গে একজন ব্রুহোকে নিতে বলেছিল। ব্রুহো ভাগ্য নিয়ন্ত্রক, চিকিৎসক এবং শাভান্তি কুলিদের সাধারণ পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে। ব্রুহোরা সাধারণত খুব বুড়ো হয়ে থাকে। বলিরেখায় ভরা মুখ, তাদের চোখে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, সবসময় আধখানা বুজে থাকে। এর কারণ অবশ্য ইয়াগি সেবন। ইয়াগি হলো লায়ানার লতা দিয়ে বানানো সবুজ রঙের এক ধরনের ভয়ঙ্কর মাদক। শাভান্তিদের ব্রুহো বা ভূতের ওঝা মুরিকাও এর ব্যতিক্রম নয়।

তবে হারবিন দ্রুত বিবেচনা করে দেখলেন জায়ানা এবং ওই চোরা ব্রাজিলিয়ান সম্পর্কে কেউ যদি সামান্যতম খবরও দিতে পারে তো এই মুরিকাই দেবে। সব ধরনের গুজব, স্থানীয় গসিপের ছিটেফোঁটা যা-ই থাক সমস্ত কিছুই পৌঁছে যায় ভূতের ওঝাদের প্রাচীন কানে।

'অফকোর্স, মুরিকা!' ইণ্ডিয়ান কিশোরের দিকে আঙুল তুললেন স্যর সেডরিক। 'যাও, ওকে নিয়ে এসো। এক্ষুনি!'

কিশোর শাভান্তি মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁবু থেকে ছুট দিল। একটু পরেই ফিরে এল সে, তাঁবুর পর্দা অনেকখানি তুলে ধরল জ্ঞানী বৃদ্ধকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জায়গা করে দিতে।

শাভান্তি উপজাতি, যাদের গড় উচ্চতা ছয় ফুটের বেশি, তাদের তুলনায় খুবই বেঁটে বলা যায় মুরিকাকে। তবে শিরদাঁড়া টানটান, মাথায় পালকের টুপি পরা, বলিরেখায় ভরা চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখে শ্রদ্ধা জাগে। বুড়োর মুখ এবং বুক লাল এবং কালো রঙে রাঙানো। নীলচে কালো রঙটির উৎস *জেনিপাপো* ফল, আর উরুকু শেরির রস দিয়ে বানানো হয়েছে লাল রঙ। তার হাড্ডিসার কোমরে বাঁধা লেজঅলা জাগুয়ারের চামড়া, কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত জড়িয়েছে চুরি করা টেলিগ্রাফের তামার তার। নিচের ফোঁড়ানো ঠোঁটে বানরের মস্ত একটা হাড় ঝুলছে। ফলে তার কথা সামান্য জড়িয়ে যায়। সে একদমই ইংরেজি বলতে পারে না, তবে খুব ভাল পর্তুগীজ জানে, সম্ভবত ক্রিশ্চিয়ান মিশন স্কুলে শিখেছে।

তারপর হয়তো ব্ল্যাক ম্যাজিকে ঝুঁকেছে। তার গলার স্বর গম্ভীর এবং নরম, অনেকটা দূরাগত ওঝো বাদ্যযন্ত্রের মত। লোকটার ঠোঁটের কোনায় ফুটে আছে হাসি। তাকে বেশ পছন্দই হলো স্যর সেডরিকের।

'মুরিকা?' বুড়ো ইণ্ডিয়ানকে তিনি স্বাগত জানালেন। একটু থেমে থেমে বললেন, 'আ-আমি তোমাকে ডেকেছি–'

উদাস চেহারায় মাথা দোলাল বৃদ্ধ ক্রুহো। তার সিগার হোল্ডারের মত দেখতে পাইপে কিছু ভেষজ চূর্ণ পুরল। হারবিনের বক্সখাটের পাশে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে তাঁবুর খুঁটির গায়ে হেলান দিল। কোন কথা না বলে চোখ বুজল সে, ধীরে ধীরে পাইপ টানছে। একটা অদ্ভুত কটুগন্ধে ভরে গেল তাঁবু, স্যর সেডরিকের মাথাটা কেমন হালকা হয়ে এল, সেই সঙ্গে অন্যরকম একটা অনুভূতি হচ্ছে। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বিরক্ত বোধ করলেন।

'শোনো,' বললেন তিনি। 'আমার তুকতাক করার সময় নেই। শুধু আমাকে বলো তুমি জানো কিনা কোন্ পথে আমার–'

শাভান্তি কিশোর হিসিয়ে উঠল, মাথা নাড়তে নাড়তে ইশারা করল কথা না বলতে। হারবিনের বাক্স খাটের বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে সে ফিসফিস করে বলল, 'সেনর–কথা বলবেন না। ক্রুহো *আয়াহুয়াসকা* পান করছেন। ওই ড্রাগ–'

'ওহ্,' অধৈর্য ভঙ্গিতে মুখ খিঁচালেন স্যর সেডরিক। 'আমি জানি ওটার কথা। ওটা সোডিয়াম পেন্টাথলের মত কাজ করে। অবচেতন মনকে উজ্জীবিত করে তোলে। সচেতন মন যা ভুলে গেছে, তা মনে করিয়ে দেয়। হুঁ।' তিনি গড়ান দিয়ে কাত হলেন, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন বুড়োর দিকে। সে বসে নিঃশব্দে দুলে দুলে ধূমপান করছে।

ক্রুহো চোখ মেলল। কেমন নিদ্রাচ্ছন্ন অদ্ভুত চাউনি। হারবিনের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু তাকে দেখছে না। তার দৃষ্টি যেন চলে গেছে হারবিনকে ফুঁড়ে, ময়লা তাঁবুর দেয়াল ভেদ করে দূরে, অনেক দূরে জটপাকানো জঙ্গলে। খুব ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করল বৃদ্ধ ওঝা, শাভান্তি ভাষায় গুনগুন করে গানের সুরে বলছে, তারপর পর্তুগীজ ভাষায় কথাগুলো বলল। হারবিনের বেশ কষ্টই হলো এর অর্থ উদ্ধার করতে।

'...ওরা সূর্যোদয়ের দিকে যাচ্ছে। বাতালাও ধীরে হাঁটছে, সঙ্গে তিন শাভান্তি কুলি। সুহাসিনী ঘুমায় টলডো'র নিচে। লোকটা তাকে পাহারা দেয়...এখন সে গুলি করে, হত্যা করে লাল টকটকে *আরারা*। সে পালকগুলো নিয়ে আসে সেনোরার জন্য। সেনোরা হাসে, তাকে ধন্যবাদ দেয় এবং পালকগুলো গুঁজে রাখে তার সোনালি চুলে...'

একটা গালি দিলেন স্যর সেডরিক। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে আবার টেনে তুললেন শরীর। এসবই নিরর্থক বকবক, এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই, নিজেকে বললেন তিনি। সত্যি কি তাই? বুড়ো বলেছে ওরা সূর্যোদয়ের দিকে যাচ্ছে। তারপর বাতালাও পুবে গোয়াজের দিকে নৌকা নিয়ে গেছে, বুরিটি যেভাবে বলেছে; পশ্চিমে মাতুরায় নয়। ক্রুহো কি নিশ্চিত জানে ওরা কোথায় গেছে? নদী তীরে বুনো জানোয়ারদের চলার পথে কত না পায়ের ছাপ রয়েছে–জাগুয়ারের

গোল পদচিহ্ন, তাপিরের তিন আঙুলে বড় বড় পায়ের ছাপ, ক্যাপিবারাদের চ্যাপ্টা পায়ের ছাপ, ভেড়া সাইজের ওয়াটার গিনিপিগদের পায়ের ছাপ। এতসব পায়ের ছাপ থেকে বুড়ো ওঝা কী করে বুঝবে বাতালাও কোথায় গেছে? নাকি পুরোটাই তার অনুমান?

'...এখন সে গান গাইছে,' মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগল মুরিকা। 'সে এ গানটি খুব পছন্দ করে, পরিষ্কার শোনা যায় তার গান...' ভূতের ওঝা গুনগুন করতে লাগল। হারবিনের চাঁদির কাছটা শিরশিরিয়ে উঠল গানের কথা বুঝতে পেরে। এটি নোয়েল কাওয়ার্ডের গাওয়া গান Never Try to Blind Me। ডায়ানার ভীষণ পছন্দের গান। এক্সপ্লোরার'স ক্লাবে সেই রাতে তরুণ ফরেস্টারের সঙ্গে নেচে নেচে এই গানটিই গাইছিল ডায়ানা–

অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার এই যে, ইংরেজির অর্থ বিন্দুমাত্র না বুঝে এ গানটি গাইছে মুরিকা:

'নেভার ট্রাই টু ব্লাইণ্ড মি,
নেভার ট্রাই টু হোল্ড...
টেক মি অ্যাজ ইউ ফাইণ্ড মি,
লাভ অ্যাণ্ড লেট মি গো...'

শাভান্তি গায়কের কাছে এ গানের কোন শব্দই অর্থ বহন করে না কিন্তু প্রতিটি শব্দ স্যর সেডরিকের বুকে ছুরি চালিয়ে দিল।

'থামো!' ভয়ঙ্কর গলায় বললেন তিনি। 'এসব–এসবের কোন মানে নেই। কীভাবে...কীভাবে তুমি এ গান শুনতে পেলে যদি সত্যি ওরা চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে নদী পথে রওনা হয়ে গিয়ে থাকে?'

জবাবের জন্য চোখ বুজল বুড়ো ক্রুহো। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাল শ্বেতাঙ্গ মানুষটির দিকে। তার চোখে আর আগের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটি নেই। সে আসনপিঁড়ি অবস্থা থেকে সিধে হলো, শান্ত ভঙ্গিতে দাড়াল হারবিনের খাটিয়ার পাশে, অপেক্ষা করছে। কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্যর সেডরিক, তারপর শ্রাগ করে বুড়ো ইণ্ডিয়ানের হাতে সস্তা তামাকের একটা দলা তুলে দিলেন। সে সসম্মানে উপহারটি গ্রহণ করল।

'আর কিছু জানতে চান, *কাপিতাও?*' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল সে। মুরিকা অতীতে দৃষ্টিপাত করেছে–রিওতে বিয়ের পাদ্রে (প্যারেড) দেখেছে। *কাপিতাও* সুহাসিনীর হাতের আঙুলে আংটি পরাতে গিয়ে তাড়াহুড়োর কারণে সেটি ফেলে দিয়েছেন। সোনালি গোঁফের এক লোক সেটি তুলে নিয়েছে এবং সেটি ফেরত দিয়েছে–'

হারবিনের খুলিতে আবার শিরশিরানি ভাব হলো। 'কিম্বল!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'সে–সে ছিল আমার মিতবর–বেস্টম্যান। আমার হাত থেকে আংটিটি পড়ে গিয়েছিল...তুমি এ কথা কী করে জানলে...? আমার আর ডায়ানার কথা শুনে ফেলেছিলে নাকি? তাই হবে নিশ্চয়ই।' তাঁর গলার স্বর ভেঙে গেল। কপালের ঘাম মুছলেন চুপিসারে। 'নিশ্চয়ই তাই...এর মধ্যে অপ্রাকৃত কোন বিষয় নেই।'

মুরিকার চেহারায় ফুটে থাকা ভাবলেশশূন্য ভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। তার বলিরেখা ভরা মুখটা স্যর সেডরিকের আত্মবিশ্বাস কেমন টলিয়ে দিচ্ছে, নিজেকে আত্মপ্রত্যয়হীন লাগছে।

'আমি কি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করব বলে আকাঙ্ক্ষা করেন, *কাপিতাও?*' বুড়ো শাভান্তি ভদ্রভাবে জানতে চাইল। 'আয়াহুয়াসকা সব দিকে তার চোখ পাঠায়। কেউ কেউ তা দেখতে পায়–কী ঘটেছে, কী ঘটছে এবং কী ঘটবে।'

'তুমি তো সকল কাজের কাজী,' নাক সিটকালেন স্যর সেডরিক। 'ঠিক আছে!' খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

'কী ঘটবে বলো? আমার বউ এক হারামজাদা ব্রাজিলিয়ানের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। সে কি আর ফিরে আসবে?'

মুরিকা পাইপে একটা টান দিল, তার চোখে আবার সেই মাদকাসক্তদের নিদ্রালু ভাব চলে এল, বড় বড় হয়ে গেল চোখের মণি, চোখের তারার রঙিন অংশ বা কনীনিকা দেখা যাচ্ছে না। হারবিন তাজ্জব হয়ে তাকে লক্ষ করছেন। তাঁর পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ঠেকছে।

বড় বড় চোখ করে তাকাল মুরিকা, দুলছে। তার গলার স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ শোনাল, প্রতিধ্বনি তুলল। যেন কয়লার খনিতে কেউ চিৎকার করছে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে স্বর।

'আমি দেখছি...' সুর করে বলতে লাগল সে। 'আমি শুনছি...সুহাসিনী...চিৎকার করছে। এটি লেখা আছে তারায় তারায়...*কাপিতাও* তাকে সারা জীবন নিজের কাছে রাখতে পারবেন, সেনোরার সেই হাসিমুখ। তবে...'

'কী তবে?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইলেন হারবিন। 'বলো?'

'এটিও লেখা আছে তারায় তারায়।' ক্ষীণ গলায় বলল মুরিকা, 'যে ওই দৃশ্য কাপিতাওকে পাগল বানিয়ে দেবে। আমি এই-ই দেখলাম আর কিছু নয়।'

স্যর সেডরিক কম্পিত নিঃশ্বাস ফেললেন। যত্তসব রাবিশ। কিন্তু...নোয়েল কাওয়ার্ডের ওই গান, তারপর আংটি পড়ে যাওয়ার ঘটনা। এবং কিম্বলের সোনালি মোচ...তিনি এবং ডায়ানা কখনওই এ বিষয়টি আলোচনা করেননি মুরিকা শুনবে কোত্থেকে? আসলে চাল্লু ব্যাটা আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। তবু–

ক্যাম্প খাটে শুয়ে রইলেন তিনি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। এত জোরে চেপে ধরেছেন মুঠো, নখের আঘাতে তালু ফুটো হয়ে রক্ত বেরুল। কব্জি গড়িয়ে পড়ল। হারবিন খেয়াল না করলেও মুরিকা ঠিকই লক্ষ করেছে। সে সাদা মানুষটির খাটিয়ার ধারে চলে এল। জাগুয়ারের চামড়ার ভেতরে লুকিয়ে রাখা একটা বানরের খুলি বের করে শূন্যে বারকয়েক ঝাঁকাল সে। তারপর ওটা হারবিনের কপালের ওপর রাখল।

'*কাপিতাও,*' বলল বুড়ো, 'প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা অনেক ভাল...

প্রত্নতত্ত্ববিদ জোরে মাথা নাড়তেই খুলিটা ছিটকে গিয়ে পড়ল মাটিতে। তিনি মুরিকার দিকে রোষকষায়িত নয়নে তাকালেন।

'ভাগো এখান থেকে!' দাঁতে দাঁত ঘষলেন তিনি, তাঁর কপাল এবং ওপরের ঠোঁটে ঘাম জমেছে। 'আমাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাইছ? আমাকে পাগল বানাবার মতলব? গেটআউট!'

আবার শরীরটাকে টেনে তুললেন তিনি, হাঁপাচ্ছেন, গালাগাল দিচ্ছেন। শাভান্তি কিশোর আবার গিয়ে আড়াল নিল গাছের গুঁড়ির পেছনে। কিন্তু বুড়ো ক্রুহো ধমকে ভয় পেল না, সে বোঝাবার ভঙ্গিতে অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁবুর প্রবেশ পথে পা বাড়াল।

'হিংসা,' ভাঙা ভাঙা পর্তুগীজে বলল সে, 'বিষের মত, *কাপিতাও*। সেনর সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তা যেখানে দুইভাগ হয়ে আছে। একটু ভাবুন!'

'দূর হও!' গর্জন করলেন হারবিন, লাউয়ের খোল দিয়ে তৈরি চায়ের কলসীটা বুড়ো ইণ্ডিয়ানের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। টার্গেটের কাছে পৌঁছে বিচিত্র বাঁক নিল মিসাইল। পড়ল মেঝের ওপর। আবারও শিউরে উঠলেন শ্বেতাঙ্গ সাহেব; তিনি শুনেছেন ক্রুহোরা ছুঁড়ে মারা তীর কিংবা ব্লো-গানের বাণ সহজেই পথচ্যুত করতে পারে। এটা অসম্ভব, মনে মনে বললেন তিনি।

পাঁজরের প্রচণ্ড ব্যথা সয়ে দাঁতে দাঁত চেপে স্যর সেডরিক শুয়ে পড়লেন বিছানায়। তাঁর কপালে এখন ঘামের ধারা। তাঁবুটাকে মনে হচ্ছে বাষ্প ঘর। বাইরে থেকে ঝপাং শব্দ ভেসে এল। হয়তো কোন অ্যালিগেটর নদী তীর থেকে লাফিয়ে পড়েছে পানিতে। শোনা গেল *সিগানা*-র হিসহিস, বাজপাখির ঈর্ষান্বিত ডাক। কুলিরা তাদের খাটো ধনুক এবং পাঁচ ফুট লম্বা তীর দিয়ে শাপলা পাতা মাছ শিকার করছে। মাছটি নিজের ভোগে লাগাতে পারবে না বলেই বাজপাখির হিংসে। হারবিনের মন চলে গেল নদীর উজানে যেখানে এক অপূর্ব সুন্দরী স্বর্ণকেশী কন্যা আর সুদর্শন এক ব্রাজিলীয় যুবক পাম গাছের পাতার চাঁদোয়ার নিচে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। হয়তো তারা এখন একজন অপরজনকে চুমু খাচ্ছে, তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার মত জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

ব্যথা এবং রাগের গোঙানি বেরিয়ে এল হারবিনের গলা দিয়ে। ডায়ানা। ডায়ানা। তিনি যা ভাবছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি। ডায়ানা ওই ছোকরার জন্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। তিনি আর কোনদিন ওই ঝলমলে হাসি মুখখানা দেখতে পাবেন না যাকে শাভান্তিরা বলে *রিসান্তে* বা সুহাসিনী।

কঠোর হয়ে এল হারবিনের চোখ। ওই মেয়ে সারাক্ষণই হাসছে! ও কি সত্যি ওইরকম হাসিখুশি নাকি পুরো ব্যাপারটা লোক দেখানো? এই আমেরিকান মেয়েগুলো, এদের মনে কোন গভীরতা নেই। বড্ড প্রথাবিরোধী। হয়তো মেয়েটা তাঁকে বিয়ে করেছিল স্রেফ মজা করার জন্য। যখন একঘেয়ে লাগবে তখন তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিল! তাঁকে ফেলে রেখে গেছে এই দাঁত বের করা যাচ্ছেতাই নেটিভগুলোর মাঝে। তাঁকে বেলেমে ফিরতে হবে হয়তো কোন গাইডের সাহায্য ছাড়াই।

মারিওর কথা মনে পড়তে স্যর সেডরিকের চোয়াল শক্ত হলো। হারামজাদা বদমাশ ব্রাজিলিয়ান! যদি ওদের পিছু নেয়া যেত, যদি ওর গলাটা একবার

দু'হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যেত! জিঘাংসায় তাঁর হাত নিশপিশ করতে লাগল। তিনি হাঁক ছাড়লেন:

'ছোকরা! অ্যাই, ছোকরা! কোথায় গেলি তুই?' শাভান্তি কিশোর ভয়ে জড়সড় চেহারা নিয়ে গাছের গুঁড়ির পেছন থেকে বেরিয়ে এল। 'বুরিটিকে আবার খবর দাও!' ঘাউ করে উঠলেন হারবিন। তারপর মাথা নাড়লেন। 'না, না–ও যাবে না। এটা উরুবুদের এলাকা। আহ–!' তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'ওই নতুন মুটেগুলো! যাও, ওদেরকে ডেকে নিয়ে এসো। এক্ষুণি!'

হুকুম তামিল করতে ছুটল ইণ্ডিয়ান ছেলেটি। কাফলিংকজোড়া শেষ পর্যন্ত উপহার পাবে কিনা তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত। সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চার গাঁট্টাগোট্টা উরুবুকে নিয়ে হাজির হলো। হারবিন তাদের আপাদমস্তক দেখলেন। এখনও রাগে কাঁপছেন। পর্তুগীজ ভাষায় তিনি আদেশ দিলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা শাভান্তিতে। কিন্তু শকুন মানবরা তাঁর কথা কিছুই বুঝতে না পেরে নির্বোধের মত হাসতে থাকল। দাবড়ি দিলেন হারবিন, শরীরী ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

'সেনোরা...' তিনি শূন্যে একটি নারী দেহের ছবি আঁকলেন।

'বুঝেছ? আমি চাই তোমরা...ওকে নিয়ে আসবে,' বুক ঠুকে নিজেকে দেখালেন তিনি।

উরুবুদের নেতা, কুটিল চোখের এক মুশকো ইণ্ডিয়ান, এক চোখের নিচ থেকে মুখ পর্যন্ত লম্বা কাটা দাগ, হঠাৎ মাথা ঝাঁকাল, অপর তিনজনকে দ্রুত কী যেন বলল। তারা জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে সায় দিল, বোঝার দুঃসাধ্য কয়েকটি শব্দ হড়বড় করে উচ্চারণ করল। সামনে এগিয়ে এল দলনেতা, কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলছে।

'*তুরি?*' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে বলল সে, তারপর হারবিনকে ইঙ্গিত করে ইশারায় জঙ্গল দেখাল, 'মন?'

'ওহ–হোয়াইট ম্যান? সাদা মানুষ মারিও?' হারবিনের মুখ ঘেন্নায় কুঁচকে গেল। 'জাহান্নামে যাক মারিও!' ঘোঁত ঘোঁত করলেন তিনি। 'তোমরা ওকে নিয়ে যা খুশি করতে পার আমার কিছু আসে যায় না!' তিনি খারিজ করার একটি ভঙ্গি করলেন। তা দেখে উরুবু নেতা আনন্দিত চিত্তে হাসল, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে গলা কেটে ফেলার ভঙ্গি করল। শিশুকে মাছি বা মশার ডানা ছিঁড়ে ফেলার অনুমতি দিলে সে যেমন উৎকট উল্লাস বোধ করে উরুবু নেতার চেহারায় তেমনই ভাব ফুটল।

তারপর ওরা চলে গেল যেন এক ঝাঁক আবর্জনাখেকো পাখি বকবক শব্দ করতে করতে দূর হলো। হারবিন শুয়ে পড়লেন খাটিয়ায়, ক্লান্তিতে চোখ বুজলেন। এক দুইদিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন হালকা *মন্তারিয়া*'য় চড়ে উরুবুরা অপর নৌকাটিকে ধরে ফেলতে পারবে। আর ওরা যদি মানুষখেকো হয়ে থাকে, ইণ্ডিয়ানদের ইন্সপেক্টর যেভাবে সতর্ক করেছিল হারবিনকে, তাহলে সোনায় সোহাগা। বাছাধন মারিওর আর রক্ষা নেই! তিনি অসহায়, পঙ্গু অবস্থায় পড়ে আছেন বিছানায় আর সেই সুযোগে তাঁর বউকে নিয়ে ভেগে যাওয়া! মজা এবার টের পাবে হারামজাদা। ডায়ানাকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তাঁর কাছে। তারপর

ডায়ানার একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন।

অপমানের অশ্রু ঝরছে হারবিনের বন্ধ দুই চোখের কোণ বেয়ে। ডায়ানা–কী করে সে তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করতে পারল? কিন্তু ও তো একটা বাচ্চা মেয়ে সহজেই যাকে পটানো যায়, খুব বেশি রোমান্টিক। ক্ষমা? বুড়ো মুরিকা বলেছিল না প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা শ্রেয়তর? তিক্ত হাসলেন স্যর সেডরিক। হয়তো একটা সময়ের পরে তিনি ওকে ক্ষমা করে দেবেন। ডায়ানাকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন, যদিও মনের মধ্যে প্রিয়তমা স্ত্রীর ওই সুদর্শন ব্রাজিলীয়টার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার স্মৃতি মাঝেমধ্যেই হানা দেবে। নাহ্, এমনটি আসলে ঘটবে না। হারবিনের হাসিতে এবারে প্রসন্নতা। তিনি একজন সুসভ্য মানুষ। মুরিকা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল ডায়ানার হাস্যমুখ তাঁকে উন্মাদ বানিয়ে দেবে, কথাটি ঠিক নয়। তিনি এমনিতে স্ত্রীর প্রেমে পাগল, সে ঠিক আছে। তবে তার বিশ্বাস ডায়ানার এই দুঃসাহসী পলায়ন পর্বকে ক্ষমা করে দিলে সে তাঁকে আরও ভালবাসবে, সত্যিকারের ভালবাসবে।

'আকু!' নদীর ধার থেকে এক শাভান্তির চিৎকার ভেসে এল। হয় সে বর্শায় *পিরারা* বা পিরানহা গেঁথেছে কিংবা ওই রাক্ষুসে মাছের কামড় খেয়েছে নগ্ন পায়ে। মাছগুলো আকারে ছোট হলে কী হবে, স্বভাব বড়ই ভয়ঙ্কর। দুই মিনিটে একটা আস্ত মানুষের মাংস খেয়ে তার কংকাল বের করে ফেলে।

'আকু!' আবার ভেসে এল চিৎকার। ওই জংলীদের কাছে 'আকু' মানে 'হ্যালো' কিংবা 'হুররে' অথবা 'বাবারে'। ভাব প্রকাশ নির্ভর করে ঘটনার ওপর। হারবিন এদের সরলতার কথা ভেবে হাসলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি একটা। নড়েচড়ে শুলেন। স্ত্রীকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। এখন শুধু তার জন্য অপেক্ষা। শাভান্তি কিশোর জোরে জোরে ফার্নের পাতা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। সসম্ভ্রমে তাকিয়ে আছে হারবিনের ঘুমন্ত মুখের দিকে।

স্যর সেডরিক সারা রাত তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখলেন। পরদিন এবং তারও পরের দুটো দিন বাধ্যগতের মত শুয়ে থাকলেন ক্যাম্প খাটে। কুইনাইন সেবন করলেন, তাঁর জন্য যে খাবার নিয়ে আসা হয়েছিল তা খেলেন। ডায়ানার কথা ভেবে প্রায়ই তাঁর মাথা গরম হলো। স্ত্রীকে ক্ষমা করার কথা ভাবলেও মনে মনে তাকে শতবার বকা দেয়ার চিন্তা করলেন। কেন সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল? এই ভেবেই ক্ষণে ক্ষণে হারবিনের মেজাজ গরম। কল্পনায় দেখলেন তিনি ডায়ানাকে বকাবকি করছেন, সে ঝরঝর করে কাঁদছে, তারপর তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত গলায় বলছে তাকে যেন মাফ করে দেয়া হয়। স্ত্রীর ক্রন্দনরত মুখ দেখলে তাকে তিনি মাফ না করে পারবেন না জানেন স্যর সেডরিক। তিনি এখন শুধু চাইছেন ডায়ানা ফিরে আসুক তাঁর কাছে, তার হাসি মুখখানা দেখতে চান হারবিন। এমনভাবে হাসবে ডায়ানা যেন কিছুই ঘটেনি।

তবে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে স্যর সেডরিকের মনে। মারিওকে

সাজা দেয়ার কথা বললে উরুবু সর্দার কেমন অঙ্গভঙ্গি করেছিল মনে পড়ছে। আচ্ছা, ডায়ানা যদি সত্যি ওই ছাগলটাকে ভালবেসে ফেলে? তাঁর কি অধিকার আছে—? কিন্তু জঙ্গলের একজন গাইডের সঙ্গে কীভাবে জীবন কাটাবে ডায়ানা? মুখ ভেংচালেন হারবিন। বদমাশটার কপালে যা ঘটে ঘটুক ওটাই তার পাওনা। ব্রাজিলে কেউ যদি সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে নিয়ে ভেগে যায় তাহলে তাকে হত্যা করা কিংবা হত্যার আদেশ দেয়া জায়েজ। তাছাড়া—হাসলেন স্যর সেডরিক—তিনি উরুবু সর্দারকে ঠিক ওভাবে কোন হুকুমও দেননি; ইণ্ডিয়ানটা হয়তো তাঁর কথার ভুল অর্থ করেছে।

শকুন মানবরা চলে যাওয়ার পঞ্চম দিনে বুড়ো মুরিকা নিঃশব্দে হারবিনের তাঁবুতে ঢুকল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা সাদা মানুষটার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তারপর ধীর পায়ে হেঁটে গেল তাঁর কাছে।

'*কাপিতাও,*' মৃদু গলায় বলল সে, 'উরুবুদেরকে আপনি একটা হুকুম দিয়েছেন এবং কাজটা ঠিক হয়নি। সেনর দুই মাথার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং ভুল পথে বাঁক নিয়েছেন।'

চটে গেলেন হারবিন। ওই বিরক্তিকর বুড়োটা কি সারাক্ষণ তাঁর তাঁবুর ধারে কান পেতে থাকে? ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন তিনি, হাতের অধৈর্য ইশারায় ক্রুহোকে চলে যেতে বললেন। বুড়ো শয়তান কোথাকার! লাই পেলেই মাথায় উঠে বসে।

কিন্তু মুরিকা গেল না। তার বড় বড় চক্ষু জোড়ায় অস্থিরতা। আবার দূরাগত চাউনি ফুটল সেখানে। ক্রুহোর পাইপ থেকে আসা আয়াহুয়াসকার তীব্র, ঝাঁজালো গন্ধে আবার নাক কুঁচকে গেল হারবিনের। মুরিকা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু দৃষ্টি যেন তাঁকে ফুঁড়ে চলে গেছে অনেক দূর।

'আমি দেখছি...' নরম গলায় সুর করে বলছে সে, 'দেখছি...একটি হারানো শহর যাকে খেয়ে ফেলেছে জঙ্গল। বড় বড় পাথরের চাঁই, তাতে অদ্ভুত সব লেখা খোদাই করা। সুহাসিনী ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর লোকটা তার ছবি তুলছে।'

'আচ্ছা!' দাঁত কিড়মিড় করলেন স্যর সেডরিক। 'হারামীটা শুধু আমার বউকে ফুঁসলে নিয়েই যায়নি, আমার অভিযানেও নাক গলিয়েছে, অ্যাঁ? আমার জিনিস আবিষ্কার করে বাহবা নিতে চায়?' তাঁর চাউনি হিমশীতল। 'বেশ—যথেষ্ট হয়েছে। ওরা ওকে নিয়ে এবারে যা খুশি করুক।' তিনি ফোঁসফোঁস করছেন রাগে। 'আমি ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে বেশ করেছি। খুব ভাল কাজ করেছি!'

মুরিকা কিছু বলল না শুধু খুব আস্তে মাথা নাড়ল।

'জঙ্গলের মানুষদের দোষ দেবেন না, কাপিতাও। ওরা শিশুর মত। আপনার কথা বুঝতে না পারলে ওদেরকে অভিযোগ করবেন না। ওরা শুধু সেনরের আদেশ পালন করতে গেছে।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন হারবিন, সরু হয়ে এল চোখ। 'ঠিক আছে। আমি ওদেরকে বলেছি ওই ব্যাটাকে হত্যা করতে। তাতে তোমার কী, বুড়ো

ভাম?' খ্যাকখ্যাক করে উঠলেন তিনি। মুরিকার দিকে হাত তুলে বললেন, 'এখান থেকে বেরোও! ওরা কাল সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসবে–ব্যস, আমি আর কিছু চাই না।' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'আমি আর কখনও ওকে আমার চোখের আড়াল হতে দেব না! রোমান্টিক চাইল্ড। নিজেই জানে না কী করছে।'

তিনি মাত্তে'র কলসীতে হাত বাড়ালেন, এক চুমুক পানীয় গিলে নিয়ে আবার চুপচাপ শুয়ে থাকলেন। ক্রুহো মুরিকা চলে গেল। সেই রাতে, গুমট জঙ্গলের রাতে খুব কম ঘুম হলো স্যর সেডরিকের। শুধু স্ত্রীর কথাই ভাবলেন। পরদিন তীব্র গরমের মধ্যে সময় কাটাতে ইতিমধ্যে দুইবার পড়া পুরানো পত্রিকাটিতে আবার চোখ বুলাতে লাগলেন। পাঁজরের ব্যথাটা কমেছে। আগের মত আর ব্যথার সুচ ফোটাচ্ছে না। কাল কুলিদেরকে বলবেন তাঁকে নৌকায় তুলে দিতে। তিনি আর ডায়ানা মিলে ফিরে যাবেন সভ্য জগতে। নদী পথেই যাবেন যদিও সময় লাগবে বেশি। এই সবুজ নরকে অপ্রয়োজনে আর একটা দিনও তিনি ওকে রাখতে চান না। বেলেমে ফিরে ভাল একটা হোটেলে উঠবেন তাঁরা, মারিওর স্মৃতি ডায়ানার মন থেকে মুছে দিতে যা যা করা দরকার সব করবেন হারবিন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিয়ে ভরিয়ে দেবেন, তাঁর সঙ্গে উদ্দাম প্রেম করবেন।

একটা শোরগোল শুনতে পেলেন তিনি। ওই হল্লার আওয়াজ শোনার অপেক্ষাই করছিলেন তিনি, প্রার্থনা করছিলেন। উরুবুরা ফিরে এসেছে। তাঁবুর খোলা পর্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকল শাভান্তি কিশোর। বিস্ফারিত চোখ।

'কাপিতাও?' সশ্রদ্ধ ফিসফিসে গলায় বলল সে যেভাবে ক্রুহোকে সম্বোধন করে। হারবিন হাসছেন। *'কাপিতাও?* সেনর মারিও ওদের সঙ্গে নেই। আমাদের দলের তিনজন কুলি মারা গেছে কিংবা পালিয়েছে। তাবে–সুহাসিনীকে ওরা নিয়ে এসেছে সেনর যেরকম আদেশ দিয়েছেন।'

'আচ্ছা? ভাল, ভাল!' স্যর সেডরিক হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছলেন। তিনি একই সঙ্গে নার্ভাস এবং অধীর হয়ে আছেন। 'ওরা চলে এসেছে? ওদেরকে এখানে নিয়ে এসো। জলদি যাও! জলদি!'

তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেখার জন্য তৈরি হলেন। হয়তো দুই উরুবু দাঁত বের করে টানতে টানতে নিয়ে আসছে ডায়ানাকে। কিন্তু দলনেতা এল একা। একটুকরো কাগজ দিল হারবিনকে। কপাল কুঁচকে কাগজের লেখাটি দ্রুত পড়তে লাগলেন তিনি। লাফিয়ে উঠল কলজে। ডায়ানা লিখেছে চিঠিটা। ও যখন হারানো নগরীতে বসে চিঠিটি লিখছিল তখন শকুন মানবরা ওকে ধরে ফেলে। লেখাটি তাঁর স্ত্রীর নিষ্পাপ সারল্য, বিশ্বস্ততা এবং ভালবাসা ফুটিয়ে তুলেছে যে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন স্যর সেডরিক।

চিঠি পড়ার সময় নিজের ওপর ধিক্কার জন্মাল স্যর সেডরিকের কেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে অহেতুক সন্দেহ করেছিলেন। ডায়ানা লিখেছে:

প্রিয়তম,

আমি এই চিঠিটি একজন শাভান্তিকে দিয়ে তোমার কাছে পাঠাব। তুমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছ আমরা মাতুরা যাইনি এবং কখনও যাওয়ার

পরিকল্পনাও ছিল না। আমি মারিওকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলাম আমাকে যেন তোমার হারানো নগরীতে নিয়ে যায়। যাতে তোমার অভিযান ব্যর্থ না হয়। মাই ডিয়ার, আমি তো জানি এই এক্সপিডিশন তোমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমার ওই হতাশ চেহারা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিল। আমি তোমাকে বলিনি কারণ জানতাম তুমি আমাকে বাধা দিতে, কিছুতেই একা ছাড়তে না।

মারিও কিছু ছবি তুলেছে। আমি কয়েকটা তৈজসপত্র এবং পাথরের গায়ে লেখা হাইআরোগ্লিফের অনুলিপি তৈরি করেছি। ডার্লিং, তুমি এবং লেফটেনেন্ট কর্নেল ফসেট ও রিও'র ওইসব হাবিজাবি কাগজের কথাই ঠিক। এখানে একটি মন্দির আছে। ইনকাদের মন্দির। বলিদানের জন্য, একটি বেদী আছে সোনা এবং রূপা দিয়ে বাঁধানো–ইস, তুমি যদি দেখতে। তবে আমি ম্যাপ এঁকে ফেলেছি আমি আর তুমি এখানে আসতে পারব তোমার বুকের পাঁজর–

অসমাপ্ত চিঠিটি এখানেই শেষ। স্যার সেডরিক মুখ তুলে তাকালেন উরুবু সর্দারের দিকে। বনের কোন দানবের অশুভ সন্তানের চেহারা নিয়ে সে হারবিনের দিকে তাকিয়ে হাসছে। খুশি খুশি ভাব নিয়ে সে আবার মাথা ঝাঁকাল। *কাপিতাও*-এর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত। গলা কাটার সেই ভঙ্গিটি আবার করল সে। স্যার সেডরিকের কলজে কেউ চেপে ধরল বরফ ঠাণ্ডা হাতে, মনে পড়ে গেছে ইণ্ডিয়ানদের ইন্সপেক্টর উরুবু উপজাতি সম্পর্কে ঠিক কোন্ কথাটি বলেছিল। ওরা মানুষখেকো নয়। ওরা মুণ্ডু শিকারী।

শুকনো গলায় ঢোক গিললেন স্যার সেডরিক। তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীকে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে বাধ্য করেছেন? সে কি এজন্য তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে? তাঁকে ঘৃণা করবে না? সে কি–?

'রিসান্তে?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমার স্ত্রী–সে কোথায়? তিনি শূন্যে দ্রুত নারী শরীর আঁকলেন, তারপর ইঙ্গিত করলেন নিজের দিকে 'ওকে আসতে বলো। ওকে এখানে নিয়ে এসো। জলদি!'

শয়তানী হাসি হাসল উরুবু সর্দার, বারবার মাথা ঝাঁকাচ্ছে যেন শিক্ষকের কাছে বাড়ির কাজ দিতে পেরে গর্বিত ছাত্র। নিজের ভাষায় হাঁক ছাড়ল সে, কী যেন বলল। একটু পরেই তার দলের এক ইণ্ডিয়ান ঢুকল তাঁবুতে, হাতে একটি ছোট ঝুড়ি।

ইণ্ডিয়ান ঝুড়ির ঢাকনা খোলার আগেই এবং ভেতরের শুকিয়ে আসা ভয়ঙ্কর জিনিসটা দেখার আগেই–সেলাই করা ঠোঁট দুটো বেঁকে আছে বিকট হাসির ভঙ্গিতে, লম্বা, সোনালি চুল আলুথালু, তাতে শুকনো রক্ত–হারবিন উন্মাদের মত চিৎকার দিতে লাগলেন...

ইঁদুর

শুক্রবার। রাত দুইটা।

এলিভেটরের ধারে একটি বেঞ্চিতে বসে আছে হ্যাল। তিনতলায় এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে শ্রমিকরা ধূমপানের সুযোগ পায়। এমন সময় উদয় হলো ওয়ারউইক। ওকে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হ্যালের। এই গ্রেভইয়ার্ড শিফটে তিনতলায় ফোরম্যানের আসার কথা নয়। তার এখন বেসমেন্টে, নিজের অফিসে বসে, টেবিলের কিনারে রাখা মটকা থেকে কফি ঢেলে পান করার কথা। তাছাড়া গরমও পড়েছে খুব।

গেটস ফলসে জুন মাসে এত গরম কখনও পড়েনি। এলিভেটরের পাশে রাখা অরেঞ্জ ক্রাশ থার্মোমিটার একবার দেখিয়েছিল রাত তিনটার সময় তাপমাত্রা ছিল ৯৪ ডিগ্রি। ঈশ্বর জানেন ৩টা–১১টার শিফটে কারখানার দশা কোন্ নরক হয়ে ওঠে।

হ্যাল কাজ করে পিকার মেশিনে, ১৯৩৪ সালে বিলুপ্ত ক্লিভল্যাণ্ড ফার্মের তৈরি চৌকোনা একটি গ্যাজেট এটি। কারখানায় কাজ করছে সে এপ্রিল থেকে, তার মানে এখন তার ঘণ্টা প্রতি পারিশ্রমিক ১.৭৮ ডলার। অংকটা মন্দ নয়। কারণ সে বিয়েশাদী করেনি, স্থায়ী কোন গার্লফ্রেণ্ড নেই, সবরকম পিছুটান থেকে মুক্ত। তাই তো সে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে বার্কলে কলেজে পড়াশোনা শেষ না করে লেক তাহোয় গিয়ে বাস বয়ের কাজ করেছে, সেখান থেকে গালভেস্টনে গিয়েছে জাহাজের মাল খালাস এবং বোঝাইয়ের কাজে, তারপর মিয়ামিতে কিছুদিন রাঁধুনী হিসেবে অভিজ্ঞতা নিয়ে হুইলিং ট্যাক্সি চালিয়েছে এবং হোটেলে বাসনকোসন মেজেছে। সব জায়গায় গোত্তা খেয়ে শেষে থিতু হয়েছে মেইনের গেটস ফলসে, পিকার মেশিন অপারেটর হিসেবে। তুষারপাত শুরু না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকার ইচ্ছে তার। একা একা বসবাস পছন্দ হ্যালের। রাত তিনটা থেকে সকাল সাতটার সময়টুকু সে বেশ উপভোগ করে। ওইসময় প্রকাণ্ড কারখানাটির রক্ত প্রবাহ শীতল হতে শুরু করে, কমে আসে তাপমাত্রা।

তবে একটি জিনিসই তার না পছন্দ আর তা হলো ইঁদুরগুলো। তিনতলার ফ্লোর বেশ দীর্ঘ এবং নির্জন, অল্প ক'টি বাতি মিটমিটিয়ে জ্বলছে কেবল। কারখানার অন্যান্য লেভেলগুলোর তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত নীরব এবং লোকজন নেই বললেই চলে। মানুষ নেই তবে আছে ইঁদুর। তিনতলায় শুধু একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে–পিকার মেশিন। ফ্লোরের বাকি অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে ৯০ পাউণ্ড ওজনের ফাইবার ব্যাগ রাখার জন্য। হ্যালের লম্বা গিয়ার-

দাঁতের মেশিনটি ব্যাগ বাছাই করে। সসেজের মত লম্বা সারিতে ওগুলো স্তূপ করে রাখা। কিছু ব্যাগ পুরানো এবং নোংরা, তাতে কারখানার আবর্জনা পুরে রাখা হয়েছে। এসব ব্যাগ ইঁদুরদের চমৎকার বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। বিশালদেহী, পেট মোটা সব ইঁদুর, ক্রুদ্ধ চোখ, যাদের গা ভর্তি উকুন।

বিরতির সময় হ্যাল ট্র্যাশ ব্যারেল থেকে সফটড্রিংকের ক্যান জোগাড় করে। এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কাজের চাপ যখন কম ওইসময় সে ওগুলো ইঁদুরদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। বিরতির সময় ক্যানগুলো আবার সংগ্রহ করে। আজ ক্যান ছুঁড়তে গিয়ে ফোরম্যানের কাছে ধরা খেল সে। হারামজাদাটা এলিভেটরের বদলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসেছে।

'করছ কী তুমি, হ্যাল?'

'ইঁদুর তাড়াচ্ছি,' বলল হ্যাল। জানে জবাবটি খুব জুতসই হলো না কারণ একটা ইঁদুরও দেখা যাচ্ছে না। সবগুলো তাদের আস্তানায় ঢুকে পড়েছে। 'ওদেরকে দেখলে ক্যান ছুঁড়ে মারি।'

ওয়ারউইক সামান্য মাথা ঝাঁকাল। দশাসই, মাংসল চেহারা তার, ক্রুকাট চুল। শার্টের আস্তিন গোটানো, ঢিলে করা টাই। চোখ কুঁচকে তাকাল সে হ্যালের দিকে। 'তোমাকে আমরা ইঁদুর তাড়াতে ক্যান ছোঁড়ার জন্য বেতন দিই না, মিস্টার।'

'কুড়ি মিনিট ধরে কোন অর্ডার পাঠায়নি হ্যারি,' বলল হ্যাল। মনে মনে গালি দিল: *ব্যাটা, তুই তোর অফিসে বসে কফি খা না। এখানে তোকে কে আসতে বলেছে?* 'মাল না পেলে পিকার চালাব কীভাবে?'

মাথা দোলাল ওয়ারউইক যেন বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করছে না।

'দেখি উইসকনস্কি কী করছে,' বলল সে। 'পাঁচটা থেকে একটা পর্যন্ত সে ম্যাগাজিন পড়েছে, ওদিকে তার ডাস্টবিনে ময়লার পাহাড় জমেছে।'

হ্যাল কোন মন্তব্য করল না।

ওয়ারউইক হঠাৎ হাত তুলে দেখাল। 'ওই যে একটা! মারো শালাকে!'

নেহির ক্যান তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল হ্যাল। ইঁদুরটা একটা ফ্যাব্রিকের ব্যাগের ওপর উঠে পুঁতির মত কালো চোখে ওদেরকে লক্ষ করছিল, কিচকিচ শব্দ তুলে ছুটে পালাল। হ্যাল ক্যান আনতে গেছে, মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওয়ারউইক।

'আমি তোমার কাছে এসেছি একটা কাজে,' হ্যাল ফিরে এলে বলল সে।

'কী কাজ?'

'আগামী সপ্তাহে চৌঠা জুলাই।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হ্যাল। কারখানা সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে–যারা কমপক্ষে এক বছর ধরে এখানে কাজ করছে তাদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি। যাদের কাজের বয়স এক বছর হয়নি তারাও এসময়ে কর্মবিরতি পায়। 'তুমি কাজ করতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যাল। 'কী ধরনের কাজ?'

'আমরা পুরো বেসমেন্ট পরিষ্কার করে ফেলব। গত বারো বছর ধরে কেউ

ওটা স্পর্শ করেনি। খুবই বাজে অবস্থা। আমরা হোস পাইপ ব্যবহার করব।'

'টাউন জোনিং কমিটি বোর্ডের ডিরেক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে?'

ওয়ারউইক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যালের দিকে। 'তুমি কাজটা করতে চাও নাকি চাও না? প্রথম ঘন্টায় ডাবল ওভারটাইম, চতুর্থ ঘন্টায় এর দ্বিগুণ। আমরা গ্রেভইয়ার্ড শিফটে কাজ করব কারণ তখন তাপমাত্রা কম থাকবে।'

দ্রুত হিসেব কষছে হ্যাল। ট্যাক্স-ফ্যাক্স দেয়ার পরেও তার হাতে পঁচাত্তর ডলারের মত থাকবে।

'ঠিক আছে।'

'আগামী মঙ্গলবার ডাই হাউসে রিপোর্ট কোরো।'

সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল ওয়ারউইক। পেছন থেকে ওকে লক্ষ করছে হ্যাল। মাঝামাঝি গিয়ে ঘুরল ফোরম্যান। 'তুমি কলেজে পড়তে, তাই না?'

মাথা দোলাল হ্যাল।

'ওকে, কলেজ বয়। কথাটা আমি মনে রাখব।'

চলে গেল সে। হ্যাল বসে একটা সিগারেট ধরাল, অন্য হাতে সোডার ক্যান। ইঁদুর খুঁজছে। বেসমেন্টের অবস্থা কী হবে তা কল্পনায় দিব্যি দেখতে পাচ্ছে সে। আসলে সাব-বেসমেন্ট, ডাই হাউসের এক লেভেল নিচে। স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার, মাকড়সা, পচা কাপড় আর নদী থেকে ভেসে আসা ময়লা আবর্জনায় ভর্তি। আর থাকবে ইঁদুর, বাদুড়ও থাকতে পারে। ওয়াক!

ক্যানটি জোরে ছুঁড়ে মারল হ্যাল। মুখে মৃদু হাসি ফুটল মাথার ওপরের পাইপ দিয়ে ভেসে আসা ওয়ারউইকের আবছা গলা শুনে। সে হ্যারি উইসকনস্কিকে গালাগাল দিচ্ছে কাজের সময় পত্রিকা পড়ার জন্য।

ঠিক আছে, কলেজ বয়। কথাটা আমি মনে রাখব।

হ্যালের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। সে মেঝেতে পিষে নিভিয়ে ফেলল সিগারেট। একটু পরেই উইসকনস্কি ফ্লোয়ার দিয়ে নাইলন পাঠাতে শুরু করল। কাজে লেগে গেল হ্যাল। খানিক বাদে কয়েকটা ইঁদুর এসে লম্বা কামরার পেছন দিকে রাখা কাগজগুলোর ওপর বসে অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল হ্যালকে। তাদেরকে দেখাচ্ছে জুরির মত।

রাত এগারোটা। সোমবার।

প্রায় ছত্রিশ জন মানুষ বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এমন সময় আগমন ঘটল ওয়ারউইকের। পরনে পুরানো জিন্স প্যান্ট, হাই রাবার বুটের মধ্যে গুঁজে দেয়া। হ্যারি উইসকনস্কির কথা শুনছিল হ্যাল। হ্যারি বেজায় মোটা, মহা অলস আর মুখখানা সবসময় ভার করে রাখে।

'জায়গাটা ভয়ানক নোংরা,' বলছিল উইসকনস্কি, তখন মি. ফোরম্যানের প্রবেশ। 'তোমরা গেলেই বুঝবে। পার্শিয়ার মধ্যরাতের চেয়েও কেলে ভূত সাজবে একেক জন।'

'ওকে!' বলল ওয়ারউইক। 'আমরা ওখানে ষাটটা বিদ্যুৎ বাতি লাগিয়েছি।

কাজেই কে কী করছ দেখতে পাবে। তোমরা–' শুকনো স্পুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসা কয়েকজনের দিকে ইঙ্গিত করল সে– 'সিঁড়ি গোড়ার মূল পানির পাইপের সঙ্গে ওয়াটার হোসগুলো লাগাবে। হোস খুলে সিঁড়িতে নামিয়ে রাখতে পার। সবার ভাগে আশি গজ করে জায়গা পড়বে, যথেষ্ট জায়গা। একজন আবার আরেক জনের গায়ে হোস চাপিয়ে দিয়ো না যেন। তাহলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। পানির তোড়ের শক্তি প্রচণ্ড, ব্যথাও লাগে সাংঘাতিক।'

'কেউ না কেউ আহত হবেই,' তেতো গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করল উইসকনস্কি। 'দেখে নিয়ো।'

'আর তোমরা।' আরেকটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলল ওয়ারউইক। হ্যাল এবং উইসকনস্কি এ দলের অন্তর্ভুক্ত। 'তোমরা আজ রাতে ক্র্যাপ ক্রু'র দায়িত্ব পালন করবে। প্রতি দলে দু'জন করে থাকবে। সঙ্গে নেবে ইলেকট্রিক ওয়াগন। বেসমেন্টে পুরানো অফিস ফার্নিচার, বস্তা বস্তা কাপড়, ভাঙাচোরা বাতিল যন্ত্রপাতিসহ আরও অনেক হাবিজাবি জিনিস আছে। আমরা ওগুলো এয়ার শ্যাফটে তুলে নেব পশ্চিম প্রান্ত থেকে। এমন কেউ এখানে আছ যে ওয়াগন চালাতে জানো না?'

কেউ হাত তুলল না। সবাই ইলেকট্রিক ওয়াগন চালাতে পারে। এগুলো ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, খুদে ডাম্প ট্রাকের মত চেহারা। ওয়াগনগুলো নিয়মিত ব্যবহারের ফলে গা থেকে বিশ্রী গন্ধ আসে। পোড়া তারের গন্ধ।

'ওকে,' বলল ওয়ারউইক। 'বেসমেন্টকে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। শুক্রবার নাগাদ আমরা কপিকল দিয়ে আবর্জনা তুলে ফেলব। কোন প্রশ্ন?'

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। ফোরম্যানের চেহারা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে হ্যাল। হঠাৎ একটা মতলব খেলল মাথায়। ভাবনাটি তাকে খুশি করে তুলল। ওয়ারউইককে সে মোটেই পছন্দ করে না।

'বেশ,' বলল ওয়ারউইক। 'এবার তাহলে কাজে লেগে যাও।'

মঙ্গলবার। রাত দুইটা।

উইসকনস্কির ঈশ্বরকে গালাগাল শুনতে শুনতে মাথা ধরে গেছে হ্যালের। কিন্তু ঈশ্বর কি ওর গালিগালাজ শুনছেন? মনে হয় না। এতে উইসকনস্কির কী লাভ হচ্ছে বুঝতে পারছে না সে। কাজটা তার পছন্দ হচ্ছে না বলে সৃষ্টিকর্তাকে গালমন্দ করার কোন মানে হয় না।

হ্যালের আশংকা ছিল জঘন্য লাগবে তার কাজ। কিন্তু এ দেখছি জান খোয়ানোর অবস্থা। এমন বিশ্রী, কুৎসিত, পচা গন্ধ সইতে হবে তা সে কস্মিনকালেও ভাবেনি। নদীর দূষিত আবর্জনা, তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে পচা ফ্যাব্রিক, চুনসুরকি, পচা সব্জি ইত্যাদি। সব মিলে এমন ভয়াবহ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, কহতব্য নয়। দূর প্রান্তে, যেখান থেকে ওরা শুরু করেছে কাজ, সেখানে সাদা রঙের বিরাট বিরাট ব্যাঙাচিদের রীতিমত একটা উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। ভাঙা

সিমেন্টের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তারা মাথা তুলছে। ওগুলোর গায়ে হাত লেগে গিয়েছিল হ্যালের জংধরা একটা গিয়ার-টুথ হুইল টেনে আনতে গিয়ে। গরম দেহ, গায়ে অসংখ্য ফোসকা। ঘেন্নায় রি রি করে উঠেছে হ্যালের শরীর।

ইলেকট্রিক বাল্ব বারো বছরের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। সামান্য আঁধার ঠেলে কুৎসিত হলুদ একটা আলো ফেলেছে আবর্জনার গায়ে। জায়গাটা লাগছে অপবিত্র হওয়া গির্জার মত, যার দর্শক বসার স্থানটি ভেঙে টুকরো হয়ে আছে। উঁচু ছাদ এবং দৈত্যাকার পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি। এসব মেশিনারি কখনও সরানো সম্ভব নয়। ভেজা দেয়ালে জন্মেছে হলুদ শ্যাওলা। হোস পাইপ থেকে বেরুনো পানির তোড় কর্কশ ছন্দ তুলে অর্ধেক বন্ধ হওয়া পয়োনালিতে পড়ছে। পয়োনালির পানি গিয়ে অবশেষে মিশেছে নদীতে।

আর ইঁদুরগুলো–একেকটা এমন বিশাল, তিনতলারগুলোকে তুলনায় বামনই বলা চলে। ঈশ্বর জানেন এরা এখানে কী খেয়ে বাঁচে। এরা একের পর এক বোর্ড আর ব্যাগগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য ছেঁড়া কাগজ। আদিম লালসা নিয়ে তাকিয়ে থাকে বাচ্চাগুলোর দিকে। ওগুলো মেঝের ফাটল কিংবা দেয়ালের গর্তে গিয়ে লুকোচ্ছে। অবিরাম অন্ধকারে থাকার ফলে বাচ্চাদের বড়বড় চক্ষুগুলো দৃষ্টিহীন।

'চলো, একটু ধূমপান বিরতি নিই,' বলল উইসকনস্কি। সে বেদম হাঁপিয়ে গেছে। অবশ্য সিগারেট খাওয়াই যায় কারণ এখানে ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

'ঠিক আছে,' সায় দিল হ্যাল। একটা ইলেকট্রিক ওয়াগনের গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাল।

'এর মধ্যে জড়ানো উচিত হয়নি আমার,' করুণ গলায় বলল উইসকনস্কি। 'ওয়ারউইককে আমার বলা উচিত ছিল এর মধ্যে আমি থাকতে চাই না। এসব মানুষের কাজ নয়। কিন্তু সেদিন আমাকে ও ম্যাগাজিন পড়তে দেখে এমন রেগে গিয়েছিল! ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনি। ওই ব্যাটা আসলে একটা পাগল।'

হ্যাল কিছু বলল না। সে ওয়ারউইক আর ইঁদুরগুলোর কথা ভাবছিল। দুটো যেন সমগোত্রীয়। ইঁদুরগুলোকে দেখে মনে হয় দীর্ঘদিন কারখানার নিচে থাকতে থাকতে মানুষের কথা ভুলেই গেছে। এদের প্রকৃতি ওয়ারউইকের মতই নির্লজ্জ। আর ওয়ারউইকের মতই কোনকিছুতে ভয় পায় না। একটা ইঁদুর পেছনের পায়ে ভর করে কাঠবিড়ালির মত দাঁড়িয়ে ছিল। হ্যাল ওটাকে লাথি মারতে গেছে, ওটা ভয় তো পায়ইনি উল্টো ওর পায়ে লাফিয়ে পড়ে জুতোর চামড়ায় কামড় বসিয়ে দিয়েছে। এদের সংখ্যা শত শত নয়। হাজার হাজার। এই কালো নিষ্কাশন কূপের মধ্যে ইঁদুরগুলো যে কতশত রোগের জীবাণু বহন করে চলেছে কে জানে!

'আমার টাকার দরকার,' বলল উইসকনস্কি। 'কিন্তু যীশুর কিরে এটা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। ওই ইঁদুরগুলোকে দেখো।' চারপাশে সে চোখ বুলাল ভীত দৃষ্টিতে। 'ওদেরকে দেখে মনে হয় ওরা চিন্তা করতে পারে। কখনও ভেবেছ আমরা যদি আকারে ছোট হতাম আর ওরা বড়–'

'আহ্, শাটাপ,' বলল হ্যাল।

উইসকনস্কি ওর দিকে আহত চোখে তাকাল। 'দুঃখিত, দোস্তো। বুঝিনি

তুমি রাগ করবে...আসলে...' তার গলার স্বর আবছা শোনাল। 'যীশাস, এখানে কী বিশ্রী গন্ধ!' কাতরে উঠল সে। 'এটা কোন মানুষের জন্য কাজ হতে পারে না।' একটা মাকড়সা ওয়াগনের কিনার থেকে বেরিয়ে কিলবিল করে ওর হাতে উঠে পড়ল। আঁতকে উঠে ঝাড়া মেরে মাকড়সাটা ফেলে দিল উইসকনস্কি।

'চলো, কাজ শুরু করি।' সিগারেটে জোরে একটা টান দিল হ্যাল। 'যত তাড়াতাড়ি ধরব তত জলদি শেষ হবে কাজ।'

'হয়তো বা,' নিরুত্তাপ গলায় বলল উইসকনস্কি। 'হয়তো বা।'

মঙ্গলবার। ভোর চারটা।

লাঞ্চটাইম।

হ্যাল এবং উইসকনস্কি তিন-চারজন লোকের সঙ্গে বসে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে। তাদের হাত ময়লায় কালো হয়ে আছে। সাবান দিয়ে ধুয়েও পরিষ্কার হয়নি। হ্যাল খেতে খেতে ফোরম্যানের কাচ ঘেরা ছোট অফিসের দিকে তাকাল। ওয়ারউইক তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করছে আর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া হ্যামবার্গারে কামড় বসাচ্ছে।

'রে আপসন বাড়ি চলে গেছে।' বলল চার্লি ব্রোচু।

'বমি করেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'আমি তো প্রায় বমি করে দিচ্ছিলাম।'

'নাহ্। ও লোহা খেয়ে হজম করতে পারে। ওকে ইঁদুরে কামড়িয়েছে।'

হ্যাল এদিকে মুখ ফেরাল। 'তাই নাকি?'

'হুঁ,' মাথা দোলাল ব্রোচু। 'আমার সঙ্গে কাজ করছিল রে। হারামজাদা ইঁদুরটা পুরানো একটা কাপড়ের ব্যাগের গর্ত দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বিড়াল সাইজের ইঁদুর। রে-র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাংস কামড়ে ধরেছিল।'

'যী-শাস,' বলল একজন, তার মুখ ভয়ে সাদা।

'হুঁ,' বলল ব্রোচু। 'রে মেয়ে মানুষের মত চিৎকার-চেঁচামেচি করছিল, এজন্য ওকে দোষ দিই না। হাত দিয়ে ঝরঝর করে ঝরছিল রক্ত। তবে হারামীটাকে আমি ছাড়িনি। তক্তা দিয়ে পিটিয়ে দফারফা করে দিয়েছি। রে ওটাকে লাথি মেরে মেরে ভর্তা বানিয়ে ফেলেছে। এমন কুৎসিত জীব জীবনে দেখিনি। ওয়ারউইক রে-র হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে কাল যেন ডাক্তারের কাছে যায়।'

নিজের নামটি হয়তো শুনতে পেয়েছে ওয়ারউইক, দোরগোড়ায় উদয় হলো সে। 'এখন কাজে যাওয়ার সময় হলো।'

লোকগুলো ধীরেসুস্থে সিধে হলো তারপর রওনা হলো যে যার কাজে। তাদের জুতোর হিল শব্দ তুলল ইস্পাতের গ্রিলে।

ওয়ারউইক চলে এল হ্যালের কাছে, ওর কাঁধে চাপড় মারল।

'কেমন চলছে, কলেজ বয়?' জবাবের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

'চলো,' উইসকনস্কিকে অধৈর্য গলায় ডাকল হ্যাল। সে জুতোর ফিতে বাঁধছে। ওরা নিচে নেমে এল।

সকাল সাতটা। মঙ্গলবার।

হ্যাল এবং উইসকনস্কি একসঙ্গে কাজ করছে। কাজ শেষে ওরা একত্রেই কারখানা থেকে বেরুল। 'লিফট দেব?' জানতে চাইল উইসকনস্কি।

'ধন্যবাদ,' বলল হ্যাল।

মিল স্ট্রিট ধরে এগোল ওরা, পার হলো সেতু। পথে সামান্যই কথা হলো দু'জনে। উইসকনস্কি হ্যালকে তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল।

সোজা শাওয়ারের নিচে গেল হ্যাল। গোসল সেরে বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম। তবে নিরুপদ্রব নিদ্রা হলো না ওর। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নের মত হানা দিল ইঁদুর।

রাত একটা। বুধবার।

হোস পাইপ চলছে।

ক্র্যাপ ক্রুরা একটি সেকশনের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত ওরা সেখানে যেতে পারে না। তবে পরবর্তী সেকশন পরিষ্কার হওয়ার আগেই প্রায়ই ওদেরকে হোস পাইপ চালাতে হয়। এই সময়টুকুর মধ্যে একটা সিগারেট খাওয়ার বিরতি মেলে। হ্যাল লম্বা হোসের নজল বা মুখের দিকটা ধরে আছে, উইসকনস্কি সামনে পেছনে ছোটাছুটি করছে, পাইপ কোথাও বেঁকে গেলে সোজা করছে। পানির প্রবাহ বন্ধ করছে, খুলে দিচ্ছে, প্রবাহ কোথাও বাধা পেলে তা দূর করছে।

খেপে আছে ওয়ারউইক কারণ কাজের গতি মন্থর। এভাবে কাজ চললে বৃহস্পতিবারের মধ্যে শেষ হবে না।

ওরা এখন উনিশ শতকের অফিস সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত। ওগুলো এলোপাথাড়িভাবে এক কোণে পড়ে আছে—ভাঙা রোলটপ ডেস্ক, ছাতাপড়া লেজারবুক, দিস্তা দিস্তা ইনভয়েস, ছাল ওঠা চেয়ারের আসন—আর আছে ইঁদুর। শত শত। এরা কিচকিচ শব্দ তুলে অন্ধকার প্যাসেজগুলোতে ছোটাছুটি করছে। আরও দু'জন ইঁদুরের কামড় খাওয়ার পরে শ্রমিকরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে ওয়ারউইক ওপরতলা থেকে রাবারের ভারী গ্লাভ আনিয়ে নেয়। ওগুলো রাখা হয়েছিল ডাই হাউসের ক্রুদের জন্য। ডাই হাউসে এসিড নিয়ে তাদের কাজ কারবার।

হ্যাল এবং উইসকনস্কি তাদের হোস পাইপ নিয়ে ভেতরে যাবে, এমনসময় বালু-রঙা চুলের ষাঁড়ের গর্দানঅলা কারমাইকেল হাউমাউ করে উঠল। গ্লাভ পরা হাতে সে নিজের বুকে চাপড় মারছে।

ধূসর লোমের, জ্বলজ্বলে চোখের অত্যন্ত কুৎসিত চেহারার প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর কারমাইকেলের বুকে কামড় বসিয়েছে এবং কিছুতেই ছাড়ছে না! ওটা কিচকিচ শব্দ করছে আর পেছনের পা দিয়ে আঁচড় কাটছে কারমাইকেলের বুকে। অবশেষে প্রচণ্ড এক ঘুষিতে ইঁদুরটাকে ছুটিয়ে দিল কারমাইকেল। কিন্তু ততক্ষণে তার শার্টে মস্ত এক গর্ত তৈরি হয়েছে এবং একটি স্তনের নিচ দিয়ে

রক্তের ক্ষীণ ধারা বইতে শুরু করেছে। কারমাইকেলের চেহারা থেকে ক্রোধ দূর হয়ে ফুটল বিবমিষা। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে গলগল করে বমি করে দিল।

হ্যাল তার হাতের পাইপ ঘোরাল ইঁদুরটার দিকে। বুড়ো ইঁদুর আস্তে আস্তে নড়ছে, চোয়ালে এখনও আটকে আছে কারমাইকেলের শার্টের ছেঁড়া অংশ। হোসপাইপের তীব্র পানির তোড় ওটাকে ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিল দেয়ালে, সেখানে বাড়ি খেয়ে বোধহয় অক্কা পেল। নড়াচড়া করছে না।

এগিয়ে এল ওয়ারউইক, মুখে কেমন অদ্ভুত, টানটান হাসি। সে হ্যালের কাঁধ চাপড়ে দিল। 'খুদে হারামজাদাগুলোর গায়ে ক্যান ছুঁড়ে মারার চেয়ে এটা অনেক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। তাই না, কলেজ বয়?'

'হারামজাদাটা এক ফুট লম্বা।' মন্তব্য করল উইসকনস্কি।

'ওদিকে পানি মারো!' আসবাবের দঙ্গলের দিকে ইঙ্গিত করল ওয়ারউইক। 'অ্যাই, তোমরা সরে যাও!'

'আনন্দের সঙ্গে,' বিড়বিড় করল কেউ।

কারমাইকেল ছুটে এল ওয়ারউইকের কাছে। তার চেহারা বিবর্ণ। 'এজন্য আমি ক্ষতিপূরণ দাবি করব। আমি–'

'নিশ্চয়ই,' হাসছে ওয়ারউইক। 'তুমি স্তনে কামড় খেয়েছ। এখন সরো। নইলে পানির তোড়ে ভেসে যাবে।'

হ্যাল নজল খাড়া করে পাইপ চালাল। সাদা জলের একটা বিস্ফোরণ ঘটল, একটা ডেস্ক উল্টে গেল, দুটো চেয়ার ভেঙে টুকরো হলো। ইঁদুরগুলো ছুটতে শুরু করল। সবজায়গায় ইঁদুর। একেকটার কী সাইজ! এত বড়বড় ইঁদুর বাপের জন্মে দেখেনি হ্যাল। বড়বড় চক্ষু, ইয়া মোটা লোমেশ এবং মসৃণ শরীর। ওগুলোকে ছোটাছুটি করতে দেখে ভয় এবং ঘৃণার গুঞ্জন উঠল শ্রমিকদের মধ্যে। একটা ধাড়ি ইঁদুরের দিকে চোখ গেল হ্যালের, দেড় মাস বয়সী কুকুরছানার সাইজ। ওটার গায়ে হোস পাইপ চালিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী জঘন্য প্রাণীটা। যতক্ষণ পর্যন্ত ইঁদুর চোখে পড়ল, পানির পাইপ চালিয়ে গেল হ্যাল। বিরতি দিল আর একটাকেও যখন দেখতে পেল না তখন। নজল বন্ধ করল সে।

'ওকে!' হাঁক ছাড়ল ওয়ারউইক। 'এখন ময়লা পরিষ্কার করো।'

'আমি এখানে এক্সটার্মিনেটরের কাজ করতে আসিনি,' আপত্তির গলায় বলল সাই ইপস্টন। সে বয়সে তরুণ, মাথায় নোংরা বেসবল ক্যাপ, পরনে টি-শার্ট।

'তাই নাকি, ইপস্টন?' সদয় গলায় জিজ্ঞেস করল ওয়ারউইক।

একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ইপস্টনকে, এক কদম সামনে বাড়ল।

'জী। আমি আর এসব ইঁদুর নিয়ে কাজ করতে চাই না। আমাকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ভাড়া করা হয়েছে, র‍্যাবিস কিংবা টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ার জন্য নয়। আপনি আমাকে বাদ দিন।'

অন্যরা ওর কথায় বিড়বিড় করে সায় দিল। উইসকনস্কি আড়চোখে তাকাল হ্যালের দিকে। সে হোস পাইপের মুখ পরীক্ষা করছে গভীর মনোযোগে। .৪৫ পিস্তলের মত এর ফুটো, যে কোন মানুষকে ধাক্কা মেরে পঁচিশ ফুট দূরত্বে ছুঁড়ে

ফেলতে পারে।

'তুমি কাজ করতে চাইছ না, সাই?'

'সেরকমটিই ভাবছি,' জবাব দিল ইপস্টন।

মাথা ঝাঁকাল ওয়ারউইক। 'ঠিক আছে। তুমি কিংবা অন্যরা যে কোন কিছু চাইতেই পার। তবে এটি কোন ইউনিয়নভুক্ত দোকান নয়, ছিলও না কোনদিন। এখন তুমি কাজ ছেড়ে চলে গেলে আর কোনদিন কাজ পাবে না। এবার কোথাও যাতে কাজ না পাও সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখব।'

'তুমি গাঁয়ের মোড়ল নও,' নিচু গলায় বলল হ্যাল।

পাঁই করে ঘুরল ওয়ারউইক। 'কিছু বললে, কলেজ বয়?'

হ্যাল তার দিকে ভোঁতা চোখে তাকাল। 'কিছু বলিনি তো, মি. ফোরম্যান। গলায় কাশি বেধেছিল। কাশি দিচ্ছিলাম।'

হাসল ওয়ারউইক। 'তোমার গায়ে লাগল বুঝি?'

কিছু বলল না হ্যাল।

'ঠিক আছে, সবাই কাজে নামো এবার।' চিৎকার দিল ওয়ারউইক।

সবাই কাজে নেমে পড়ল।

রাত দুটো। বৃহস্পতিবার।

হ্যাল এবং উইসকনস্কি আবার ট্রাকগুলো নিয়ে কাজ শুরু করেছে, ময়লা তুলছে। পশ্চিম এয়ারক্রাফটে আবর্জনার বিপুল স্তূপ জমেছে অথচ এখনও অর্ধেক কাজই শেষ হয়নি।

'শুভ চৌঠা জুলাই,' বলল উইসকনস্কি ধূমপান বিরতির সময়। ওরা উত্তর দিকের দেয়ালে কাজ করছে, সিঁড়ি থেকে অনেক দূরে। এখানে আলো একেবারেই কম, লোকজনকে মনে হচ্ছে বহু দূরে।

'ধন্যবাদ,' সিগারেটে টান দিল হ্যাল। 'আজ রাতে তো তেমন ইঁদুর চোখে পড়ল না।'

'কেউই দেখেনি,' বলল উইসকনস্কি। 'মনে হয় সবগুলো পালিয়েছে।'

ওরা একটা আঁকাবাঁকা, উষ্ণ গলিতে দাঁড়িয়ে আছে মণ কে মণ পুরানো খতিয়ান বই, ইনভয়েস, ছাতা ধরা কাপড়ের ব্যাগ আর দুটো প্রকাণ্ড তাঁতের মাঝখানে। তাঁত দুটো বহু আগের। 'থু!' একদলা থুথু ফেলল উইসকনস্কি, 'ওই ওয়ারউইক ব্যাটা—'

'ইঁদুরগুলো সব কোথায় গেছে বলে তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল হ্যাল অনেকটা আপন মনেই। 'দেয়ালের ভেতরে ঢোকেনি,' ভেজা, অসংখ্য ফাটল এবং গর্তঅলা দেয়ালের দিকে তাকাল সে। দেয়ালটি ভিত্তিপ্রস্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরগুলো ঘিরে রেখেছে। 'তাহলে ওরা ডুবে যাবে। কারণ সবদিকেই ছড়িয়ে আছে নদী।'

হঠাৎ কালো কী একটি যেন পতপত আওয়াজ তুলে ওদের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চিৎকার দিয়ে দু'হাতে মাথা ঢাকল উইসকনস্কি।

'ভয় নেই। ওটা বাদুড়!' বলল হ্যাল। উইসকনস্কি গা ঝাড়া দিয়ে খাড়া

হতে ওটা উড়তে উড়তে চলে গেল।

'বাদুড়! বাদুড়!' খেপার মত বলল উইসকনস্কি। 'বাদুড় সেলারে কী করছে? ওগুলোর তো গাছে এবং গুহায় থাকার কথা–'

'ওটা মস্ত একটা বাদুড় ছিল,' মৃদু গলায় বলল হ্যাল। 'বাদুড় তো ডানা ছাড়া ইঁদুরের মতই।'

'যীশাস,' গুঙিয়ে উঠল উইসকনস্কি। 'ওটা কী করে–?'

'ভেতরে ঢুকল? ইঁদুরগুলো যে পথে বাইরে যায় সেই পথেই হয়তো ঢুকেছে।'

'ওখানে কী হচ্ছে?' পেছনে কোথাও থেকে চেঁচাল ওয়ারউইক। 'কোথায় তোমরা?'

'ভয় পেয়ো না,' মৃদু গলায় বলল হ্যাল। অন্ধকারে তার চোখ চকচক করছে।

'কলেজ বয় নাকি?' হাঁক ছাড়ল ওয়ারউইক। তার গলার স্বর কাছিয়ে এল।

'ইট'স ওকে,' পাল্টা হাঁক ছাড়ল হ্যাল। 'আমার হাঁটুর ছাল উঠে গেছে।'

খ্যাঁক খ্যাঁক হাসল ওয়ারউইক। 'তোমার কি পার্পল হার্ট দরকার?'

উইসকনস্কি তাকাল হ্যালের দিকে। 'তুমি ওকথা কেন বললে?'

'দেখো,' হাঁটু মুড়ে বসে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল হ্যাল। ভেজা, ভাঙা সিমেন্টের মাঝখানে একটা চৌকোনা জিনিস দেখা গেল।

'টোকা দাও।'

টোকা দিল উইসকনস্কি। 'জিনিসটা কাঠের।'

মাথা দোলাল হ্যাল। 'এটা কোন সাপোর্টের উপরের অংশ। এরকম আরও কিছু চৌকোনা কাঠ আমার চোখে পড়েছে। এর মানে বেসমেন্টের এই অংশের নিচে আরেকটা লেভেল আছে।'

'গড,' শিউরে উঠল উইসকনস্কি।

রাত সাড়ে তিনটা। বৃহস্পতিবার।

ওরা উত্তর-পশ্চিম কোণে এসেছে। ওদের পেছনে ইপস্টন এবং ব্রোচু, হাতে হাই প্রেশারের হোস। হ্যাল দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঝেয় আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই যে দেখো।'

কাঠের একটা ট্র্যাপডোর, তাতে জং ধরা লোহার রিংবোল্ট।

ইপস্টনের কাছে হেঁটে গেল ও। 'কাজ এক মিনিট বন্ধ রাখো।' ইপস্টন হোস পাইপের মুখ বন্ধ করল। গলা চড়িয়ে ডাকল হ্যাল। 'হেই! হেই! ওয়ারউইক! এদিকে একবার এসো!'

জলের মধ্যে ছপাৎ ছপাৎ পা ফেলে এগিয়ে এল ওয়ারউইক, চোখে সেই কঠোর হাসি। 'তোমার জুতোর ফিতে খুলে গেছে, কলেজ বয়?'

'দেখো,' বলল হ্যাল। লাথি কষাল ট্র্যাপডোরে। 'সাব-সেলার।'

'তো?' জিজ্ঞেস করল ওয়ারউইক। 'এটা ব্রেক টাইম নয়, কলেজ–'

'ওখানেই তোমার ইঁদুরগুলো আছে,' বলল হ্যাল। 'ওখানে ওরা বাচ্চা

পয়দা করে। উইসকনস্কি এবং আমি কিছুক্ষণ আগে একটা বাদুড় দেখলাম।'

আরও কয়েকজন এসে জড় হয়েছে। তারা ট্র্যাপডোর দেখছে।

'তাতে আমার কী?' বলল ওয়ারউইক। 'আমাদের কাজ বেসমেন্টে, ওখানে–'

'তোমার কমপক্ষে কুড়ি জন ট্রেইনড এক্সটার্মিনেটর লাগবে,' বলল হ্যাল। 'ম্যানেজমেন্টের অনেক টাকা লাগবে। ভেরী ব্যাড।'

হেসে উঠল কে যেন। 'ম্যানেজমেন্টের খবর আছে।'

ওয়ারউইক হ্যালের দিকে তাকাল যেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে কীট-পতঙ্গ দেখছে। 'তুমি আসলেই একটা যন্ত্রণা,' বলল সে। 'ওখানে যত খুশি ইঁদুর থাকুক তাতে আমার কী বয়ে গেল?'

'আমি আজ আর গতকাল দুপুরে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম,' বলল হ্যাল। 'ভালই হয়েছে তুমি মনে করিয়ে দিয়েছ আমি এক সময় কলেজ-ছাত্র ছিলাম। আমি টাউন জোনিং অর্ডিন্যান্স পড়েছি, ওয়ারউইক–১৯১১ সালে ওগুলো লেখা হয়, তখনও এই কারখানা অত বড় হয়নি। আমি কী দেখেছি, জানো?'

ওয়ারউইকের চক্ষু শীতল। 'ফালতু কথা ছাড়ো, কলেজ বয়। তোমার চাকরি খতম।'

'আমি দেখেছি,' বলতে থাকল হ্যাল যেন কথাটা সে শুনতেই পায়নি। 'দেখলাম গেটস ফলসে ভারমিনদের নিয়ে একটি জোনিং ল আছে। ভারমিন মানে বোঝো তো? ইঁদুরসহ নানান অনিষ্টকর প্রাণী। বাদুড়, স্কাঙ্ক, বেওয়ারিশ কুকুরও এদের মধ্যে আছে। এরা সবাই নানান রোগ-জীবাণুর বাহক। বিশেষ করে ইঁদুরের ওপর ওই আইনে জোর দেয়া হয়েছে। দুটি প্যারাগ্রাফে চোদ্দবার লেখা হয়েছে ইঁদুরের নাম, মি. ফোরম্যান। কাজেই এ কথাটি মনে রেখো যে মুহূর্তে তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে দেবে তক্ষুণি আমি টাউন কমিশনারকে গিয়ে বলব এখানে কী ঘটছে।'

বিরতি দিল সে, ওয়ারউইকের থমথমে চেহারা উপভোগ করছে। 'আমার ধারণা আমি, টাউন কমিশনার এবং টাউন কমিটি মিলে এ জায়গার ওপর একটি ইনজাংশন জারি করতে পারব যে এখানে কোন কিছু করা যাবে না। তোমাকে অনেক কিছুই বন্ধ করে দিতে হবে, মি. ফোরম্যান। আর তখন তোমার বস তোমাকে কী বলবে আমি দিব্যি বুঝতে পারছি। আশা করি তোমার আনএমপ্লয়মেন্ট ইনসিওরেন্সের টাকা-পয়সা দেয়া আছে, ওয়ারউইক।'

মুষ্টিবদ্ধ হলো ওয়ারউইকের হাত। 'ব্যাটা ফাজিল! আমি যদি তোর–' সে ট্র্যাপডোরের দিকে তাকাল। হাসিটা আবার ফিরে এল মুখে। 'ধরে নাও তুমি চাকরিটা আবার পেয়ে গেছ, কলেজ বয়।'

'আশা করি তুমি পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছ।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়ারউইক, সেই একই অদ্ভুত হাসিটি ধরে রেখেছে মুখে। 'তুমি বড্ড চালাক, হে। তুমি বরং নিচে যাও, হ্যাল। তোমার মত শিক্ষিত ছেলের কাছ থেকে মূল্যবান কোন মতামত পাবার আশা করছি। তুমি আর উইসকনস্কি।'

'আবার আমি কেন?' আপত্তি জানাল উইসকনস্কি। 'আমি ওখানে যাব না। আমি—'

ওয়ারউইক তাকাল তার দিকে। 'তুমি কী?'

চুপ হয়ে গেল উইসকনস্কি।

'বেশ,' উৎফুল্লচিত্তে বলল হ্যাল। 'আমাদের তিনটা ফ্ল্যাশলাইট লাগবে। মেইন অফিসে ছয় ব্যাটারির অনেক টর্চ আছে, আছে না?'

'সঙ্গে আর কাউকে চাই তোমার?' উচ্ছলতা প্রকাশ পেল ওয়ারউইকের কণ্ঠে। 'যে কাউকে বেছে নিতে পার।'

'তুমি,' মৃদু গলায় বলল হ্যাল। তার চেহারায় অদ্ভুত একটা ভাব। 'ম্যানেজমেন্টের কাছে তো তোমাকেই রিপোর্ট করতে হবে। ধরো, আমি আর উইসকনস্কি ওখানে যথেষ্ট ইঁদুর দেখতে পেলাম না, তখন?'

কেউ একজন (শব্দ শুনে মনে হলো ইপস্টন) সশব্দে হাসল।

ওয়ারউইক তীক্ষ্ণ নজর বুলাল লোকগুলোর ওপর। ওরা সবাই যে যার জুতোর ডগা লক্ষ করছে। অবশেষে ব্রোচুর দিকে হাত তুলল সে। 'ব্রোচু, অফিসে যাও। তিনটে ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসো। ওয়াচম্যানকে বোলো আমি তোমাকে যেতে বলেছি।'

'তুমি আমাকে এর মধ্যে টানছ কেন?' হ্যালকে কাতর গলায় বলল উইসকনস্কি। 'তুমি জানো আমি কী পরিমাণে ঘেন্না করি ওই—'

'আমি টানিনি,' বলল হ্যাল, তাকাল ওয়ারউইকের দিকে।

ওয়ারউইকও তার দিকে চাইল। কেউই চোখের পলক ফেলল না।

ভোর চারটা। বৃহস্পতিবার।

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে এসেছে ব্রোচু। একটা হ্যালকে দিল, একটা উইসকনস্কিকে, বাকিটা ওয়ারউইককে।

'ইপস্টন! হোসটা উইসকনস্কিকে দাও।' আদেশ পালন করল ইপস্টন। পাইপের নজল ধরা হাত কাঁপতে লাগল উইসকনস্কির। 'ঠিক আছে,' উইসকনস্কিকে বলল ওয়ারউইক। 'তুমি মাঝখানে থাকবে। ইঁদুর দেখতে পেলেই তাড়াবে।' সে দুই লোককে নির্দেশ দিল। 'তোলো ওটা।'

একজন ঝুঁকে পড়ল ট্র্যাপডোরের রিংবোল্টের ওপর। ধরে টান মারল। এক মুহূর্তের জন্য হ্যালের মনে হলো ওটা খুলবে না। তবে পরের মুহূর্তে বিশ্রী শব্দ তুলে ওটা খুলে গেল। দ্বিতীয়জন রিংবোল্টের ভেতরের দিকটা ধরে রেখেছিল ওটা টেনে খুলতে সাহায্য করার জন্য। সে একটা চিৎকার দিয়ে ছেড়ে দিল রিংবোল্ট। তার দুই হাত বোঝাই কিলবিল করছে বিরাট বিরাট অন্ধ গুবরে পোকা।

রিংবোল্ট ধরে রাখা প্রথমজন একটা আর্তচিৎকার করে ট্র্যাপডোর ধরে টান মেরেই ওটা ছেড়ে দিল। ট্র্যাপডোরের ভেতরের দিকটা কুৎসিত ফাঙ্গাসে কালো হয়ে আছে। গুবরে পোকাগুলো কিছু পড়ল নিচের অন্ধকারে, কিছু মেঝেতে। দৌড়াতে গিয়ে ওগুলো শ্রমিকদের বুটজুতোর চাপে পিষে গেল।

'দেখো,' বলল হ্যাল।
ট্র্যাপডোরের ভেতর দিকে জং পড়া একটা তালা ছিল, এখন ভাঙা। 'কিন্তু তালা তো নিচের দিকে থাকার কথা নয়,' বলল ওয়ারউইক। 'ওটা ওপরের দিকে থাকার কথা। কেন–'
'এর বহু কারণ থাকতে পারে।' বলল হ্যাল। 'তালাটা যখন নতুন ছিল তখন এপাশ থেকে এটা হয়তো খোলার কোন দরকার ছিল না। কিংবা ওই দিকে যা আছে তার ওপরে ওঠার প্রয়োজন ছিল না।'
'কিন্তু তালা লাগাল কে?' জিজ্ঞেস করল উইসকনস্কি।
'অঃ,' ওয়ারউইকের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বলল হ্যাল। 'সেটা একটা রহস্য।'
'শোনো,' ফিসফিস করল ব্রোচু।
'ওহ, গড,' ফুঁপিয়ে উঠল উইসকনস্কি। 'আমি ওখানে যাব না!'
মৃদু একটা শব্দ, যেন প্রায় প্রত্যাশিত, হাজার হাজার পায়ের ছোটাছুটি, কিচকিচ আওয়াজ। ইঁদুর।
'ব্যাঙ ট্যাঙ হবে বোধহয়।' বলল ওয়ারউইক।
অট্টহাসি দিল হ্যাল।
ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ওয়ারউইক। বেঁকে যাওয়া কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের কালো পাথরের মেঝেতে। কোন ইঁদুর চোখে পড়ল না।
'ওই সিঁড়ি আমাদের ভার সইতে পারবে না,' চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সুরে বলল ওয়ারউইক।
ব্রোচু দুই কদম এগিয়ে গেল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে লাফঝাঁপ দিল। ক্যাচম্যাচ করে উঠল সিঁড়ি তবে ভেঙে যাওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করল না।
'তোমাকে আমি লাফালাফি করতে বলিনি,' বলল ওয়ারউইক।
'রে-কে ইঁদুরটা কামড়ানোর সময় তুমি ওখানে ছিলে না,' অনুচ্চ গলায় বলল ব্রোচু।
'চলো, এগোই,' বলল হ্যাল।
ওদের দিকে শেষ বিদ্রূপাত্মক নজর বুলাল ওয়ারউইক, তারপর হ্যালের সঙ্গে এগোল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের মাঝখানে থাকল উইসকনস্কি। একসঙ্গে নামছে সবাই। প্রথমে হ্যাল, তারপর উইসকনস্কি, সবশেষে ওয়ারউইক। ওদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচানাচি করছে মেঝেতে। উইসকনস্কির হাতে হোস পাইপ। অলস সাপের মত ওটাকে বয়ে নিয়ে চলেছে সে। সিঁড়িতে বাড়ি খেয়ে শব্দ তুলল পাইপ।
ওরা নেমে এল নিচে। ওয়ারউইক চারপাশে আলো ফেলল। কতগুলো ভাঙাচোরা বাক্স, পিপে ইত্যাদি দেখা গেল। নদীর থকথকে কাদায় ওদের বুটজুতোর গোড়ালি ডুবে গেল।
'ওগুলোর আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।' ফিসফিস করল উইসকনস্কি।
ধীর গতিতে হাঁটছে ওরা। পিচ্ছিল কাদায় পা পিছলে যেতে চায়। দাঁড়িয়ে পড়ল হ্যাল। একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সে আলো ফেলল। ওটার গায়ে সাদা

অক্ষরে কিছু লেখা। 'এলিয়াস ভার্নি,' পড়ল হ্যাল। '১৮৪১। কারখানা তখন এখানে ছিল?'

'না,' বলল ওয়ারউইক। '১৮৯৭ সালে কারখানা তৈরি করা হয়। এতে কী এসে যায়?'

হ্যাল জবাবে কিছু বলল না। ওরা সামনে এগোল। দেখে মনে হচ্ছে সাব-সেলারটা বেশ লম্বা। বাতাসে দুর্গন্ধ। বোটকা, গা গোলানো গন্ধ। গুহায় যেমন ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে সেরকম একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে ওরা। 'কী ওটা?' জিজ্ঞেস করল হ্যাল। কংক্রিটের একটা পিণ্ডের ওপর আলো ফেলল। সেলার থেকে দুই ফুটের মত বেরিয়ে আছে পিণ্ডটা। ওটার পেছনে শুধুই অন্ধকার। হ্যালের মনে হলো ওখান থেকে জল পড়ার টপটপ শব্দ আসছে।

উঁকি দিল ওয়ারউইক। 'এটা...না, তা কী করে হয়!'

'ওটা কারখানার বাইরের দেয়াল, তাই না? আর সামনে...'

'আমি গেলাম,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ওয়ারউইক।

হ্যাল জোরে ওর ঘাড় চেপে ধরল। 'তুমি কোথাও যাচ্ছ না, মি. ফোরম্যান।'

ওয়ারউইক ওর দিকে তাকাল। হাসল। 'তুমি আসলে ক্রেজি, কলেজ বয়। তুমি একটা পাগল।'

'চলো, বন্ধু।'

গুঙিয়ে উঠল উইসকনস্কি। 'হ্যাল–'

'ওটা আমাকে দাও।' হোস পাইপটা খপ করে চেপে ধরল হ্যাল। ওয়ারউইকের ঘাড় ছেড়ে দিয়ে হোসটা তার মাথা বরাবর তাক করল। উইসকনস্কি ঘুরেই ছুট দিল ট্র্যাপডোরের দিকে। 'আগে বাড়ুন, জনাব ফোরম্যান।'

ওয়ারউইক হাঁটা দিল। ওরা যে জায়গায় এসেছে, মাথার ওপরে ওখানটায় শেষ হয়ে গেছে কারখানার সীমানা। হ্যাল ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল। সন্তুষ্ট বোধ করল। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল তাই ঘটেছে। ইঁদুরগুলো ওদেরকে ঘিরে ধরছে নিঃশব্দে মৃত্যুর মত। পালে পালে আসছে ওরা, দল বেঁধে আসছে একের পর এক। হাজার হাজার লোভী চোখ ওদেরকে লক্ষ করছে। দেয়ালের গায়ে একটা সারি দেখা গেল। গোটা দেয়াল ঢাকা পড়েছে কালো কালো দেহে।

ওয়ারউইক এক মুহূর্ত পরে ওগুলোকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ওরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলছে, কলেজ বয়।' তার গলার স্বর এখনও শান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত তবে তাতে উৎকণ্ঠাও রয়েছে।

'হুঁ,' বলল হ্যাল। 'চলতে থাকো।'

ওরা হাঁটছে, পেছন পেছন হোস পাইপটাকে টেনে আনছে হ্যাল। সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ইঁদুরের দল ওদের পেছনের সরু পথটা দখল করে নিয়েছে। পাইপের মোটা ক্যানভাসে দাঁত বসাচ্ছে। একটা ইঁদুর ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। মনে হলো যেন দাঁত বের করে হাসল। তারপর আবার নামিয়ে নিল মাথা। এখন বাদুড়গুলোকেও দেখতে পাচ্ছে হ্যাল। মাথার ওপরে ঝুলছে।

বিরাট বিরাট বাদুড়। কাকের সমান সাইজ।

'দেখো,' বলল ওয়ারউইক। পাঁচ ফুট সামনে আলো ফেলল।

সবুজ শ্যাওলা পড়া একটা মানুষের খুলি ওদের দিকে চক্ষুহীন কোটর বের করে হাসছে। আরেকটু সামনে কব্জি, হাত এবং ভাঙা পাঁজরের কংকাল দেখতে পেল হ্যাল। 'চলতে থাকো।' বলল ও। ওর ভেতরে কীসের যেন বিস্ফোরণ ঘটছে, উন্মাদ কিছু একটা।

ওরা হাড়গোড়গুলোর পাশ কাটাল। ইঁদুরগুলো এখন আর ওদের পেছন পেছন আসছে না। ওদের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে ইঁদুরকুলের। তবে সামনে একটা ইঁদুর দেখতে পেল হ্যাল। ছায়ায় ঢাকা থাকলেও ছুটে যাওয়ার সময় এক ঝলক ওটার গোলাপি লেজ দেখা গেল। টেলিফোন তারের মত মোটা লেজ।

সামনে মেঝে খাড়া হয়ে উঠে আবার নিচু ঢালের আকার পেয়েছে। হ্যাল খসখস শব্দ শুনতে পেল। বেশ জোরে হচ্ছে শব্দ এবং বিরতিহীন। ওখানে হয়তো এমন কিছু আছে যা মানুষ কোনদিন দেখেনি। হ্যাল হয়তো এরকমই কিছু একটা দেখার নেশায় এখানে এসেছে।

ইঁদুরগুলো আবার আসতে শুরু করেছে। মেঝের সঙ্গে পেট চেপে ধরে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে, ওদেরকে সামনে এগোতে বাধ্য করছে। 'দেখো,' শীতল গলায় বলল ওয়ারউইক।

দেখল হ্যাল। এখানকার ইঁদুরগুলোর মধ্যে কিছু একটা ঘটেছিল। কোন ভয়ঙ্কর মিউটেশন বা রূপান্তর যা সূর্যের আলোয় কখনও হয়তো টিকে থাকত না; প্রকৃতি একে নিষিদ্ধ করত। কিন্তু এখানে এই অন্ধকারের রাজ্যে প্রকৃতি এই ভয়াবহ, বিকট ব্যাপারটা ঘটতে দিয়েছে।

এই ইঁদুরগুলোকে স্রেফ দানবের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কয়েকটা তিন ফুট উঁচু। তবে এদের পেছনের পা নেই এবং এরা তাদের উড়ুক্কু ভাই-বেরাদারদের মতই অন্ধ। এক পৈশাচিক আকুলতায় তারা তাদের শরীর টেনে নিয়ে আসছে সামনে।

ঘুরল ওয়ারউইক, হ্যালের মুখোমুখি হলো। তার মুখে প্রবল ইচ্ছাশক্তির নির্দয় হাসি। মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না হ্যাল। 'আমরা আর এগোতে পারব না, হ্যাল। নিজেই দেখতে পাচ্ছ।'

'ইঁদুরগুলোর সঙ্গে তোমার কিছু কাজ আছে বলে আমার ধারণা,' বলল হ্যাল।

ওয়ারউইকের নিয়ন্ত্রণ ধসে পড়ল। 'প্লিজ,' বলল সে। 'প্লিজ।'

হাসল হ্যাল। 'চলতে থাকো।'

হ্যালের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল ওয়ারউইক।

'ওরা হোস পাইপে দাঁত বসাচ্ছে। কামড়ে ছিঁড়ে ফেললে আমরা আর ফিরতে পারব না।'

'জানি। এগোও।'

'তুমি একটা উন্মাদ–' একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল ওয়ারউইকের জুতোর ওপর দিয়ে। সে চিৎকার করে উঠল। হ্যাল হেসে হাতের ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে ইঙ্গিত

করল ওকে সামনে বাড়তে। ইঁদুরগুলো ওদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে, সব থেকে কাছেরটা এক হাত দূরেও নেই।

ওয়ারউইক আবার হাঁটতে শুরু করল। পিছিয়ে গেল ইঁদুরের দল।

ছোট্ট, উঁচু ঢালটাতে উঠে পড়ল ওরা। তাকাল নিচে। আগে উঠেছে ওয়ারউইক। হ্যাল দেখল তার মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। চিবুক বেয়ে থুতু পড়ছে। 'ওহ, মাই গড। ডিয়ার যীশাস।'

এবং সে ঘুরল দৌড় দিতে।

হোস পাইপের মুখ খুলে দিল হ্যাল। ভয়ঙ্কর তোড়ে পানি বেরিয়ে এল পাইপের মুখ থেকে, প্রচণ্ড ধাক্কা মারল ওয়ারউইকের বুকে। পরমুহূর্তে নেই হয়ে গেল ওয়ারউইক। পানির খলবল শব্দ ছাপিয়ে ভেসে এল তার আর্তনাদ। তারপর ঝপাস!

'হ্যাল!' হাঁপানোর শব্দ। তারপর তীব্র, তীক্ষ্ণ কিচকিচ আওয়াজে ভরে গেল চারপাশ।

'হ্যাল, ফর গডস সেক–'

কোন কিছু ছিঁড়ে ফেলার শব্দ হলো। তারপর আরেকটা চিৎকার। তবে আগের চেয়ে দুর্বল। বিশাল কিছু একটা নিয়ে টানাটানি চলছে, ওটাকে বোধহয় ওল্টানো হলো। হাড় ভাঙার মটমট আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল হ্যাল। কড়মড় করে হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে কেউ।

লেজশূন্য একটা মস্ত ইঁদুর লাফিয়ে পড়ল হ্যালের গায়ে। ওটার শরীর থলথলে, গরম। হ্যাল প্রায় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ওটার দিকে হোস ঘোরাল। পানির ধাক্কায় ছিটকে গেল ইঁদুর। তবে পানির তোড়ের জোর কমে এসেছে।

হ্যাল উঁচু ঢালটার কিনারে গিয়ে তাকাল নিচে।

কুখ্যাত এই গোরস্তান তথা পয়োনালির গোটা এলাকা জুড়ে শুধু ইঁদুর আর ইঁদুর। বিরাট বিরাট ইঁদুর। ধূসর রঙ, অন্ধ চোখ, একটারও লেজ নেই। হ্যাল ওগুলোর গায়ে আলো ফেললে বীভৎস মিউমিউ আওয়াজ করে উঠল কুৎসিত প্রাণীগুলো। ওদের রানীকে দেখতে পেল হ্যাল। আঁতকে উঠল আকার দেখে। যেন একটা বাছুর। ওয়ারউইকের ছিন্নভিন্ন লাশের মাংস আর হাড় চিবুচ্ছে।

'গুডবাই, ওয়ারউইক,' বলল হ্যাল। দেখল প্রকাণ্ডদেহী রানী মস্ত এক কামড়ে বড় এক খাবলা মাংস তুলে নিয়েছে ফোরম্যানের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি হাত থেকে।

ঘুরল হ্যাল। ফিরতি পথে চলল দ্রুত পদক্ষেপে। হোস দিয়ে পানি ছিটিয়ে সামনের ইঁদুরগুলোকে হটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পানির তোড় প্রতি সেকেণ্ডে কমে আসছে। কয়েকটা ইঁদুর এই সুযোগে ওর ওপর হামলা চালাল। বুটের ওপরের অংশে কামড় দিল। একটা ইঁদুর ওর উরু কামড়ে ধরে ঝুলে থাকল একগুঁয়ের মত। মোটা সুতির প্যান্ট ফালাফালা করে ফেলছে। এক ঘুসিতে ওটাকে ফেলে দিল হ্যাল।

রাস্তার প্রায় তিন ভাগ পার হয়েছে হ্যাল এমনসময় অন্ধকার সাব-সেলার ভরে গেল ফড়ফড় আওয়াজে। মুখ তুলে চাইল ও। প্রকাণ্ড একটা বাদুড় এসে

আছড়ে পড়ল ওর মুখের ওপর।

রূপান্তরিত বাদুড়গুলোর এখনও লেজ খসে পড়েনি। ঘিনঘিনে লেজ দিয়ে ওটা পেঁচিয়ে ধরল হ্যালের গলা, কামড় দিল ঘাড়ে। ওটার শরীর মোচড় খাচ্ছে, ঝিল্লির মত ডানা ঝাপটাচ্ছে। নখ দিয়ে খামচাচ্ছে হ্যালের ছেঁড়া জামা।

আগের মত হোস পাইপের নজল তুলল হ্যাল, বাদুড়টার গায়ে বারবার আঘাত করতে লাগল। ওটা ওর শরীর থেকে খসে পড়ল। ওটাকে পা দিয়ে মাড়াল হ্যাল। জানেও না যে সে চিৎকার দিতে শুরু করেছে। ইঁদুরের দল বন্যার মত ধেয়ে এল ওর দিকে। পা বেয়ে শরীরের ওপরে উঠতে শুরু করল।

হোঁচট খেতে খেতে ছুটল হ্যাল। হাত দিয়ে টেনে কয়েকটা ইঁদুর ফেলে দিল গা থেকে। অন্যগুলো কামড় বসাল ওর পেটে, বুকে। একটা দৌড়ে উঠে গেল কাঁধে। কামড় দিল ওর কানের লতিতে।

হ্যালের সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। শত শত ইঁদুরের কিচকিচ আওয়াজ দুই কান জুড়ে। একটা ইঁদুর টেনে নামাল গা থেকে। লোমশ শরীরগুলো পা দিয়ে মাড়াতে লাগল। কিন্তু অসংখ্য ইঁদুর ওকে ছেঁকে ধরেছে। গা থেকে কামড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে মাংস। কচমচ করে চিবুচ্ছে। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল হ্যাল। অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে, গলা দিয়ে একের পর এক বেরিয়ে আসতে লাগল ভৌতিক আর্তনাদ।

সকাল পাঁচটা। বৃহস্পতিবার।

'কারও একবার নিচে গিয়ে খোঁজ নেয়া উচিত,' বলল ব্রোচু।

'আমি যেতে পারব না,' ফিসফিস করল উইসকনস্কি। 'আমি যাব না।'

'তোমাকে যেতে হবে না, ডর-পুক,' নাক সিঁটকাল ইপস্টন।

'চলো, আমরা ক'জন মিলে যাই,' বলল ব্রোগান, একটা হোস তুলে নিল হাতে। 'আমি, ইপস্টন, ডেনজার ফিল্ড আর নেদাউ যাব। স্টিভেনসন, তুমি ওপরে গিয়ে কয়েকটা লাইট নিয়ে এসো।'

নিচের অন্ধকারে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ইপস্টন। 'হয়তো ওরা ধূমপানের জন্য বিরতি নিচ্ছে,' বলল সে। 'অল্প কয়েকটা ইঁদুরই তো বটে। এত সময় লাগে ওগুলোকে তাড়াতে!'

ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে ফিরল স্টিভেনসন। কয়েক মিনিট পরে ওরা নিচে নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

আমি কেন ভূত ভয় পাই না

আপনারা যদি কয়েক মাস আগে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন আমি ভূতে বিশ্বাস করি কিনা; সরাসরি জবাব হয়তো দিতে পারতাম না। হয়তো আঃ উঃ ধরনের কিছু একটা বলতাম। এবং ব্যাখ্যা করতাম যেহেতু এরকম কিছুর সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ ঘটেনি কাজেই স্পষ্ট করে কিছু বলতেও পারি না। আর অদ্ভুত এবং আশ্চর্য কত ঘটনাই তো ঘটে। সেসবের বেশিরভাগের যৌক্তিক ব্যাখ্যাও মেলে। কাজেই ভূত আছে কি নেই কী করে বলব?

তবে এসব কিন্তু কয়েক মাস আগের কথা বলছি। এখন আমাকে একই প্রশ্ন করুন, নির্দ্বিধায় জবাব দেব, 'হ্যাঁ, আমি ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি। শুধু তাই নয় আমি ওদেরকে একদম ভয় পাই না।' আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এমন কী ঘটল যে আমি হঠাৎ ভূতে বিশ্বাস শুরু করে দিলাম। এর জবাব আমি অবশ্যই দেব। গোটা ব্যাপারটা যদিও এখনও হজম করা মুশকিল কিন্তু এটা তো সত্যি যে ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল।

ঘটনার সূত্রপাত যখন আমার ছোটভাই ব্রায়ান ওয়েলসের অ্যাবিরিস্টউইথে ওর সঙ্গে ক'টা দিন কাটানোর আমন্ত্রণ জানাল। ও ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আমিও তখন কাজে ব্যস্ত ছিলাম না, ভাবলাম যাই, একটু ঘুরে আসি। বাইরে কোথাও যেতে মন চাইছিল খুব। ছোট ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করলাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম শ্রপশায়ার হয়ে স্নোডোনিয়া ন্যাশনাল পার্ক ঘুরে ওয়েলসে ঢুকব। অন্য রাস্তা ধরে আরও তাড়াতাড়ি যাওয়া যেত। কিন্তু আমি লং ড্রাইভ পছন্দ করি। গাড়িতে ঘুরতে বেশ ভাল লাগে।

আবহাওয়া ছিল চমৎকার। উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে আমার ভ্রমণও হয়ে উঠেছিল উপভোগ্য। শ্রপশায়ারের পাহাড়-পর্বত আর উপত্যকার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। ইংলিশ গ্রামগুলোর নিসর্গ সত্যি মনোমুগ্ধকর। আমি এমনকী ক্লানটন, ক্লানবারি, ক্লালগানফোর্ড এবং ক্লানেও ঢুঁ মারলাম শুধু এগুলো কোথায় তা আবিষ্কার করার জন্য। হাউসম্যানের দাবি, 'এগুলো পৃথিবীর নির্জনতম জায়গা।' না, সত্যি খুব সুন্দর জায়গা।

অবশেষে পশ্চিমে, ওয়েলসের দিকে আমার যাত্রা হলো শুরু। রাজপথ বা প্রধান রাস্তাগুলো এড়িয়ে চললাম আমি। বদলে গাড়ি চলাচল করতে পারে এরকম কোন চওড়া রাস্তা চোখে পড়লেই তাতে ঢুকে গেলাম। আশা করছি এভাবে পৌঁছে যেতে পারব ডোলগেলাউতে। এটি উপত্যকা বেষ্টিত ছোট একটি শহর। তবে সমস্যা হলো লক্ষ্যহীনভাবে গাড়ি চালালে, সিন-সিনারি দেখতে

দেখতে তাড়াহীন গতিতে এগোতে থাকলে রাস্তা ভুল হয়ে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক–এবং আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছিল, ঈশান কোণে জমে উঠছিল কালো মেঘ। তার পরপরই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। চড়চড় শব্দে উইণ্ডস্ক্রিনে বড়বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল। যে রাস্তায় আমি চলেছি তা বড্ড সরু, একটা ঘোড়ার গাড়ি বড়জোর যেতে পারবে। আর ভয়ানক খাড়া রাস্তা। ভাবলাম চওড়া এবং ভাল কোন রাস্তা পেলে তাতে উঠে পড়ব। যত দ্রুত সম্ভব রওনা হব বালা'র পথে। ডোলগেলাউতে কাল গেলেও চলবে। এরকম একটা সময় বুঝতে পারলাম আমার গাড়ির পেট্রল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

আমি যখন মেইন রোডে পৌঁছালাম ততক্ষণে ঘনিয়েছে সাঁঝের আঁধার এবং পেট্রলের অবস্থা খুবই খারাপ। আমার ম্যাপে সামনের বেশ কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কোন গ্রামের চিহ্ন নির্দেশ করছে না। শেষ পর্যন্ত রাতটা ওয়েলস পর্বতমালার মাঝখানে, গাড়ির মধ্যে শুয়েই কাটাতে হয় কিনা ভাবছিলাম। তবে ভাগ্যই বলতে হবে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় রাস্তার ধারে একটি পেট্রল পাম্প দেখতে পেলাম। ধূসর পাথরের তৈরি একটি কটেজের পাশে পেট্রল পাম্পটি। তবে ওটা বন্ধ। আমি পাম্পের মালিককে তার টেলিভিশন সেটের সামনে থেকে তুলে এনে অনুরোধ করলাম আমার গাড়ির ট্যাংকটা যেন ভরে দেয়।

পেট্রল নিয়ে আবার রওনা হলাম। খানিকটা রাস্তা এগিয়েছি এমনসময় ছেলেটাকে দেখতে পেলাম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, সামনে খুব বেশি দূরে যায় না দৃষ্টি, ঝাপসা দেখাচ্ছে সব কিছু। তবে ছেলেটিকে পরিষ্কার দেখা গেল। কারণ রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সে পকেটে হাত পুরে। তাকিয়ে ছিল আমার গাড়ির দিকে। আমি গাড়ি থামালাম। খুললাম প্যাসেঞ্জার ডোর।

'বাস মিস করেছ বুঝি?' হাঁক ছাড়ি আমি, অনুমান করেছি এ রাস্তা ধরে বাস চলাচল করে। ছেলেটি জবাব দিল না, শুধু মৃদু মাথা ঝাঁকাল। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স হবে; লম্বা, পরনে জিন্স এবং কালো জ্যাকেট। জ্যাকেটের বোতাম গলা পর্যন্ত আটকানো। ছেলেটির চেহারা কেমন ফ্যাকাসে, বিবর্ণ।

'লিফট চাই?' বললাম আমি। 'তাহলে উঠে এসো।' এখন আজাইরা প্যাঁচালের সময় নয় আর ছেলেটার ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি আমাকে একটু অস্বস্তিতেও ফেলে দিচ্ছিল। গাড়ির দরজা আরেকটু মেলে ধরলাম আমি, ও সত্যি আসবে কিনা ভাবছিলাম। তবে কোনরকম দ্বিধা না করে ছেলেটি বসে পড়ল প্যাসেঞ্জার সীটে। আমি হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলাম প্যাসেঞ্জার ডোর এবং নিরাপত্তার খাতিরে লক করলাম।

'কী বিশ্রী রাত!' বললাম আমি। 'তুমি তোমার বাস মিস করেছ?' জিজ্ঞেস করলাম আবার–কারণ এ কারণটি ছাড়া এমন ঝড়-বাদলের রাতে নির্জন রাস্তায় কোন কিশোর কেনই বা দাঁড়িয়ে থাকবে?

ছেলেটি চুপ করে রইল। আমি ভাবলাম ও বোবা নাকি? আরেকবার চেষ্টা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব?'

এবারে সে জবাব দিল–তবে ওয়েলশ ভাষায়। হয়তো ইংরেজি তেমন বলতে পারে না ছেলেটি কিন্তু বুঝতে পারে। ‘আমি ওয়েলশ তেমন জানি না,’ বললাম আমি। ‘তুমি “ট্রী” শব্দটি বলেছ–কোন গাছপালা নাকি?’

‘স্ট্রিকেন,’ বয়ঃসন্ধির ভাঙা গলায় জবাব দিল সে।

‘স্ট্রিকেন ট্রিজ–এটা তো অদ্ভুত একটা নাম। ইংলিশ কিংবা ওয়েলশ কোন ম্যাপে এরকম কোন জায়গা আছে বলে মনে পড়ছে না। এটা কি কোন স্থানীয় নাম?’

‘জী,’ বলল সে।

‘জায়গাটা কি অনেক দূরে?’

‘না।’

বাহ্, কী চমৎকার আলাপচারিতা। হ্যাঁ আর না-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাহ্, এ ছেলের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। তবু একজন সঙ্গী তো পাওয়া গেল। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

‘ওখানে পৌঁছালে আমাকে বলে দিয়ো,’ বললাম আমি। ‘নইলে হয়তো দেখবে তোমাকে বালা পর্যন্ত নিয়ে গেছি।’ এ কথা শুনে সে সীটে একটু গা মোচড়ামুচড়ি করে আমার দিকে তাকাল। যাক ছেলেটা একেবারে রোবট না। হয়তো বালায় তার গার্লফ্রেণ্ড আছে। ওখানে যেতেও আপত্তি নেই।

কিন্তু ছেলেটির আচরণে অস্থিরতা প্রকাশ পেল, আনন্দ নয়।

‘কী হলো?’ জানতে চাই আমি।

‘বালায় যাবেন না, মিস্টার,’ গলার স্বরে জরুরি ভাব ফুটল তার। ‘আজ রাতে নয়...’

ওর বলার ভঙ্গি দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার হো হো হাসির সঙ্গে যুক্ত হলো বজ্রপাতের আওয়াজ। ‘কেন যাব না? বালার আগে তো কোথাও থাকার জায়গাও নেই। আর আমি এমন ক্লান্ত এবং জয়েন্টগুলোয় এমন খিঁচ ধরে গেছে যে ডোলগেলাউ পৌঁছাতে আরও ত্রিশ কিলোমিটার পথ ঠ্যাঙাতে পারব না।’

‘বালা যাবেন না, মিস্টার,’ পুনরাবৃত্তি করল সে।

‘জায়গাটা অত খারাপ নয়, হে,’ ঠাট্টার সুরে বললাম আমি। কখনও গিয়েছ ওখানে?’

‘রওনা হয়েছিলাম কিন্তু যেতে পারিনি,’ জবাব দিল সে।

ও কেন যেতে পারেনি জানার আগ্রহ বোধ করলাম না। বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়াতেও ইচ্ছা করছিল না। কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম আমি। ছেলেটি কেমন যেন অদ্ভুত–চোদ্দ বছর বয়সের ছেলেরা ঠিক এরকম নয়। ‘কী নাম তোমার?’

কিছু বলতে হয় তাই জিজ্ঞেস করা।

‘হু,’ জবাব দিল সে। তারপর মুখে তালা মারল ও। আমিও আর কথা না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলাম। ঝুম বৃষ্টির কারণে বেশি স্পীড তুলছি না।

মিনিট দশেক বাদে, রাস্তায় চোখ রেখে আমি জানতে চাইলাম, ‘হু, এই যে

জায়গাটা–স্ট্রিকেন ব্রিজ–আমরা কি এর কাছাকাছি কোথাও এসেছি?' সর্পিল রাস্তায় আমার চোখ ছিল তাই বলতে পারব না ও আমার কথা শুনেছে কিনা। 'হু,' গলা চড়ালাম আমি। 'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? আমরা কি স্ট্রিকেন ব্রিজের কাছাকাছি এসেছি?' হঠাৎ আমার ঘাড়ের পেছনটা শিরশির করে উঠল, মাথা না ঘুরিয়েই বুঝতে পারলাম কী হয়েছে...তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে গাড়ি থামালাম রাস্তার ধারে। হু নেই গাড়িতে।

তখন কী ঘটেছিল পরিষ্কার মনে আছে আমার। যেন এক ঘণ্টা আগের ঘটনা। প্রথমে ভয়ের একটা স্রোত আমাকে অবশ করে দেয়, তারপর বিস্ময় আমাকে গ্রাস করে যখন দেখি প্যাসেঞ্জার ডোর তখনও বন্ধ, শেষে আসলে কী ঘটেছে অনুমান করে আমি স্বস্তি বোধ করি। হু আমাকে বলেছিল কোথায় থামতে হবে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছালে সে আমাকে না বলেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে। আমি অপরাধ বোধে ভুগছিলাম এই ভেবে আমি নিশ্চয়ই গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম–লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করার সময় অনেক ড্রাইভারের ক্ষেত্রেই এরকমটি ঘটে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ইন্সটিংক্ট দ্বারা চালিত হয়ে আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কপাল ভাল কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। 'এ ঘটনায় তোমার একটা শিক্ষা হওয়া দরকার।' নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম আমি। 'এখন সামনে কোন গ্রাম দেখলে সেখানে থেমে একটু বিশ্রাম নিয়ে পেটে কিছু দিয়ো।' আমি আবার ছেড়ে দিলাম গাড়ি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটি ছোট গাঁয়ে হাজির হলাম।

কতগুলো বাড়িঘরের মধ্যে একটি সরাইখানা চোখে পড়ল। গাড়ি পার্ক করে ভেতরে ঢুকলাম। উঁচু কাউন্টারের পেছনে এক প্রৌঢ়া বসে বসে সোয়েটার বুনছেন। বারটি ছোট। উষ্ণ এবং ধোঁয়াচ্ছন্ন। লোকজন পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে আড্ডা জমিয়েছে। ওয়েলশ ভাষায় কথা বলছে জনা। তবে ল্যাণ্ডলেডি আমার সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বললেন। 'গুড ইভনিং স্যার। খুবই বিশ্রী আবহাওয়া। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?' বুননের সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে টুল থেকে নেমে পড়লেন তিনি।

'এক পাইন্ট বিয়ার, প্লিজ,' বললাম আমি। 'সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ হবে? অনেকক্ষণ কিছু খাইনি।'

ল্যাণ্ডলেডি পেছনের কামরায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল বিয়ার এবং মস্ত এক স্যাণ্ডউইচ নিয়ে। অমন পুরু, রসালো এবং সুস্বাদু বিফ স্যাণ্ডউইচ আমি জীবনে খাইনি। তারিয়ে তারিয়ে খাবারটা খাচ্ছিলাম। সরাইখানার লোকজন একবার আমার দিকে হালকাভাবে তাকিয়ে আবার নিজেদের গল্পে মজে গেছে। তবে মিসেস ক্যাডওয়ালাডার মানে ল্যাণ্ডলেডিটি আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলাম লণ্ডনে যে রাস্তার মোড় থেকে আমি দুধ কিনি সেটা এই ভদ্রমহিলার ভাইয়ের ডেয়ারি। তিনি আমার বৃদ্ধ ফুপু ব্লডওয়েনকে চেনেন। ফুপু থাকেন ক্লিন্টশায়ারে, একটি পাহাড়ের ওপরে বাড়িতে। জানালেন আমার ফুপুকে নাকি উত্তর ওয়েলসের সবাই-ই চেনে। আমি যখন তাঁকে বললাম আজ রাতটি আমি

বালায় কাটানোর অভিপ্রায় করেছি, তিনি বেশ খুশি হলেন।

'চমৎকার শহর,' বললেন মিসেস ক্যাডওয়ালাডার। 'আর আপনি যদি খুব ভাল বাড়িতে থাকতে চান তাহলে মরগান লিফনাণ্ট আর্মসের কাছে যেতে পারেন। সে সম্পর্কে আমার দেবর। ওর বাড়ির কামরাগুলোর সামনেই রয়েছে চমৎকার ফুলের বাগান এবং আবহাওয়া ভাল থাকলে আপনি লেকেও ঘুরতে যেতে পারবেন আর ওখানকার লিনেনগুলো স্নোডনের বরফ পাহাড়গুলোর মতই চকচকে এবং পরিষ্কার!'

'আমি তাহলে লিফনাণ্ট আর্মসের ওখানেই উঠব,' কথা দিলাম। বালার প্রসঙ্গ তুলতে স্ট্রিকেন ট্রিজের সেই অদ্ভুত যাত্রীটির কথা মনে পড়ে গেল। মিসেস ক্যাডওয়ালাডার বারের পেছন দিকে কী যেন কাজ করতে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন, আমি ঈষৎ গলা উঁচিয়ে বললাম, 'ভাল কথা, এ এলাকায় হু নামে কোন ছেলেকে আপনি চেনেন?'

কামরার শব্দগুলো হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল। মিসেস ক্যাডওয়ালাডার, এখনও আমার দিকে পেছন ফেরা, প্রস্তরবৎ জমে গেলেন। টের পেলাম ঘরের প্রতিটি মানুষ আমার দিকে তাকিয়েছে। আমি যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছি–যদিও কী করলাম সে ব্যাপারে কোনই ধারণা নেই আমার। আমি বোকার মত আরেকটা ভুল করে বসলাম। 'আর স্ট্রিকেন ট্রিজ নামের জায়গাটাই বা কোথায়?'

মিসেস ক্যাডওয়ালাডার যখন ঘুরলেন তাঁর চোখে দেখতে পেলাম প্রগাঢ় সহানুভূতি, তবে সেটি আমার জন্য নয়, কারণ তিনি কামরার কারও উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, মি. গ্রিফিথস।' নরম গলা তাঁর। 'আপনি যেন মন খারাপ করবেন না।'

আমি ঘুরে তাকালাম দেখতে কে মি. গ্রিফিথস এবং কেনই বা তিনি আমার নির্দোষ প্রশ্নে মন খারাপ করতে যাবেন। কামরার পেছন দিকের একটি জটলা থেকে এক লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেন। ছোটখাট মানুষ, শীর্ণচর্ম, নরকংকালের মত মুখ যাতে চামড়া ছাড়া মাংসের বালাই নেই। তাঁর চক্ষুদুটি গভীর বিষাদময়। তিনি যখন কথা বললেন, গুরুগম্ভীর এবং ভরাট শোনাল কণ্ঠ, বাগ্মীদের মত। অমন ভাঙাচোরা দেহের একজন মানুষের এমন গলার স্বর সত্যি বেমানান।

'আপনার সঙ্গে আজ রাতে হু'র দেখা হয়েছে।'

তিনি প্রশ্ন করলেন নাকি মন্তব্য বুঝতে পারলাম না। তবে নিজেকে মনে হলো কড়া মেজাজের হেডমাস্টারের সামনে স্কুল ছাত্রের মত। 'জী। কুড়ি কিলোমিটার পেছনে স্ট্রিকেন ট্রিজ নামের একটি জায়গায় ওকে আমি লিফট দিয়েছি। তবে সত্যি বলতে কি ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলাম কিনা মনে নেই আমার।'

'মনে না-ও থাকতে পারে।' বললেন মি. গ্রিফিথস। তাঁর মুখে কঠোর এক টুকরো হাসি।

'প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বোধহয় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'সে কী বলল?'

'তেমন কিছুই বলেনি,' জবাব দিলাম আমি। 'খুবই চুপচাপ স্বভাবের ছেলে–এমন বয়সী ছেলেপিলেরা ঠিক এমনটি হয় না। ও হ্যাঁ, আজ রাতে সে আমাকে বালায় যেতে মানা করেছিল।' আমি ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে রুমের অনেকেই হাসবে। কিন্তু কেউ হাসল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পরে মি. গ্রিফিথস আবার বললেন, 'তাহলে আজ রাতে বালায় যাবেন না...'

তাঁর গলা দিয়ে কেমন ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে এল। মাথা নিচু করে তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ভদ্রলোকের দলের একজন তাঁর পেছন পেছন যাওয়ার জন্য টেবিল ছেড়েছিল, আরেকজন এ লোকের জামার আস্তিন চেপে ধরল। 'না, ডাই। ওঁকে একা থাকতে দাও। ওঁকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না।'

অন্যরা সায় দেয়ার ভঙ্গিতে গুঞ্জন তুলল। ডাই নামের লোকটি আবার বসে পড়ল নিজের জায়গায়। তারপর ঘরের আবহাওয়া বদলে গেল। লোকজন এসে ভিড় করল আমার কাছে, জিজ্ঞেস করল আমার নাম, জানতে চাইল কোত্থেকে এসেছি, কী করি, বই পড়তে ভালবাসি কিনা, কী ধরনের মিউজিক আমার পছন্দ ইত্যাদি নানান প্রশ্ন করতে লাগল টেলিভিশনের ট্রেইনি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মত। কিন্তু কেউ হু অথবা স্ট্রিকেন ব্রিজ নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। বুঝতে পারলাম এরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ বিষয় দুটি এড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু আমার প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে পেলাম সম্মিলিত কৃত্রিম হাসি।

'হু? সে টেড গ্রিফিথসের ছেলে।'

'ওকে নিয়ে উনি খুব দুশ্চিন্তা করেন, দেখলেনই তো।'

'ওই পরিবারটি খুব ভাল একটি পরিবার।'

'আরেকটা ড্রিংক নেবেন?'

'না, ধন্যবাদ।' বললাম আমি। 'আমি গাড়ি চালাবার সময় শুধু এক পাইন্ট বিয়ার খাই। কিন্তু গ্রিফিথস পরিবার আমাকে বালা যেতে মানা করল কেন? আমি তো মরগান লিফন্যান্ট আর্মসের ওখানে যেতে মুখিয়ে আছি।'

সবাই আরও বেশি মেকি হাসাহাসি করল–এমনকী মিসেস ক্যাডওয়ালাডারও। 'আরেকটা বিয়ার নিন,' শুধু এ কথাটিই ওদেরকে পুনরাবৃত্তি করতে শুনলাম। নাহ্, এখানে থেকে আর লাভ নেই। একটি রহস্য নিশ্চয়ই আছে, তবে ওরা সেই গোপন বিষয়টি আমাকে জানতে দিতে চাইছে না। আমি ল্যাণ্ডলেডিকে ধন্যবাদ দিলাম। লোকগুলোকে শুভরাত্রি জানালাম, বললাম এদিকে আবার এলে অবশ্যই এখানে একবার উঁকি মেরে যাব। গাড়িতে ফিরে এলাম আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওখানে আর ভাল লাগছিল না। এখনও বৃষ্টি থামেনি, আকাশে দ্রুত উড়ে বেড়াচ্ছে কালো মেঘ।

গ্রামের আলোকিত বাড়িঘর ছেড়ে আসার পরে আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনের অস্বস্তি দূর করতে গুনগুনিয়ে ভাঁজতে লাগলাম একটা গানের সুর। কিছু দূর না যেতেই খকখক কেশে উঠল ইঞ্জিন।

প্লিজ, কোন গণ্ডগোল করিস না, আমি কাতরে উঠলাম–অন্তত এখানে না। কিন্তু আমার অনুরোধ গায়ে মাখল না গাড়ি, খ্যাকর খ্যাক কাশি দিতে দিতে থেমে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে দেখব ভাবছি, পেট্রল গজের দিকে চোখ যেতে থমকে গেলাম। আমার গাড়ি পেট্রল শূন্য! নিডল খালি ট্যাংক দেখাচ্ছে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে গাড়ির পেছনে চলে এলাম আমি। পেট্রল ট্যাংকের ছিপি খোলা। আমি রাস্তার ধারের পেট্রল পাম্প থেকে ছয় গ্যালন পেট্রল কিনেছিলাম। কেউ পুরো পেট্রল লোপাট করে দিয়েছে। ক্রোধে আমার হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম রাস্তার ধারে, কাঠের একটা খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। হু। উঁকি মেরে দেখছে আমাকে। তার সাদা মুখটা দেখা যাচ্ছে গাড়ির হেডলাইটের আলোয়।

আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। 'হু!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'এসব কী হচ্ছে? আমার পেট্রল কে চুরি করল? তুমি নাকি তোমার বাপ? হু–কোথায় গেলে? আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না, ঈশ্বরের দোহাই!'

চিৎকার চেঁচামেচি করে লাভ হলো না। অদৃশ্য হয়ে গেছে হু। শুধু তার ফিসফিসানি আমার কানে বাজছে। 'আজ রাতে বালায় যাবেন না, মিস্টার...'

আজ রাতে আমার কোথাও যাওয়া হবেও না, হতাশ হয়ে ভাবলাম আমি। রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে গাড়ির পেছনের আসনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে। হু যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে আমার অলস দৃষ্টি গেল। কাঠের খুঁটির গায়ে একটা সাইনবোর্ড টাঙানো। তাতে কীসব লেখা। এখান থেকে পড়া যাচ্ছে না। কৌতূহলী হয়ে গাড়ি থেকে একটি টর্চ নিয়ে ওদিকে এগোলাম। টর্চের আলো ফেললাম বোর্ডের গায়ে। লেখাগুলো পরিষ্কার পড়া গেল:

DAFYDD FARM
BED and BREAKFAST
DAIRY PRODUCT

স্বস্তির ফল্গুধারা বইল দেহ-মনে। বিলাসী না হোক, একটা রাত থাকা-খাওয়ার মত ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকবে ওখানে, ভাবলাম আমি। ব্যাক সীট থেকে আমার সুটকেসটি নিয়ে দরজায় তালা মেরে ডেফিড ফার্মের রাস্তায় পা বাড়ালাম প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। গোড়ালি ডোবা কাদা মাড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম।

এত রাতে দর্শনার্থী দেখে মিসেস জেনকিনসন মোটেই অবাক হলেন না। আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। ফার্মহাউসের রান্নাঘরটি ঝকঝকে তকতকে। শীঘ্রি আমার সামনে হাজির হয়ে গেল গরমাগরম হ্যাম এবং ডিম ভাজা যার স্বাদ যে কোন চার তারকা হোটেলের চেয়ে বেশি।

খাওয়ার সময় মিসেস জেনকিনসন আমার কাছেই থাকলেন যাতে কোনকিছু দরকার হলে দিতে পারেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার বেশ জমে উঠল। আমি তাঁকে হু, তার বাপ, আমার খালি পেট্রল ট্যাংক এবং সরাইখানার মানুষগুলোর অদ্ভুত আচরণের কথা বললাম। কথা শোনার সময় তিনি বারবারই সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর আপেলের চাটনি এবং জমাট বাঁধা

ক্রিমের মস্ত ডিশ আমার সামনে নামিয়ে রেখে টেবিলের বিপরীত দিকে বসলেন।

'আপনার বোধকরি পুরো ব্যাপারটিই খুব রহস্যময় লাগছে, স্যর।' শুরু করলেন তিনি। 'তবে কিছু জিনিস আপনার কাছে পরিষ্কার করে দিতে পারি। হু একটা ভূত...'

নিতান্তই মামুলি ভঙ্গিতে বললেন তিনি। আমাকে চমকে উঠতে দেখে হাসলেন। তারপর বলে চললেন, 'গায়ের লোকের ধারণা হু'র অস্তিত্ব রয়েছে একমাত্র তার বাবার কল্পনায়। কিন্তু আসলে ও সত্যিকারের ভূত। আমি নিজে ওর ভূত দেখেছি, ওর সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমি কল্পনার কোন ধার ধারিনা, বিশ্বাস করুন।'

'বিশ্বাস করছি,' বললাম আমি। 'কিন্তু এ গল্পের সঙ্গে স্ট্রিকেন ব্রিজ-এর কী সম্পর্ক?'

'ওখানে গ্রিফিথস পরিবার বাস করে। কয়েক বছর আগে বজ্রপাতে তাদের বাড়ির গাছগুলো সব পুড়ে যায়। গাছের কংকালগুলো এখনও বেতো বুড়োদের মত বাঁকা হয়ে আছে তবে ওতে আর কোনদিন পাতা গজায়নি। তিন বছর আগে হু'র জীবনে একটা ঘটনা ঘটে। তখন তার বয়স তেরো। টেড গ্রিফিথস ভাবতেন তাঁর ছেলে খুব দুর্বল, তাই তিনি ওকে বাইরে খেলতে যেতে দিতেন না। যদিও হু সুযোগ পেলেই গাছে চড়ত কিংবা ফুটবলে লাথি কষিয়ে প্রমাণ করত সে খুব একটা দুর্বল নয়। এক দিন বালায় ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল আসে। হু তার বন্ধুদের সঙ্গে সার্কাস দেখতে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার বাবা যেতে দেননি। তিনি বলেন রাতের হিম বাতাসে বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে হু'র ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মনে আছে উইন ইভাসের পুরানো বাসে চড়ে ছেলেপিলেরা রওনা হয়ে গিয়েছিল। দড়াবাজ, ক্লাউন, সিংহ-হাতি ইত্যাদি দেখার উত্তেজনায় তারা ছিল অস্থির। বন্ধুরা চলে যাওয়ার সময় তাদেরকে হাত নেড়ে বিদায় জানায় হু, তারপর বিষণ্ন মনে ফিরে আসে স্ট্রিকেন ব্রিজে। তবে সে বাড়ি ফেরেনি কারণ তার বন্ধু বিলি তার নতুন কেনা বাইকটা টপ-শপ দোকানের দেয়ালের ধারে রেখে গিয়েছিল এবং ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ওটা দেখে দুর্দমনীয় লোভ জেগে ওঠে হু'র মনে। সে বাইক নিয়ে বাতাসের গতিতে রওনা হয় বাসের পেছন।

'সে যদি একবার চিন্তা করত তাহলে বুঝতে পারত ত্রিশ কিলোমিটার রাস্তার নানান চড়াই উতরাই পার হয়ে ঠিক সময়ে বালা পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার অনেক আগেই শুরু হয়ে যাবে সার্কাস। কিন্তু এসব মাথাতেই আসেনি হু'র। সে শুধু সর্বশক্তি দিয়ে বাইকের পেডল মেরে চলছিল। বালার মাঝামাঝি এসেছে এমনসময় ঘটে যায় চরম করুণ ঘটনাটি—এরকম হাজারে একটি ঘটে। পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড একটা বোল্ডার গড়াতে গড়াতে নেমে এসে আছড়ে পড়ে হু'র গায়ে। হু ছিটকে পড়ে যায় বাইক থেকে, চাপা খায় বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা এক গাড়ির চাকায়।

'মারাত্মক আহত হয়েছিল হু। গাড়ির লোকজন তাকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে

গাড়িতে ওঠায় এবং স্ট্রিকেন ব্রিজ অভিমুখে ছোটে। জ্ঞান হারাবার আগে তাদেরকে বলেছিল সে কোথায় যাবে। তবে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই মারা যায় হু।

'প্রবল শোকে-দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে যান হু'র বাবা। এই শোক তাঁর স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটায় দারুণভাবে। তিনি শুকিয়ে হাড্ডি হয়ে যান। হু ছিল তাঁর চোখের মণি। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি প্রায় একটা লাশে পরিণত হন। এই লাশে প্রাণ সঞ্চার হয় যখন তিনি হু'র প্রেতাত্মাকে নিয়ে চিন্তা করেন। তখন তিনি রাস্তায় রাস্তায় হাঁটেন আর ছেলের নাম ধরে ডাকেন, বিলাপ করে বলেন হু যেন তাঁকে মাফ করে দেয় সেদিন তিনি ওকে সার্কাস দেখতে যেতে দেননি বলে।'

'হু কি সবসময়ই লোককে বালা যেতে মানা করে যেভাবে আমাকে করল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না তো!' বললেন মিসেস জেনকিনসন। 'আমি তো কখনও শুনিনি ও কাউকে বালা যেতে মানা করেছে। আপনাকে কেন বলল বুঝতে পারলাম না...'

আমি বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা করলাম। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পেলাম না। হু'র কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমে জড়িয়ে এল চোখ।

পরদিন সকালে চমৎকার নাশ্তা সেরে বেরিয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি। মি. জেনকিনসন আমার শূন্য ট্যাংকে পেট্রল ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমি পাহাড়-পর্বত আর উপত্যকার নিসর্গ উপভোগ করতে করতে বালার উদ্দেশে গাড়ি ছোটালাম। হঠাৎ দেখি রাস্তায় এক পুলিস, সে ট্রাফিকের দায়িত্ব পালন করছে। এমন নির্জন রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কী প্রয়োজন মাথায় এল না। আমাকে হাত নেড়ে থামতে বলল সে।

'দুঃখিত, স্যর,' আমাকে গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করতে দেখে বলল পুলিসম্যান। 'আপনি আর সামনে যেতে পারবেন না। বালার রাস্তা বন্ধ।'

'কিন্তু ওখানে তো আমাকে যেতেই হবে,' আপত্তি করলাম আমি। 'কখন খুলবে রাস্তা?'

'ঠিক বলতে পারব না, স্যর। তবে সময় লাগবে।'

'কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে?'

'প্রাকৃতিক অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারেন, স্যর।'

'কীরকম?'

পুলিসম্যান বুড়ো আঙুল বাঁকিয়ে তার পেছন দিকের রাস্তা দেখাল। ওদিকেই যাচ্ছিলাম আমি। 'গতরাতে প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রবল ভূমিধস হয়। প্রায় অর্ধেকটা পাহাড় আছড়ে পড়ে এই রাস্তা এবং উপত্যকার গায়ে। ভাগ্যিস কালকে আপনি রওনা হননি তাহলে আপনার টিকিটিও কেউ খুঁজে পেত না–বালা যাওয়া দূরে থাক।'

হু, মনে মনে বললাম আমি, গতরাতের মত যদি তোমার উদ্দেশ্য মহৎ থাকে তাহলে তুমি যত খুশি আমার গাড়ির পেট্রল চুরি করতে পার কিচ্ছু বলব না। গাড়ি ঘোরালাম আমি। চললাম স্ট্রিকেন ব্রিজের দিকে। মি. গ্রিফিথস যখন

শুনবেন হু'র প্রেতাত্মা আমার জীবন বাঁচিয়েছে, মৃত সন্তানের জন্য তাঁর নিশ্চয়ই গর্ব হবে, হয়তো খানিকটা হালকা হবে শোক।

এখন বুঝতে পারলেন তো আমি কেন ভূতে বিশ্বাস করি এবং সবাই যদি হু'র মত হয় তাহলে তাদেরকে ভয় পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

দেয়াল

পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের একটি ছোট শহর ডানপুলে বাস করেন মি. রবিনসন। হাইস্ট্রীটে ছোট্ট, সুন্দর বাড়িটিতে একাই থাকেন তিনি। মি. রবিনসন ধনবান, কাজেই আয়-রোজগারের চিন্তা তাঁকে করতে হয় না। বিয়েশাদী করেননি তবে একদম একাও নন। বাড়ি জুড়ে তাঁর সঙ্গী বই। হাজার-হাজার বই। এসব বই পড়েই তাঁর সময় কেটে যায় দিব্যি। এছাড়া তিনি হাঁটাহাঁটি করতেও বেশ ভালবাসেন। ডানপুল ঘিরে যে উঁচু, অনাবাদী জমি রয়েছে সেখানে হাঁটতে যেতে তিনি পছন্দ করেন। মিসেস উইলস প্রতিদিন এসে তাঁর ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, রান্নাবান্না করে। মহিলা বকবক করতে ভারী ভালবাসে। মি. রবিনসন তাঁর বন্ধুদেরকে বলেন মিসেস উইলস যতদিন তাঁর হাউসমেইডের কাজ করবে ততদিন তিনি একাকী বোধ করবেন না।

বসন্তের এক দিন, মি. রবিনসন বেরিয়েছেন পাহাড়ে হাঁটতে। চমৎকার রোদ ছড়াচ্ছে সূর্য, মনের সুখে গান ধরেছে পক্ষীকুল। মি. রবিনসনের মনে বেশ ফুর্তিভাব। অবশ্য পাহাড়ের দিকটাতে এলে সবসময়ই তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অকর্ষিত, পতিত বিশাল জমি দেখেন তিনি আনন্দ নিয়ে। ফুরফুরে তাজা বাতাস, নির্জনতা, সবুজ ঘাস, ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি সব কিছু দেখে তাঁর মনে হয়, 'আহ্! বেঁচে থাকা কী আনন্দের!'

মি. রবিনসন তাঁর চেনা পথ ধরেই হাঁটছিলেন। হঠাৎ বামে একটি রাস্তা চোখে পড়ল তাঁর। 'আশ্চর্য!' মনে মনে বললেন তিনি, 'এই রাস্তাটা তো আগে কখনও দেখিনি।'

পরিচিত পথ ছেড়ে বামে মোড় নিলেন তিনি। রাস্তাটা একটি উপত্যকা এবং উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। উপত্যকায় খুদে একটি নদীও আছে। 'এত সুন্দর জায়গা আগে কখনও চোখে পড়ল না,' ভাবছেন মি. রবিনসন। খুবই নির্জন তবে পতিত ভূমির এই নীরবতা তাঁর খুব ভাল লাগছিল। ম্যাপ দেখলেন মি. রবিনসন। উঁচু পাহাড়টির কথা আছে ম্যাপে। পাহাড়টির নাম ওল্ডক্যাসল হিল।

মাইলখানেক হাঁটার পরে ওল্ডক্যাসল হিলের পাদদেশে পৌঁছলেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন পাহাড়টা বাইবেন যাতে চুড়োয় বসে দৃশ্যপট আরও সুন্দরভাবে দেখা যায়। খাড়া পাহাড়ে চড়া খুব সহজ হলো না মি. রবিনসনের জন্য। বেশ কয়েকবারই বিরতি নিতে হলো। তবে যতবার তিনি থামলেন, চোখ ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিলেন। এবং প্রতিবারই অঞ্চলটি তাঁর কাছে বুনো মনে হলো

'অদ্ভুত!' ভাবলেন তিনি। তবে এর ব্যাখ্যা দিলেন যেহেতু তিনি ক্রমে ওপরে উঠছেন তাই নিচের প্রকৃতি তাঁর কাছে আরও বেশি বিরান ঠেকছে। পাহাড়চুড়োয় উঠে তিনি নিচে তাকালেন। একদম চেনাই যাচ্ছে না। যেন অন্য কোন দেশে তিনি হাজির হয়েছেন।

'এ জায়গাটা আমার হাতের তালুর মত চেনা,' বিড়বিড় করলেন মি. রবিনসন। 'অথচ আজ সব কেমন অচেনা লাগছে। অবশ্য এর আগে তো আর আমি পাহাড়চুড়োয় উঠে প্রকৃতি দেখিনি। কাজেই একটু ভিন্নরকম মনে হতেই পারে। অন্তত ডানপুলে ফেরার রাস্তাটি তো দেখতে পাচ্ছি।'

মি. রবিনসন চারদিকে নজর বুলালেন। ছোট-ছোট সবুজ ঘাসে ঢাকা চুড়ো। গাছপালার বালাই নেই, রয়েছে কেবল জমিনের মাঝ বরাবর নিচু একটা দেয়াল। তিনি ওদিকে হেঁটে গেলেন। মাটির তৈরি দেয়াল। ঘাসে মোড়া। চার ফুট উঁচু দেয়াল। দেখে মনে হয় বহু প্রাচীন।

'এ জিনিস কে বানাল?' নিজেকে প্রশ্ন করলেন মি. রবিনসন। তিনি দেয়ালে উঠে পড়ে ওপাশের মাটিতে নামলেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে চনমনে রোদ উপভোগ করতে লাগলেন। এমন আরাম লাগছিল যে ঘুম এসে গেল।

ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে হেলে পড়ছে। তাড়াতাড়ি সিধে হলেন মি. রবিনসন, দেয়াল টপকে পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করলেন। অন্ধকারে পাহাড়ে থাকার কোন খায়েশ তাঁর নেই।

পাহাড়ের মাঝামাঝি তিনি নেমেছেন হঠাৎ গা কেমন ছমছম করে উঠল মি. রবিনসনের। তাঁর মনে হচ্ছিল পাহাড়চুড়ো থেকে কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। 'বোকার মত ভয় পাচ্ছ কেন?' নিজেকে দাবড়ি দিলেন তিনি। 'পাহাড়ের দিকে তুমি পেছন ফিরে আছ। কী করে বুঝলে তোমার দিকে কেউ ওখান থেকে তাকিয়ে আছে?' তিনি যথেষ্ট সাহসী। ঠিক করলেন এখুনি পেছন ফিরে দেখবেন। কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলে জানতে চাইবেন সে কেন মি. রবিনসনকে লক্ষ করছে।

ঠিক তখন স্বপ্নটির কথা মনে পড়ে গেল মি. রবিনসনের। পাহাড়চুড়োয় দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমানোর সময় স্বপ্নটি দেখেছিলেন। তিনি থামলেন না, পেছন ফিরে তাকানো দূরে থাক। ডানপুলের রাস্তার দিকে ছুট লাগালেন। চেনা রাস্তায় না আসা পর্যন্ত তাঁর গতি মন্থর হলো না।

পাহাড়চুড়োয় ঘুমাবার সময় তিনি স্বপ্নে কয়েকটি কণ্ঠ শুনতে পেয়েছেন। কণ্ঠগুলো কী বলছিল বুঝতে পারেননি। অচেনা কোন ভাষা, ইংরেজি নয়। ওগুলো নারীদের নাকি পুরুষের কণ্ঠ ছিল? নিশ্চিত নন মি. রবিনসন। তবে মনে হচ্ছিল লোকগুলো খুব রেগে যাচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যে তারা যেন মি. রবিনসনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তবে তিনি ওদেরকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, ওরা তাঁকে লক্ষ করছিল।

ঘুম থেকে ওঠার পরে স্বপ্নের কথা ভুলে গিয়েছিলেন মি. রবিনসন। তখন তাঁর ভাবনা ছিল সাঁঝ ঘনাবার আগেই ফিরতে হবে ডানপুল। তবে স্বপ্নটি স্মৃতিতে ফিরে আসে যখন তাঁর মনে হচ্ছিল পাহাড়চুড়োর আড়াল থেকে কেউ

তাঁকে দেখছে।

দ্রুত বাড়ি ফিরলেন মি. রবিনসন। বিষয়টি নিয়ে মন কেমন খুঁতখুঁত করছে। এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। আর রহস্য-টহস্য তাঁর মোটেই পছন্দ নয়।

মিসেস উইলস টেবিলে খাবার বেড়ে রেখেছে তার মনিবের জন্য। মি. রবিনসন ঝটপট খেয়ে নিলেন। কী রান্না হয়েছে প্রায় খেয়ালই করলেন না। খাওয়া সেরে ত্যাগ করলেন ডাইনিং রুম। চলে এলেন নিজের ডেস্কে। কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলেন। ওল্ডক্যাসল হিলে আজ যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন। লেখা শেষে নিজের নাম সই করলেন, তারিখও উল্লেখ থাকল। তারপর দোয়াতের নিচে কাগজের তাড়াটি রাখলেন। এভাবে রাখার কারণ যে কেউ যেন তাঁর লেখাটি দেখতে পায়। এরপর এক গ্লাস মদ পান করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন মি. রবিনসন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওল্ডক্যাসল হিলের রহস্য ভেদ করবেন।

পরদিন সকাল এগারোটায় পাহাড়ে এসে হাজির মি. রবিনসন। তিনি সাবধানে এবং চুপচাপ পাহাড় বাইতে লাগলেন। মাঝেমধ্যে বিরতি দিলেন, সামনের শূন্য পাহাড়ের পার্শ্বদেশে চোখ বুলালেন। তাঁকে লক্ষ করার মত কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে আবার আগ বাড়লেন।

অবশেষে পাহাড়চুড়োয় এসে পৌঁছালেন মি. রবিনসন। এখানে কোনকিছুর নড়াচড়া নেই। কেউ কথাও বলছে না। পাহাড়চুড়ো একদম খালি। গভীর দম নিলেন মি. রবিনসন। হাঁটা দিলেন দেয়াল অভিমুখে। তিনি এখন নিশ্চিত ওল্ডক্যাসল হিলের রহস্য ওই দেয়ালের পেছনেই রয়েছে। তিনি দেয়াল টপকে ওপাশে যাবেন এবং রহস্যের সমাধান করবেন। মনে সাহস থাকলেও হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে তাঁর। গতকাল কেন ভয় পেয়েছেন এর কারণ আজ তাঁকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। ওই দেয়াল বাইবেন তিনি। এখন যদি ছুটে পালান, এমন সুন্দর পাহাড়ের নিসর্গ আর কোনদিন উপভোগ করতে পারবেন না। তবে তাঁর চলার গতি ধীর হয়ে এল। দাঁড়িয়ে পড়লেন মি. রবিনসন। মাথা খাড়া করে রেখেছেন তবে চোখদুটো এদিক-ওদিক ঘুরছে। দেয়ালের পেছনে কেউ নড়াচড়া করছে। গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেন তিনি। ফিসফিসে আওয়াজ। লুকানো শত্রুকে আজ তিনি খুঁজে বের করবেনই। ভয় পেয়েছেন বুঝতে দেয়া যাবে না। তিনি শিরদাঁড়া সটান করে দাঁড়িয়ে রইলেন জায়গায়; তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে।

হঠাৎ দেয়ালের ওপাশ থেকে টেনিস বলের চেয়ে আকারে বড় এক খণ্ড গোল পাথর ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে এল। ঠকাশ করে বাড়ি খেল মি. রবিনসনের কপালের মাঝখানে। একটিও শব্দ না করে পড়ে গেলেন তিনি। ওল্ডক্যাসল হিলের পাহাড়গুলো আশ্চর্য শান্ত এবং চুপচাপ, ঘাসে মোড়া দেয়ালের সামনের মাটিতে লাশ হয়ে পড়ে আছেন মি. রবিনসন।

পরদিন সকালে মি. রবিনসনের বাড়িতে এসে তাঁকে কোথাও দেখতে না পেয়ে স্থানীয় থানায় ফোন করল মিসেস উইলস।

'এমনটি এর আগে কখনও ঘটেনি,' বলল সে। 'তিনি বাড়িতে নেই। কোথাও নেই। আমার খুব ভয় লাগছে। শংকা জাগছে তাঁর কিছু হলো কিনা ভেবে। দয়া করে এখুনি কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিন।'

কয়েক মিনিট পরে পুলিসের এক লোক এসে কড়া নাড়ল দরজায়।

'আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি,' দরজা খুলে পুলিস কর্মকর্তাকে বলল মিসেস উইলস। 'একটা জিনিস দেখাব আপনাকে। আসুন।'

সে পুলিসম্যানকে মি. রবিনসনের সিটিং রুমে বসিয়ে কাগজের তাড়াটি দিল। এটি তার মনিবের লেখা সেই কাগজের তাড়া।

পুলিস কর্মকর্তা লেখাটি ধীরেসুস্থে মনোযোগের সঙ্গে পড়ল। পকেটে ঢোকাল কাগজের তাড়াটি। 'আমার কাছে এটা থাক।' বলল সে। 'গতকাল ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?'

'জী,' জবাব দিল মিসেস উইলস। 'তবে অল্পক্ষণের জন্য। তিনি একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়েন। আমার সঙ্গে তেমন কথাও বলেননি। আমি বাসনকোসন ধুচ্ছিলাম ওই সময় তিনি বেরিয়ে যান।'

'তাঁকে দেখে কি সুস্থ মনে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তিনি সুস্থই ছিলেন। তবে বড্ড চুপচাপ দেখেছি। সাধারণত অমন চুপচাপ তিনি থাকেন না।'

'উনি কোথায় যাচ্ছেন বলেননি?'

'জিজ্ঞেস করলে জানিয়েছেন পাহাড়ে যাচ্ছেন।'

মাথা ঝাঁকাল পুলিস কর্মকর্তা। 'হুম, বুঝতে পেরেছি। ওল্ডক্যাসল হিল নামের কোন পাহাড়ের কথা তিনি আপনাকে বলেছিলেন?'

'না,' জবাব দিল মিস উইলস। 'বলেননি।'

পুলিস কর্মকর্তা পকেটে রাখা মি. রবিনসনের লেখাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করল।

'বেশ,' বলল সে, 'আমি ওল্ডক্যাসল হিলে তাঁকে খুঁজতে গেলাম। বেচারা মি. রবিনসন...মনে হয় ওখানে তাঁর কোন শত্রু ছিল। বোধকরি শত্রুর কবলেই তিনি পড়েছেন।'

ঘণ্টাখানেক বাদে পুলিস কর্মকর্তা এবং একজন গোয়েন্দা ওল্ডক্যাসল হিলের দেয়ালের ধারে খুঁজে পেল মি. রবিনসনের লাশ।

'কী অবস্থা দেখুন!' মরা মানুষটির মুখের দিকে ইঙ্গিত করে অনুচ্চ স্বরে বলল পুলিস অফিসার। 'কী ভয়ানক! কে এমনভাবে এই মানুষটাকে হত্যা করল?'

'জানি না কে ওঁকে মেরেছে,' জবাব দিল গোয়েন্দা। 'তবে কীভাবে উনি মারা গেছেন তা জানি,' সে লাশের পাশে উবু হয়ে বসল, ইশারায় গোলাকার

একটি পাথরখণ্ড দেখাল। মৃত মানুষটির মাথার পাশে, ঘাসের ওপরে পড়ে রয়েছে টেনিস বলের চেয়ে একটু বড় আকারের পাথরখণ্ডটি। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে ওটা দিয়ে তুলে নিল পাথর।

'এখন,' বলল সে, 'আমরা পাহাড়চুড়ো সার্চ করব। এখানে গতকাল কেউ ছিল। মি. রবিনসনের জন্য অপেক্ষা করছিল কেউ। ঘাসে নিশ্চয়ই কোন চিহ্ন থাকবে। পায়ের ছাপটাপ আছে কিনা সাবধানে খুঁজে দেখুন। আপনি ডান দিকটা দেখুন, আমি বামে যাচ্ছি। দেয়ালের কাছে সতর্ক নজর বুলাবেন বেশি। ওখানেই লুকিয়ে ছিল খুনী। ওখানে পায়ের ছাপ মেলে কিনা দেখুন।'

ওরা দু'জনে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওল্ডক্যাসল হিলের চুড়োয় সন্ধান চালাল। কিন্তু কোন ক্লু মিলল না। মি. রবিনসনের পায়ের ছাপ পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। ডানপুলের রাস্তা ধরে এসে মিলেছে পাহাড়চুড়োয়, সেখানে পড়ে আছে তাঁর লাশ। আর কোন পায়ের ছাপ নেই।

'যথেষ্ট খোঁজাখুঁজি হলো,' বলল গোয়েন্দা। 'এখানে কিছুই নেই...শুধু এই বুড়ো মানুষটার লাশ আর তাঁকে হত্যা করা পাথরখণ্ড। আপনি বরং ডানপুল থানায় চলে যান। লাশ নিয়ে যেতে লোক লাগবে।'

পুলিস অফিসার চলে গেলে গোয়েন্দা পাহাড়চুড়োয় বসে রোদ পোহাতে পোহাতে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে মি. রবিনসনের লাশের দিকে তাকাল সে। তারপর ঘাসে মোড়া দেয়ালে। চমৎকার সূর্যালোকিত বসন্তের দিন। কিন্তু হঠাৎ তার শীত শীত করতে লাগল। খাড়া হলো সে। ফেলে দিল হাতের সিগারেট। একটা চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

'একজন মরা মানুষ,' নিজেকে শুনিয়ে বলছে সে। 'একটি গোল পাথর। আর কিছু নেই। হত্যাকারী এসেছিল এই পাহাড়চুড়োয় তারপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোন পায়ের ছাপ নেই...কোনকিছুর চিহ্ন নেই...এমন কিছু ক্লু নেই যার সাহায্যে আমি খুনীর কাছে পৌঁছাতে পারি।'

ডানপুলের রাস্তার দিকে তাকাল সে। খুশি হয়ে গেল কয়েকজন লোককে পাহাড় বাইতে দেখে। ওল্ডক্যাসল হিলে অনেকক্ষণ ধরে আছে গোয়েন্দা। তার ভয় লাগছে।

কয়েকদিন বাদে গোয়েন্দা গেল অক্সমিনিস্টারের লাইব্রেরিতে। ডানপুল থেকে অল্প দূরেই এ বড় শহর। সে প্রধান লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

'ওল্ডক্যাসল হিল সম্পর্কে আপনি কী জানেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বহু বছর আগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল,' জবাব দিলেন চিফ লাইব্রেরিয়ান।

'গুরুত্বপূর্ণ? ওল্ডক্যাসল হিল গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল বলছেন?'

'শুনে অবাক হবেন না। আমি প্রাচীন মানুষদের কথা বলছি। হাজার বছরেরও আগে তারা ওখানে বাস করত। অক্সমিনিস্টার কিংবা ডানপুলে লোকে ডেরা বাঁধবার ঢের আগে তারা ওখানে থাকত। অক্সমিনিস্টার কিংবা ডানপুলের নামই শোনেনি কেউ তখন। প্রাচীন মানুষরা পাহাড়ের ওপরে একটি দেয়াল

তৈরি করে। তাদের শত্রুরা দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করলে প্রাচীন মানুষরা দেয়ালের আড়াল থেকে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করত।'

'আই সি,' ধীর গলায় বলল গোয়েন্দা। সে লাইব্রেরির টেবিলের ওপর ছোট, গোল একটি পাথর রাখল। 'এটির ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

লাইব্রেরিয়ান পাথরটি তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। 'এ জিনিস আপনি ওল্ডক্যাসল হিলে পেয়েছেন, তাই না?'

'ঠিক তাই। কীভাবে বুঝলেন?'

'একশো বছর আগে এরকম বহু পাথর ওখানে মিলত। সমস্ত পাথর অক্সমিনিস্টার জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আপনি ওখানে গেলে দেখতে পাবেন। আপনি এটা নিয়ে যান। ওরা পাথরটি পেলে খুশিই হবে।'

'হয়তো ওখানে আমার যাওয়া হবে না,' বলল গোয়েন্দা। 'কিন্তু এ পাথরের বিশেষত্ব কী? এরকম পাথর জাদুঘরে রেখে দেয়ার কারণ কী?'

'এ পাথরের মালিক সেই প্রাচীন মানুষ।' জবাব দিলেন লাইব্রেরিয়ান। 'ওদের যোদ্ধারা এই পাথর দিয়ে লড়াই করত। এবং দারুণ জোরে ছুঁড়ত পাথর। এগুলো বুলেটের মতই বিপজ্জনক। প্রাচীন সময়ে ওল্ডক্যাসল হিলে পাথরের আঘাতে অনেক মানুষ মারা গেছে।'

গোয়েন্দা চুপ করে রইল। চেয়ার ছাড়ল সে। পকেটে রেখে দিল পাথরটি।

'আপনার কোন কাজে আসতে পারলাম কি?' জানতে চাইলেন লাইব্রেরিয়ান।

'আপনি আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।' জবাব দিল গোয়েন্দা। 'তবে তাতে আমার সমস্যার সমাধান হয়নি। আমি পুলিসের চাকরি করি। একজন খুনীকে খুঁজছি আমি। তাকে খুঁজে পাওয়া আমার কর্তব্য। আমি এ কথা কাউকে বলতে পারব না যে মি. রবিনসনের হত্যাকারী হাজার বছর আগে মারা গেছে।'

মুখোশ

হত্যাকারী একটা মুখোশ পরে থাকে। কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না এমনকী তার ভিক্টিমরাও নয়। তারা তার মুখটাকে অন্য সাধারণ দশটা চেহারার মতই মনে করে। কী বোকা ওরা! যেমন ধরুন এই মুহূর্তে বাসে তার পাশে জ্যানেট নামে যে মেয়েটি বসে আছে সে ওই বোকাদের কাতারেই পড়ে। কারণ তার কল্পনাতেও নেই এক ভয়ঙ্কর সিরিয়াল কিলার ভাল মানুষটি সেজে তার পাশের আসনে চুপটি করে বসে রয়েছে।

জ্যানেট দেখতে মন্দ নয়। তার চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য আছে যা হত্যাকারীর খুব পছন্দ। হাবলা টাইপের মেয়ে মানুষের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। ওই মেয়েটিকে, মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভাল, দেখে মনে হয় বুদ্ধিমতী কিন্তু সত্যি কি সে ঘটে বুদ্ধি রাখে? তাহলে হয়তো হত্যাকারীর মুখোশটা চিনে ফেলতে পারত।

জ্যানেটকে ফাঁদে ফেলতে তার কোন সমস্যাই হয়নি। সে একটি বারে বসে সবাইকে লক্ষ করছিল। বেশ সাজানো গোছানো বার। দামী, আরামদায়ক আসন, দেয়ালে দামী ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিং। লোকে বলে সুন্দর ছবি। কিন্তু সে ওইসব ছবির অর্থ খুঁজে পায় না। ওগুলো নাকি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিং'। সে আবার কী? সে প্রকৃতির ছবি ভালবাসে, ওসব অ্যাবস্ট্রাক্ট-ফ্যাবস্ট্রাক্ট নয়।

বারে স্বপ্নিল, মৃদু আলো জ্বলছিল। স্বল্প আলোয় লোকের লোভী, লালসা ভরা চেহারাগুলো পরিষ্কার চেনা যায় না। হত্যাকারীকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায় না, বিলাসব্যসনের আড়ালে মানুষের অবক্ষয়, অধঃপতন আর দুর্নীতি সে ঠিক দেখতে পায়। যদিও নিজের সমস্ত গোপনীয়তা সে লুকিয়ে রাখে মুখোশের পেছনে।

ফ্যাশনেবল বেশভূষায় সজ্জিত, জোড়ায় জোড়ায় বসা লোকজনের মাঝখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছিল সে এবং মেয়েটিকে লক্ষ করছিল। বারের একটি টুলে বসেছে মেয়েটি, ড্রিংকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। লোকাট বেগুনি রঙের ড্রেসটি কোন তরুণীকে পরলে যতটা মানাত একে তেমনটি মানায়নি। তবে চমৎকার ফিগার বলে কেউ হয়তো ব্যাপারটা তেমন খেয়াল করবে না। চড়া মেকআপ তার চোখের পাশের কুঞ্চন পুরোপুরি ঢাকা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তার লম্বা, খোলা সোনালি চুল কোমর ছাপিয়েছে। তার পাশে যে দু'একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে ড্রিংকের অর্ডার দিচ্ছিল, সে ওদের সঙ্গে কথা বলছিল। তার কথা শুনে পুরুষ লোকগুলোকে কেমন বিব্রত মনে হলো, কী প্রশ্ন করেছে কে জানে, জবাবে

তারা ডানে-বামে মাথা নাড়ছে। মেয়েটি, যাকে আসলে মহিলা বললেই মানায় ভাল, সঙ্গীহীনভাবেই টুলে বসে রইল।

হত্যাকারী বারের দিকে পা বাড়াল। একটা ড্রিংকের অর্ডার দিল তারপর অলস ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে লাগল। অন্যান্য লোকদেরকে সে এরকমটিই করতে দেখেছে। তাদের আচরণই সে নকল করছে মাত্র। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে হাসল। একজন অচেনা মানুষের জন্য বড্ড বেশি আন্তরিক হাসি। সে মেয়েটির দিকে ঘেঁষে এল।

'আমি কি আপনাকে একটি ড্রিংক কিনে দিতে পারি?' অন্যদের মত মসৃণ গলায় জিজ্ঞেস করল সে মেয়েটিকে। জবাব দেয়ার আগে মেয়েটি তার আপাদমস্তক একবার জরিপ করে নিল। ব্যাপারটি মোটেই পছন্দ হলো না হত্যাকারীর।

'জিন এবং অরেঞ্জ, প্লিজ,' বলল মেয়েটি। সে ড্রিংকের অর্ডার দিচ্ছে, মেয়েটি হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে একটি আয়না বের করে দ্রুত তার ক্যাটকেটে মেকআপ একবার দেখে নিল। সে ওর পাশের টুলে বসল।

'আমি ডেভ,' বলল সে।

'জ্যানেট। ড্রিংকের জন্য ধন্যবাদ,' তার গলার স্বর বিশ্রীরকম ক্যানকেনে। হত্যাকারীর চোখের কোণ কুঁচকে উঠল। একে গলা টিপে নয়, সিদ্ধান্ত নিল সে—জিভ কেটে হত্যা করবে—হ্যাঁ, তাতে আরও বেশি মজা হবে।

তারা কিছুক্ষণ আলতু ফালতু বিষয় নিয়ে কথা বলল। রঙিন বাতি জ্বলছে-নিভছে, বাজছে মিউজিক, নোংরা, দুর্বল লোকগুলো মহিলাদের পাশে মাছির মত ঝাঁক বেঁধে এসেছে। হত্যাকারীর নিজেকে দূষিত মনে হতে থাকে, সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে সেই চিন্তা করে সে ব্যাপারটি সহ্য করে রাখে। দুটো ড্রিংক শেষে অবশেষে মেয়েটি, মানে মহিলাটি বলে, 'আমার বাসায় যাবে?'

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে উত্তোলিত হয় তার ভুরু—এখান থেকে স্বল্প দূরের এক বারে এক লোককে সে এরকমই ভুরু ভঙ্গি করতে দেখেছিল। খুব স্বাভাবিক হয়েছে তার আচরণ ভেবে মনে মনে সে গর্ববোধ করে—তবে প্রশ্নের জবাব দেয় না।

মেয়েটি বলে চলল, 'একরাতের জন্য কুড়ি ডলার। এর বেশি আমি নেব না...' তার কণ্ঠে প্রায় আকুতি। সে মাথা ঝাঁকায় যেন প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবছে: আসলে ভেতরে ভেতরে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে মুখোশটা যেন প্রকাশিত হয়ে না পড়ে তাহলেই তো মেয়েটা বুঝে যাবে তার প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা জমে আছে এ লোকের মনে।

তারপর তারা বাসে উঠে পড়ে। অল-নাইট বাস সার্ভিস। যাচ্ছে মেয়েটি অর্থাৎ জ্যানেটের বাসায়। জ্যানেট তাকে স্রেফ একজন সাধারণ খদ্দের ঠাউরেছে ঘণ্টাখানেক ফুর্তির পরে যারা বিদায় নেয়। মুখোশের আড়ালে হাসল সে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে কার্পেট নাইফের স্পর্শ নিল, ধারাল ছুরিটির শীতল ধাতব বাটে আদর করছে।

জ্যানেট হাত দিয়ে মুছল বাষ্পে আবছা হয়ে যাওয়া বাসের জানালার কাচ।

উঁকি দিল। একটি চাইনিজ খাবারের রেস্তোরাঁ সাঁৎ করে সরে গেল পেছনে। ওটার সবুজ নিয়ন আলো জানালায় বৃষ্টির সঙ্গে গলে যাচ্ছে। হত্যাকারীর দিকে ফিরল জ্যানেট, মুখের চুয়িংগাম মেঝেতে থুঃ করে ফেলল কথা বলার জন্য। তার ইচ্ছে করল মেয়েটার রঙচর্চিত মুখখানা ধরে জানালার কাচে জোরে বাড়ি মারে। এমন জোরে যাতে কাচ ভেঙে ওর চেহারার জিওগ্রাফি পাল্টে দেয়। কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সে শান্ত করে রাখল।

'এবারে আমরা নামব,' বলল মেয়েটা।

সিধে হলো জ্যানেট, মাতালের মত টলতে টলতে এগিয়ে গেল বাসের সামনের দিকে। বাস দুলছে সেই সঙ্গে ওরাও। বাস হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়তে খিকখিক হেসে উঠল জ্যানেট। পিছলা খেয়েছে ভেজা মেঝেতে। পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে খামচে ধরল হত্যাকারীর বাহু। রাগে তার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল, মন চাইল এখুনি ছুরিটার সদ্ব্যবহার করে। কিন্তু বাস ড্রাইভার ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। হত্যাকারীকে উদ্দেশ্য করে সে চোখ টিপল। হত্যাকারী ভাবল ড্রাইভারকে ব্যাখ্যা দেয় সে যা ভাবছে তার জন্য এই মেয়ের সঙ্গী সে হয়নি। কিন্তু এ কথা বলা সম্ভব নয়। সে চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। পা রাখল ভেজা পেভমেন্টে।

মুষলধারের বৃষ্টি হঠাৎ করেই থেমে গেছে। রাতের আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। তবে রাস্তাভর্তি ময়লা আবর্জনার কোন গতি এখনও হয়নি। রাস্তায় শুধু পানি আর পানি। আবর্জনাগুলো সেই পানিতে ভাসছে। তবে বৃষ্টি ধোয়া বাতাসটা বেশ তাজা এবং কনকনে। দূষিত বাতাসকে দূষণমুক্ত করেছে হঠাৎ বৃষ্টি। 'দূষণ' শব্দটি মনে আসতে পকেটের ছুরিটির কথাও স্মরণ হয় তার। সে-ও আজ রাতে সমাজ থেকে একটা দূষিত পদার্থ দূর করবে ভাবনাটি তাকে তৃপ্তি দেয়।

বাস থেকে নামার পরে আর কথা বলেনি জ্যানেট। ক্রসরোডে চলে এল সে তার নতুন খদ্দেরকে নিয়ে। একটা গাড়ি যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। ট্রাফিক সিগনালের সবুজ বাতি হলুদ, সেখান থেকে লাল হলো, আমার প্রিয় রং, রাস্তা পার হতে হতে ভাবল হত্যাকারী।

'তুমি কিছুর জন্য অপেক্ষা করছ, দেখতে পাচ্ছি,' হঠাৎ বলে উঠল জ্যানেট। 'কী?' জিজ্ঞেস করল সে, তারপর বুঝতে পারল কী বলেছে মেয়েটা। 'তুমি হাসছ,' বলল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি হাসছিলাম।' মাগী! এক সেকেণ্ডের জন্য মেয়েটা তার মুখোশের ভেতরটা দেখে নিয়েছে। তাকে আরও সতর্ক হতে হবে–অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস খুবই বিপজ্জনক।

একটা নির্জন গলিতে ঢুকল জ্যানেট তাকে নিয়ে। এরকম জায়গাতেই তো তোমরা থাক, ঘৃণা নিয়ে ভাবল সে। রাস্তার ভাঙা স্ল্যাব বৃষ্টিতে পিচ্ছিল এবং চকচকে। হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে হাঁটছে জ্যানেট। পুরানো আমলের স্ট্রীটলাইটের কুৎসিত সবুজাভ আলো সার বাঁধা বাড়িঘরগুলোর ছাদে, গাঢ় বাদামি দেখাচ্ছে।

'এই তো এসে পড়েছি।' বলল জ্যানেট।

‘গুড। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো–তুমি এসব কেন কর?’

‘কী করি?’

‘এভাবে পুরুষদেরকে বাড়ি নিয়ে আসো?’

‘আমাকে এর আগে এ প্রশ্নটি কেউ কখনও করেনি। বেশিরভাগ পুরুষই তাদের জীবন আর সমস্যার কথা বলে। আমি কী করছি না করছি তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই।’

মুখোশধারী এবারে মুখ ভরে হাসল। ‘আমি বেশিরভাগ পুরুষের মত নই।’

‘হুমম। আসলে ব্যাপার ওটাই–এ কাজ না করলে উপোস থাকতে হবে যে। আর আমি খিদে একদম সহ্য করতে পারি না।’ একটু থেমে জানতে চাইল জ্যানেট, ‘এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?’

‘না, না, এমনি–স্রেফ কৌতূহল।’ সে মেয়েদেরকে এর আগেও এ প্রশ্নটি করেছে জানতে কে কী যুক্তি তুলে ধরে। সবাই সেই একই মিথ্যা বুলি কপচিয়েছে–‘আমার টাকা দরকার।’ যত্তোসব ফালতু।

শ্রীহীন, সাদামাঠা, একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। জ্যানেট ব্যাগের মধ্যে চাবি খুঁজছে। বুড়ি বেশ্যাদের মেকআপের মত এ বাড়ির জীর্ণ জানালায় ফ্যাকাসে নেটের কার্টেন লাগানো। জ্যানেট দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছে, রাস্তার বাতির একটুকরো কর্কশ আলো ওর গালের ব্রণগুলোকে প্রকাশ করে দিল।

হলঘরের নিকষ আঁধার গিলে খেল জ্যানেটকে। সে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। কী করবে বুঝতে পারছে না। এমনসময় একটা সাদা হাত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে তার আস্তিন খামচে ধরল।

‘এসো–আমাদের হাতে সারাটা রাত নেই, জানোই তো।’ বলল জ্যানেটের কণ্ঠ খুব কাছ থেকে, যদিও সে ওকে দেখতে পাচ্ছে না। সে একবার রাস্তায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল তারপর অন্ধকারে সাদা হাতটিকে অনুসরণ করল। কোট পকেটে হাত ঢুকিয়ে অভ্যাসবশত স্পর্শ করল ছুরিটি। ঠিকই তো আমাদের হাতে সারাটা রাত নেই, ভাবল সে। ওদের পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সে জেগে উঠতে তীব্র, উজ্জ্বল একটা আলো তার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বাড়িয়ে দিল মাথার যন্ত্রণা। আধ বোজা চোখে সে দেখছে মাথার ওপর একটা নগ্ন বালব ঝুলছে, যেন তাকে অভিযুক্ত করছে। উঠে বসতে গেল সে। পারল না। ঘটনা কী? মাথায় দপদপে ব্যথা নিয়ে সে চারপাশে তাকাল। দেখল সে সম্পূর্ণ নগ্ন এবং লোহার একটি খাটে মোটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আরি, এসবের মানে...তার আবছা মনে পড়ে যায় অন্ধকারে কেউ প্রচণ্ড জোরে তার মাথায় আঘাত করেছিল। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তার পেছনে একটি দরজা খুলে গেল।

‘যাক, তোমার জ্ঞান তাহলে ফিরল,’ বলল জ্যানেট। তার সারা শরীর স্থির হয়ে গেল, মহিলার গলার স্বর শোনামাত্র গা-হাত-পা ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সে

বৃথাই ধস্তাধস্তি করল নিজেকে মুক্ত করার জন্য। চামড়ার ফিতেগুলোর বাঁধন আরও চেপে বসল গায়ে।

'খানকি মাগী!' হিসিয়ে উঠল সে। 'আমাকে ছেড়ে দে!'

'দুঃখিত, তা সম্ভব নয়,' বলল জ্যানেট। তার পাশে এসে বসল।

'তোমার প্রশ্ন শুনে আমার বেশ মজা লেগেছিল জানো,' আলাপচারিতার ভঙ্গিতে বলল সে, 'তুমি জানতে চেয়েছিলে পুরুষদেরকে আমি কেন আমার বাড়িতে নিয়ে আসি,' মহিলা কথা বলছে, হাতে কী যেন একটা ধরে রেখেছে। তা দিয়ে ইলেকট্রিক গুঞ্জন আসছে। শব্দটা তাকে এবারে সত্যি ভয় পাইয়ে দিল।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম এ কাজ না করলে আমাকে উপোস থাকতে হবে–একদমই মিথ্যা বলিনি কিন্তু।' হাত তুলল জ্যানেট। হাতে ইলেকট্রিক ছুরি। সে চোখের পলকে হত্যাকারীর একটা আঙুল কেটে নিয়ে মুখে পুরে কচকচ করে চিবাতে লাগল।

ঘরের মায়া

ছুটি কাটাতে আমি সবসময় পোরচেস্টার যাই। ছোট মফস্বল শহর, পুরানো এবং চিত্তাকর্ষক দালান কোঠায় ঠাসা। খুব কম লোকেই ওখানে ঘুরতে যায়, কাজেই ট্যুরিস্টের ভিড় থাকে না বললেই চলে। শহরটির ঝিম ধরা আবহ আমার বেশ ভাল লাগে। আমি বড় শহরে কাজ করি, তাই পোরচেস্টারের মত শহরে ছুটি কাটালে মনে হয় বেশ একটা পরিবর্তনের স্বাদ পেলাম। তাছাড়া আমি জায়গাটির ইতিহাস নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করি। এ শহরের অতীত জীবন আমি জানতে চাই, আবিষ্কার করতে চাই বাসিন্দাদের গল্প আর এর ভবনগুলোর কেচ্ছাকাহিনী। ছুটির সময় এসব বিষয় নিয়ে নোট নিতে নিতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দেখা গেল ওখানকার লোকজনের চেয়েও শহরটি সম্পর্কে আমি বেশি জানি। পোরচেস্টারের অনেক ইতিহাসই তাদের জানা নেই যা আমার নখদর্পণে।

আমার তেমন টাকাপয়সা নেই বলে হোটেলে থাকার বিলাসিতা করতে পারি না। জ্যাক থম্পসন যখন জানল ছুটি কাটাতে পোরচেস্টার যাচ্ছি, তার বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানাল সে। আমরা একসঙ্গে আর্মিতে ছিলাম যুদ্ধের সময় এবং বেশ ভাল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল দু'জনের মাঝে। কাজেই ফোর স্ট্রীস্টে ওর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এখানে একটি ছোট, সুন্দর বাড়িতে স্ত্রী অ্যানিকে নিয়ে থাকে জ্যাক। ওরা জানত না বছরে অন্তত একবার পোরচেস্টারে আমার ঢুঁ মারা চাই। আমি অবশ্য কোথাও মাগনা থাকার পক্ষপাতী নই। নিতে না চাইলেও জোর করে কিছু টাকা গুঁজে দিলাম বন্ধুর হাতে। ওরা সবসময় বলে আমি কবে ওদের শহরে বেড়াতে আসব সেজন্য মুখিয়ে থাকে। আমার ছুটিটা নাকি বন্ধু দম্পতি বেশ উপভোগ করে। ওদের সঙ্গে আমার ছুটি ভালই কাটছিল কিন্তু এতে বাগড়া দিলেন মিসেস উড।

সেই বছর আমি যথারীতি ইস্টারের ছুটিতে গিয়েছি পোরচেস্টারে। বসন্তের চমৎকার এক বিকেলে শহরে হাজির হলাম আমি। সাদা সাদা ছোট মেঘ, নীল আকাশ এবং চনমনে রোদ বেশ লাগছিল। আমরা তিনজনে মিলে হাঁটতে বেরুলাম। আমি শহরের গির্জার কয়েকটি ছবি তুললাম।

'পোরচেস্টারের শতাধিক ছবি বোধহয় আপনার তোলা হয়ে গেছে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

'তা তুলেছি,' সায় দিলাম আমি। 'ইতিহাসের ছাত্রদের সবসময় চোখকান

খোলা রাখতে হয়। আমি আমার বাসায় ফিরে পোরচেস্টারের ছবিগুলো দেখি। এসব ছবি আমাকে অতীতের গল্প বলে।'

আমরা *দ্য রোজ অ্যাণ্ড ক্রাউন*-এ মদ পান করলাম। এটি একটি ছোট সুন্দর পাবলিক হাউস। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফোর স্ট্রীটে জ্যাকদের বাড়ি ফিরলাম। সাপার শেষে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে মেতে উঠলাম আড্ডায়।

'খবর-টবর কী বলো শুনি,' বললাম আমি। 'গত সামারের পর থেকে তো পোরচেস্টারে আসতে পারিনি। তাই সব খবর জানতে চাইছি।'

হাসল জ্যাক। 'তোমার কি মনে হয় না পোরচেস্টারের একটু পরিবর্তন হয়েছে, বিল? অবশ্য এ শহরটি তুমি আমাদের চেয়ে ভাল চেনো। এখানে জীবন বড্ড মন্থর। খবর বলতে শহরে নতুন একজন ডাক্তার এসেছেন। বুড়ো ডাক্তার মিচেন অক্টোবরে গাঁয়ে চলে গেছেন তাঁর বোনের সঙ্গে থাকার জন্য। তরুণ ডাক্তার ওয়ারেন এসেছেন তাঁর জায়গায়। ভদ্রলোক ভারী ভাল।'

'পোরচেস্টারের সমস্ত খবরই আমি জানতে চাই,' বললাম আমি। 'আর নতুন কী আছে?'

'মিসেস উড চলে গেছেন,' বলল অ্যানি।

'মিসেস উড?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কে তিনি? কোথায় থাকেন? ওনাকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'ওনাকে আপনার চেনার কথাও নয়,' বলল অ্যানি। 'এখানে যতদিন ছিলেন খুব কমই ঘরের বার হয়েছেন।'

'উনি থাকতেন কোথায় বললে?'

'আমি বলিনি,' হাসল অ্যানি। 'মিসেস উড অশীতিপর এক বৃদ্ধা। হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন না বলে কোথাও যেতেনও না। ক্রিসমাসের আগে আগে তিনি চলে গেছেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া থাকবেন। উনি যেতে চাননি তবে তাঁর ছেলে জোর করে নিয়ে গেছে। রাস্তার ওপারের বাড়িতে থাকতেন মিসেস উড। যে বাড়ির জানালার সামনে মস্ত ঝোপ আছে।'

'চিনেছি,' বললাম আমি। 'আমি প্রায়ই ভাবতাম দোতলার জানালা দিয়ে কেউ বোধহয় তাকিয়ে আছে। তবে জানালার সামনে ঘন ঝোপের কারণে বোঝা যেত না সত্যি কেউ তাকিয়ে আছে কিনা।'

'মিসেস উড বেশিরভাগ সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন।' রাগরাগ গলায় বলল জ্যাক। সে নরম স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ তাকে রাগতে দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত।

'ওভাবে বোলো না, জ্যাক,' বলল অ্যানি। 'উনি একা একটা মানুষ ছিলেন। তাই হয়তো লোকজন দেখতে ভালবাসতেন। জানালায় বসে মানুষ দেখে তাঁর সময় দিব্যি কেটে যেত।'

'তাঁকে তো কেউ একা থাকতে বলেনি,' গজগজ করছে জ্যাক। 'ওটা তাঁর দোষ। মনে নেই উনি তোমার সঙ্গে কী বিশ্রী ব্যবহারটাই না করেছিলেন!'

'আমরা কিন্তু একমত হয়েছিলাম এ বিষয়টি নিয়ে আর কখনও কথা বলব না,' বলল অ্যানি। 'আর বুড়ো একটা মানুষ জানালার ধারে বসে থাকতেন বলে

তুমি তাঁকে গালমন্দ করতে পার না। রাস্তার মানুষজন দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। বেচারীর জন্য আমার খারাপই লাগে।'

'আমার খারাপ লাগে তাঁর ছেলের জন্য,' বলল জ্যাক। 'আমি হলে ওই বুড়িকে আমার বাসায় থাকতেই দিতাম না। বুড়ি ঝগড়া করে তাঁর ছেলের জীবনটা বিষিয়ে দিচ্ছেন কিনা কে জানে! তবে আশা করছি উনি ওখানে একাকী বোধ করছেন না এবং সারাজীবন ওখানেই থাকবেন। আমি চাই না মহিলা ফোর স্ট্রীটে ফিরে আসুক–'

'জ্যাক! তুমি–'

অ্যানি কী বলতে যাচ্ছিল জানি না তবে দেখলাম দু'জনেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। বাধ্য হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম আমি। মিসেস উডকে নিয়ে কথা বলা বাদ দিয়ে নতুন ডাক্তারের প্রসঙ্গ টেনে আনলাম। ওরা উৎসাহ নিয়ে ডাক্তার সম্পর্কে কথা বলতে লাগল। মিটে গেল বিবাদ। ওরা এমনিতে যথেষ্ট ভদ্র কিন্তু এখন দেখছি জনৈক বৃদ্ধা ওদের সুখের সংসারে ঝামেলার সৃষ্টি করছে।

সকাল সকাল বিছানায় গেলাম। কিন্তু ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করার পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। বই পড়ার চেষ্টা করলাম। ভাল লাগল না। জ্যাক এবং অ্যানির কথা ভাবছিলাম। মিসেস উডকে নিয়ে কেন ওদের মধ্যে অশান্তি? বৃদ্ধা মহিলা থাকেন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় অথচ ওরা সেই মানুষটার ওপর রেগে আছে। অ্যানি যদিও রাগ দেখায়নি তবে ওর ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছিল বৃদ্ধাকে সে-ও পছন্দ করে না। মহিলার জন্য তার খারাপ লাগছে। অন্তত তাই তো বলল অ্যানি। কিন্তু আমার ধারণা সে বৃদ্ধার ওপর জ্যাকের মতই খেপে আছে। শুধু রাগটা প্রকাশ করেনি এই যা।

বিছানা থেকে নেমে জানালার ধারে গেলাম আমি। রাস্তার ওপারে মিসেস উডের বাড়ির দিকে তাকালাম। ঝলমলে আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ, বাড়ির সামনের অংশটি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মৃদু বাতাসে অল্প অল্প নড়ছে প্রকাণ্ড ঝোপটার পাতা।

মিসেস উডের জানালার পর্দা ফেলা। ওখানে হয়তো লোকজন আছে। তিনি কাউকে বাড়িটি ভাড়া দিয়ে গেছেন অথবা কেয়ারটেকার রেখেছেন। নাকি মিসেস উড নিজেই এখনও ও বাড়িতে আছেন? ভাবলাম আমি।

তারপর দেখলাম দোতলার জানালার একটি পর্দা নড়ে উঠল। কেউ একজন বসে আছে ওখানে! মিসেস উড কি? আমাকে লক্ষ করছেন?

ধড়াশ করে উঠল বুক। বৃদ্ধা তো অস্ট্রেলিয়ায়। ওখানে আসবেন কী করে? কিন্তু এমন ভয় লাগল আমার যে জানালা থেকে চট করে সরে এসে এক লাফে বিছানায়। অন্ধকারে শুয়ে রইলাম। ধুকপুক করছে বুক। মিসেস উড আমাকে লক্ষ করছিলেন। আমি জানি ওটা তিনি। এক বুড়ির মুখ দেখতে পেয়েছি আমি জানালায়।

তবে আস্তে আস্তে সাহস ফিরে পেলাম আমি। 'ওরে, গর্দভ!' নিজেকে চোখ পাকালাম আমি। 'ওই পর্দাটা মোটেই নড়েনি। বাতাস বইবার সময় ঝোপের

পাতা নড়েছে। আর সেটাই তুমি দেখেছ। বাতাস জানালার সামনে গাছের পাতা নাড়িয়েছে আর তুমি ভেবেছ পর্দা নড়ছে। তাছাড়া, মিসেস উড ওখানে থাকলেই বা কী? সে তো তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে আছে তার ঘরের ভেতরে। একাকী, বুড়ো মানুষ। আর তুমি বলবান, স্বাস্থ্যবান যুবক। কীসে ভয় পাচ্ছ, অ্যাঁ? আর ওখানে মিসেস উড নেই। সে আছে অস্ট্রেলিয়ায়। তার ছেলের সঙ্গে।'

এসব ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেয়ার পরে আমার অস্থিরতা একটু কমল। তবে ঘুম এল আরও অনেক পরে। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম একটি অদ্ভুত, অন্ধকার কালো বাড়ি থেকে আমি পালাবার চেষ্টা করছি–আমাকে লক্ষ করছে এক বৃদ্ধা।

ঘুম ভেঙে নিজেকে বড্ড ক্লান্ত আর অসুখী লাগল। এবারের ছুটিটা বেশ বাজেভাবে শুরু হলো। আমি মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় পরে নিলাম। বেডরুমের জানালা খুলে মিসেস উডের বাড়ির একখানা ছবি তুললাম। ভোরের সূর্য আলো ছড়াচ্ছে বাড়ির সামনে। ঝোপটা একটা ছায়া ফেলেছে। বাড়িটিকে ভারী সুন্দর লাগছে। যত্ন করে ছবিটি তুললাম। আমি একটি সুন্দর ছবি চাই।

ক্যামেরা রেখে নেমে এলাম নিচে। কিচেনে একা জ্যাক।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমাকে ক্লান্ত লাগছে।'

'ভাল ঘুম হয়নি।'

'অ্যানিরও তাই,' বলল জ্যাক। 'তাই ওকে বিছানায় রেখে এসেছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছে বেচারী। মনে হয় ওই বুড়িকে স্বপ্নে দেখেছে।'

খাওয়ার সময় আর তেমন কথা হলো না। নাস্তা সেরে ওকে প্রশ্ন করলাম আমি।

'জ্যাক,' বললাম আমি, 'মিসেস উডের কথা বলো তো শুনি। মহিলাকে নিয়ে কথা বলার সময় গতরাতে তুমি আর অ্যানি রেগে গিয়েছিলে কেন?'

'বোকার মত হয়ে গেছে কাজটা,' জবাব দিল জ্যাক। 'আমার রেগে যাওয়া উচিত হয়নি। মহিলা তো আর এখানে নেই। বহুদূরে আছে। অস্ট্রেলিয়ায়।'

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না,' বললাম আমি। 'মহিলা বৃদ্ধা, থাকেন অনেক দূরে। তারপরও তাঁকে নিয়ে তোমাদের মধ্যে কেন ঝগড়া হয়?'

'বলছি। অ্যানি মহিলাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সে প্রায়ই বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা করতে যেত। তাঁর জন্য বাজার-সদাই করে দিত। প্রায়ই রান্না করে দিত। গল্প করত। বৃদ্ধা অবশ্য তেমন কথা বলতেন না। তিনি শুধু শুনতেন।'

'তুমি অ্যানির সঙ্গে কখনও যাওনি ওই বাড়িতে?'

'না। মিসেস উডকে আমি পছন্দ করতাম না। অ্যানি যে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটাত এটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। আমি যে আশংকা করেছিলাম সেটাই ফলেছিল শেষ পর্যন্ত। বৃদ্ধা অ্যানির সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেন।'

বিরতি দিল জ্যাক। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল বাইরে। আমি যে একটা মানুষ বসে আছি তা যেন ভুলেই গেছে।

‘জ্যাক,’ বললাম আমি, ‘তারপর কী হলো বলো?’

আমার দিকে ফিরল জ্যাক। ‘একদিন,’ বলল সে, ‘অ্যানি মিসেস উডের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। ওকে খুব ক্লান্ত আর অসুস্থ লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে। সে বলতেই চায় না। জোর করে মুখ খোলালাম। জানলাম মিসেস উড নাকি খুব বিশ্রী ব্যবহার করেছেন অ্যানির সঙ্গে। অ্যানি ভয় পেয়ে যায়...অ্যানি আর কোনদিন ওখানে যায়নি...মিসেস উড ওকে যা বলেছিলেন তা ও কখনও ভোলেনি...’

জ্যাকের ব্যাখ্যা ঠিক পরিষ্কার হলো না আমার কাছে। তবে ওর কথা শুনে যা বুঝতে পারলাম তার সারমর্ম এই–বৃদ্ধা জানতেন জ্যাক তাঁকে পছন্দ করে না। তিনি অ্যানিকে বলেছিলেন জ্যাককে তিনি ঘৃণা করেন। অ্যানি তার স্বামীর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিল। বলেছিল মিসেস উড খামোকা ভুল বুঝছেন তার স্বামীকে। জ্যাক খুব ভাল, সদয় প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু বৃদ্ধা জ্যাক প্রসঙ্গে অ্যানির কোন কথা শুনতেই নারাজ। তিনি চিৎকার-চেঁচামেচি করছিলেন। অ্যানিকে গালমন্দ করে বলেন সে তার স্বামীর মতই খারাপ। হুমকি দেন ওদের দু'জনকেই তিনি বাড়ি থেকে বিদায় করবেন।

জ্যাকের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর মন্তব্য করলাম, ‘এই মহিলা দেখছি খুবই বাজে। তবে একে নিয়ে তোমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হওয়ার কারণ আমার বোধগম্য নয়। মহিলা চলে গেছেন। তোমাদের আর কোন ক্ষতি করতে পারবেন না। এখানে থাকলেও পারতেন না। বোকা, রাগী এক বুড়ি।’

জ্যাক আমার দিকে তাকাল। ‘তুমি কেন কাল রাতে ঠিকঠাক ঘুমাতে পারনি?’

ছুটি উপভোগ করতে পারছিলাম না আমি। আমি হাঁটতে বেরোই। অনেকখানি রাস্তা হাঁটাহাঁটি করি। ছবি তুলি। পোরচেস্টারের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করি। আগে যা করতাম তা-ই করছিলাম কিন্তু কোন কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছিলাম না।

জ্যাক এবং অ্যানি বরাবরই আমার প্রতি সদয়। আমরা একে অন্যকে পছন্দ করি। তবে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা কোন্দল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওরা আর রাতের বেলা ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে গল্প করে না। সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে। এবং প্রতিরাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমার মনে হয় মিসেস উডের চেহারা যেন দেখেছি জানালায়। আমার আর এখানে ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফিরে যেতে চাইছিলাম। ছুটি শেষ হয়ে এলে খুশিই হলাম। পোরচেস্টার থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। জ্যাক এবং অ্যানির কোন সাহায্যে আসছিলাম না আমি। সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার কথায় ওরা কর্ণপাত করেনি।

বাড়ি ফেরার কিছুদিন পরে পোস্টম্যান এসে কতগুলো ফটোগ্রাফ দিয়ে গেল। এ ছবিগুলো আমি তুলেছিলাম পোরচেস্টারে বসে। ফিল্মের রিলটা ডেভেলপ করার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমার শহরের এক স্টুডিওতে। এমনিতে

আমার ছবি প্রিন্ট হওয়ার পরে কেমন হলো দেখার জন্য তর সয় না। কিন্তু আ ছবিগুলো দেখতে ইচ্ছে করছিল না। ভয় ভয় লাগছিল। আমি প্যাকেটের দি একঠায় তাকিয়ে রইলাম। খোলার সাহস হচ্ছে না। কী জানি কী দেখব ভে ধুকপুক করছে বুক।

অবশেষে সাহস করে প্যাকেটটা খুলেই ফেললাম। এক এক করে বে করলাম ছবিগুলো। তারপর সেই ফটোগ্রাফটি হাতে এল যেটি দেখতে ভ লাগছিল। মিসেস উডের বাড়ির ছবি। আমার মাথাটা ঘুরে উঠল। সবকি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে—বাগান, ঝোপ, সদর দরজা। এবং দোতলার জানাল ওখানে কাচের আড়াল দিয়ে আমার দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক বুড়ি

এই ভয়ঙ্কর ছবিটি হাতে ধরে আছি এমনসময় আমার ফ্ল্যাটের দরজা ধা খেয়ে খুলে গেল। ভেতরে সবেগে ঢুকল জ্যাক। তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত লাগছে আলুথালু চুল, কোঁচকানো প্যান্ট-শার্ট, কেমন পাগল পাগল চেহারা। ছবি লুকোবার চেষ্টা করলাম তার আগেই দেখে ফেলল জ্যাক। এক ঝটকায় কে নিল।

'এই সেই মহিলা,' বলল ও। 'জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে মিসেস উড।'

'কিন্তু, জ্যাক, তা কী করে সম্ভব...উনি না অনেক দূরে...উনি...'

আমার কথা শেষ করতে দিল না জ্যাক। ও যখন কথা বলল ওর চেহারায় ভীতি ফুটে উঠল তার কথা ভুলব না কোনদিন।

'বিল,' বলল জ্যাক, 'তুমি যেদিন পোরচেস্টারে ছুটি কাটাতে এসেছিলে ও দিনই মিসেস উড অস্ট্রেলিয়ায় মারা যান। তুমি চলে যাওয়ার একদিন পরে আমরা খবরটি জানতে পারি।'

'তাহলে...কী...ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কী?' আমি ছবির জানালার দিকে ইঙ্গি করলাম।

'আমি জানি না,' বলল জ্যাক। 'ব্যাখ্যা দিতে পারব না। শুধু এটুকু বল পারি—উনি হয়তো ঘরের মায়া কাটাতে পারেননি তাই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।'

একটা নতুন ভয় গ্রাস করে আমাকে। 'অ্যানি?' আমি চেঁচিয়ে উঠি। 'জ্যা অ্যানি কেমন আছে? ও কি জানে মিসেস উড বাড়ি ফিরে এসেছিলেন?'

জ্যাককে একদম বিধ্বস্ত এবং অসুস্থ লাগল। মনে হলো পড়ে যাবে। আ ওর হাত ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। অবশেষে কথা বলল ও। গলার স্ব এমন দুর্বল, শুনতে বেগ পেতে হলো।

'গতরাতে,' বলল জ্যাক, 'আমাদের দরজায় কেউ কড়া নাড়ে। অ্যা গিয়েছিল দরজা খুলতে। আমি কিচেনে ছিলাম। হঠাৎ শুনি এক ভয়ার্ত চিৎকার ওই আর্তনাদ আমি জীবনে ভুলব না। চিৎকার দিয়ে উঠেছিল অ্যানি। বলছি "মিসেস উড? আপনি?" তারপর আমি দড়াম করে কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শ পাই। ছুটে যাই দরজায়। দেখি শূন্য দরজার সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আমা অ্যানি। বিস্ফারিত চোখ। মৃত। ডাক্তার বলেছেন ভয়ের চোটে হার্টফেল ক মরেছে ও।'

গাড়ি

'দাম কত?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাবটি তাকে একই সঙ্গে বিস্মিত এবং আনন্দিত করল। সস্তা নয়। তবে প্রকাণ্ড আকৃতির, শক্তিশালী একটি গাড়ি আপনি নিশ্চয়ই জলের দরে পাবার আশা করেন না। অবশ্যি সে যা ভেবেছিল দাম তার চেয়ে অনেক কম।

'গাড়িটির বয়স মাত্র এক বছর, বলছেন আপনি?'

'জী। মাত্র এক বছর। এ গাড়ির মালিককে আমরা চিনি। এটি তাঁর কাছে আমরা বিক্রি করেছিলাম। এখন তিনি গাড়িটি বিক্রি করে দিতে চাইছেন। তিনি এ গাড়ি আর চালাবেন না বলেছেন। নতুন নাকি আরেকটা কিনবেন। আমরা গাড়িটির যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছি। ভাল গাড়ি। এত কম দামে এমন চমৎকার গাড়ি আর কোথাও পাবেন না।'

চিন্তা করছে রজার। গ্যারাজের লোকটা ঠিকই বলেছে। গাড়িটি বেশ ভাল। আর দামও খুব বেশি নয়, ওর ক্রয়সীমার মধ্যেই।

'আমি এটা কিনব,' বলল ও। 'কাল অফিস ছুটির পরে, সন্ধ্যায় এসে গাড়িটি নিয়ে যাব।'

পরদিন সন্ধ্যায় বিশাল নতুন গাড়িটির মালিক হয়ে গেল রজার উইংগেট। হুইলের পেছনে বসল সে। ট্রাফিকের মাঝ দিয়ে সাবধানে চালাচ্ছে। শীঘ্রি ব্যস্ত রাস্তা পেছনে ফেলল ও। অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় বাড়িয়ে দিল গতি। শক্তিশালী ইঞ্জিনের এ গাড়িটি চালিয়ে বেশ মজা আছে। বড় বড় হেডল্যাম্পের আলো সামনের অন্ধকার রাস্তা আলোকিত করে দিচ্ছে। নতুন গাড়ি নিয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট রজার। নাহ্, অল্প দামে সত্যি একটা কাজের জিনিস পেয়েছে সে।

ক্রস রোড অর্থাৎ দুই রাস্তার সংযোগস্থলে তাকে থামতে হলো। ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলছে। রজার একটি সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির রেডিওতে মিউজিক শুনতে লাগল।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তার কলজে। খুব শান্ত গলায় কে যেন কথা বলেছে। নারী কণ্ঠ।

'এখন ডান দিকে যান,' বলল সে।

রজারের লাফিয়ে ওঠার কারণ গলার স্বরটি রেডিও থেকে আসেনি। কারণ রেডিওতে এখনও মিউজিক বাজছে। তার পাশের প্যাসেঞ্জার সীট থেকে কেউ তাকে রাস্তার ডানে মোড় নিতে বলেছে। এবং দ্বিতীয়বার একই কথা বলা হলো। কোন তরুণীর পরিষ্কার, মিষ্টি গলা। কিন্তু প্যাসেঞ্জার সীটে কেউ নেই!

তবে কি কানে ভুল শুনল রজার উইংগেট? সে চারপাশে তাকাল। নাহ্, সত্যি কেউ নেই। অথচ দু'বার একই গলা শুনেছে সে। শরীরটা শিরশির করে উঠল রজারের। এমনসময় তার পিলে চমকে দিয়ে পেছন থেকে হর্ন বাজতে শুরু করল। পেছনের গাড়ির ড্রাইভাররা অধৈর্য হয়ে হর্ন বাজাচ্ছে। ট্রাফিকের লাল আলো কখন সবুজ হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি রজার। পেছনের গাড়ির ড্রাইভার উৎকট হর্ন বাজিয়ে তাকে আগে বাড়তে বলছে। ও গাড়ি ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে চালাচ্ছে। পেছনের গাড়ির ড্রাইভাররা পাশ কাটানোর সময় প্রায় প্রত্যেকে ওকে উদ্দেশ্য করে খিস্তি করল। কিন্তু সেদিকে নজর দিল না রজার। তার মাথায় তখনও সেই শান্ত স্বরটি ঘুরপাক খাচ্ছে। *এখন ডান দিকে যান।* ডান দিকের রাস্তাটি নিয়ে ভাবছে ও। ওই রাস্তায় কখনও যায়নি রজার। কদাচিৎ দু'এক ঝলক ওদিকে তাকিয়েছে মাত্র। মনে হয়েছে নির্জন রাস্তা। তার বাসা ক্রস রোড ধরে সামনে। কাজেই কখনও ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি রজারের।

নতুন গাড়ি দেখে রজারের স্ত্রী খুবই খুশি। ওদের পুরানো গাড়িটির চেয়ে অনেক আরামদায়ক। এ গাড়িতে চড়ে ওরা আগামী উইকএণ্ডে কোথাও ঘুরতে যাবে। 'মাকেও সঙ্গে নেব আমরা,' বলল সে। 'সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাব। পিকনিক করব ওখানে। খুব মজা হবে, না, রজার?'

জবাব দিল না রজার। সে তার বসার ঘরের জানালা দিয়ে নতুন গাড়িটির দিকে তাকিয়ে আছে।

'কথা বলছ না কেন?' ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করল। 'মজা হবে না, বলো?'

'অ্যাঁ? ওহ্...হ্যাঁ...অবশ্যই মজা হবে।'

'মাঝে মাঝে তোমাকে আমি সত্যি বুঝতে পারি না, রজার। নতুন গাড়ি কিনেছ কোথায় সেলিব্রেট করব ভাবছি। আর তুমি মুখটা গোমড়া করে বসে আছ। কী হয়েছে? আমার কথা কি তুমি শুনছ না?'

'সরি, ডিয়ার,' বলল রজার। 'আসলে আজ অফিসে খুব খাটনি গেছে। অফিশিয়াল একটা ঝামেলা নিয়ে ভাবছিলাম। কাল একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। তাই ভাবছি আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়ব।'

গাড়ি নিয়ে স্বামীর কোন উৎসাহ নেই দেখে স্ত্রী বেচারীর উচ্ছ্বাসের বেলুনটা ফুটো হয়ে গেল। সে-ও মুখখানা হাঁড়ি করে ফেলল। কিন্তু তা লক্ষ করল না রজার। সে ভাবছে তার গাড়িতে শোনা কণ্ঠের কথা।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে পুরানো বন্ধু বিল হারপারের সঙ্গে দেখা করল রজার উইংগেট। বিল খবরের কাগজের সাংবাদিক। মাথা ঠাণ্ডা মানুষ। সব কিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে এবং সহজে কোনকিছু তাকে বিস্মিত করতে পারে না। সে রজারের গল্প চুপচাপ শুনে গেল। তারপর জিজ্ঞেস করল: 'তুমি ক্রস রোডের ডান দিকের রাস্তায় কখনও যাওনি?'

'না।'

‘ওটা খুব নির্জন, সরু একটা রাস্তা। দুই পাশে গাছপালা আছে, সুন্দর সুন্দর কিছু বাড়িঘর রয়েছে। ওটার নাম মনমাউথ রোড।’

‘তুমি ওখানে কখনও গিয়েছ, বিল?’

‘একবার গিয়েছিলাম,’ জবাব দিল বিল। ‘বছরখানেক আগে।’

‘আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ? বিশ্বাস করছ যে আমি একটি গলা শুনতে পেয়েছিলাম?’

‘তুমি একটি মেয়ের গলা শুনেছ এবং সেটা বিশ্বাসও করছ। এটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা পরে।’

বিল কাবার্ডের ধারে গিয়ে একটি ছোট টেপ রেকর্ডার বের করল। রজারকে দিল।

‘এটা রাখো,’ বলল বিল। ‘আজ রাতে বাড়ি ফেরার সময় যখন ক্রস রোডের ট্রাফিক লাইটের কাছাকাছি আসবে তখন এটির সুইচ অন করবে। কাল সকালে এটি আমার কাছে নিয়ে এসো। দু'জনে মিলে শুনব টেপে কী রেকর্ড হলো। আগেভাগেই কিন্তু বাজিয়ো না।’

মাথা ঝাঁকাল রজার। ‘তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমার সাহায্য দরকার, বিল। গলার স্বরটি আমার কাছে সাংঘাতিক বাস্তব মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ওটা কোন মেসেজ দিতে চায় আমাকে। জানি না কী মেসেজ তবে...’

হাসল বিল। ‘ঠিক আছে, রজার। জানি তুমি এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব অস্বস্তিতে আছ। আমি তোমার গল্প বিশ্বাস করেছি এবং যতটা সম্ভব আমি সাহায্য করব। বাড়ি ফেরার পথে আজ টেপ রেকর্ডারটা চালাবে এবং কালকে এটা নিয়ে আসবে।’

পরদিন সকালে রজার টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসে বিলের টেবিলে রাখল। তার মুখ সাদা।

‘হ্যাঁ,’ বলল সে। ‘আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি শুনেছি ওটা। পরশু রাতের মত। কিন্তু এ জিনিসটা কী শুনেছে?’ সে টেপ রেকর্ডারের দিকে ইঙ্গিত করল। ‘না শুনলে তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমি বানিয়ে বলছি।’

‘আস্তে, রজার, আস্তে!’ বিল ওকে ধরে বসাল। ‘তুমি বড্ড তাড়াহুড়ো করছ। আগে টেপটা তো শুনি। এখনও জানি না ওতে কী আছে। শুনলে না তোমার রহস্যের সমাধানে নামতে পারব।’

সে টেপটি রিওয়াইণ্ড করল যাতে প্রথম থেকে শোনা যায়।

চেয়ারের কিনারে অস্থির চেহারা নিয়ে বসে আছে রজার। কাঁপা হাতে একটি সিগারেট ধরাল।

‘আমি গতরাতে গাড়ির রেডিও চালাইনি,’ বলল সে, ‘চাইনি টেপে অহেতুক কিছু শব্দ রেকর্ড হোক।’

‘গুড!’ বলল বিল। সে রেকর্ডার চালিয়ে দিল। ঘুরতে লাগল টেপ। প্রথমে

ওরা কেবল ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল। তারপর রাস্তায় টায়ার ঘোরার শব্দ।

'আমি গাড়ির জানালা খুলে দিয়েছিলাম,' ব্যাখ্যা করল রজার। 'তাজা বাতাসের দরকার ছিল।'

'চুপ! জানি তুমি কী করেছ!'

ইঞ্জিনের শব্দ কমে এল।

'আমি গাড়ির গতি কমাচ্ছিলাম। ট্রাফিক লাইট লাল হয়ে জ্বলছিল। জানতাম থামাতে হবে গাড়ি।'

'আহ, শাটাপ, রজার! বললাম তো কী ঘটছে বুঝতে পারছি।'

রজার চোখ বুজে হেলান দিল চেয়ারে। বেড়ে গেছে হৃৎস্পন্দন। নার্ভাস সে-না, না, ভীত সে! ভয় পাচ্ছে ভেবে কণ্ঠটি হয়তো শোনা যাবে না। টেপ রেকর্ডার হয়তো গলার স্বরটি রেকর্ড করতে পারেনি। হয়তো কোথাও কোন ভজকট হয়েছে। বিল তার কথা বিশ্বাস করবে না। সে যে সত্যি একটি মেয়ের গলা শুনেছিল তা বিশ্বাস করবে না বিল। তাহলে আর তাকে সাহায্য করতে পারবে না ও। সন্ধ্যার পরে প্রতিদিন রজারকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে এবং সে ভয়ে থাকবে-ভয় পাবে যখন কথা বলে উঠবে নারী কণ্ঠ। এবং কোন এক সন্ধ্যায় ওই কণ্ঠের আদেশ হয়তো তাকে মানতেই হবে। বাড়ির পথ না ধরে ডান দিকের রাস্তায় মোড় নিতে হবে রজারকে। সে জানে একটা সময় ওই কণ্ঠের আদেশ আর অমান্য করতে পারবে না। কণ্ঠের আদেশ মানবে, গাড়ি ঘোরাবে ডানের রাস্তায় এবং প্রবেশ করবে মনমাউথ রোডে, যেখানে তার জন্য নির্ঘাত বিপদ আর রহস্য অপেক্ষা করছে।

'ওহ, গড।' আপন মনে বিড়বিড় করে রজার। 'কণ্ঠটা যেন এখন টেপে কথা বলে। বিল যেন আমার কথা বিশ্বাস করে। প্লিজ, গড...আমি ভয় পাচ্ছি...'

টেপ রেকর্ডারে ইঞ্জিনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি এসে থেমেছে। এক সেকেণ্ডের জন্য প্রায় কিছুই শোনা গেল না।

তারপর শোনা গেল সেই চেনা, পরিষ্কার কণ্ঠ, ভয়ঙ্কর আদেশটি করছে: *এখন ডান দিকে যান...*

ফোঁস করে চেপে রাখা শ্বাস ত্যাগ করল রজার। চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনলে তুমি, বিল! আমার কথা এবার বিশ্বাস হলো তো!'

রেকর্ডারের সুইচ অফ করে দিল বিল। ফিরল রজারের দিকে। অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'শুনলাম। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছি, রজার। মেয়েটি বয়সে তরুণী। গলা শুনে তাই মনে হলো। এখন শোনো। অফিস শেষে তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেয়ো। আমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে বাড়ি ফিরব!'

ব্যস্ত রাস্তা পেছনে ফেলে অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তায় ঢুকে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল রজার। বিল তার পাশে বসা। কেউই কথা বলছে না। দু'জনেই নার্ভাস...অপেক্ষা করছে...

সামনে ট্রাফিক সিগনাল। সবুজ বাতি দেখা যাচ্ছে।

'আলো সবুজ থাকলে কী করব? গত দুই রাতে লাল বাতি জ্বলেছিল বলে গাড়ি থামিয়েছিলাম।'

'তাতে কিছু আসবে যাবে না। বাতি সবুজ থাকলেও সে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

'তুমি কী করে জানো?'

'চুপ, কথা বোলো না। তোমাকে যা করতে বলব করবে।'

ক্রস রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। সিগনালের বাতি এখনও সবুজ। রজারের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। বুকে হাতুড়ির বাড়ি। আড়চোখে একবার দেখল সে। বিল মাথা সোজা করে তাকিয়ে আছে ট্রাফিক সিগনালের সবুজ আলোর দিকে।

এখন ডান দিকে যান—সেই একই কণ্ঠ, তবে আগের চেয়ে পরিষ্কার এবং জোরালো। যেন হুকুমদাত্রী জানে তার হুকুম পালন করা হবে।

'নাউ!' বলে উঠল বিল। 'মনমাউথ রোডে ঢোকো! এবং চোখ-কান খোলা রাখো। যে কোন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকো!'

বনবন করে হুইল ঘোরাল রজার। বিরাট গাড়িটি ডানের চুপচাপ গলিতে ঢুকে পড়ল। অল্প কয়েকটি স্ট্রীট ল্যাম্প জ্বলছে রাস্তার ধারে। তাতে আঁধার দূর হয়েছে সামান্যই। বাড়িঘর এবং রাস্তার ওপর ঘন ছায়া ফেলেছে গাছপালা।

অন্ধকারে, একটি গাছের নিচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটি দেখে সে এগিয়ে এল। হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হলো তার চেহারা। এক তরুণী। বয়স কুড়ি-একুশ হবে। বেশ সুন্দরী। পরনে পার্টি ড্রেস।

গভীর দম নিল বিল। 'সাবধান, রজার!'

রজার সাবধান হওয়ার আগেই মেয়েটি ছুটে এল গাড়ির দিকে। প্রাণপণে ব্রেক কষল রজার। ক্রিইইচ। কর্কশ শব্দ তুলল টায়ার অ্যাসফল্টে ঘষা খেয়ে। তবে পুরোপুরি সামলানো গেল না। মেয়েটি যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল সেই গাছের গায়ে সজোরে বাড়ি খেল রজারের গাড়ি। তারপর থেমে গেল।

সিটবেল্ট বাঁধা ছিল বলে রক্ষা পেয়েছে ওরা। রজার সিটবেল্ট খুলে লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। হাউমাউ করে উঠল, 'মাই গড! আমি ওকে গাড়িচাপা দিয়েছি! আমি মেয়েটাকে খুন করেছি! বিল! বিল, কোথায় তুমি? বাঁচাও!'

বিল এসে দাঁড়াল ওর পাশে। তার গলার স্বর শান্ত। 'ইট'স অল রাইট, রজার। ভয়ের কিছু নেই। তুমি কাউকে গাড়িচাপা দাওনি। রাস্তা দেখো। একদম খালি। এখন একটু শান্ত হও। আমি তো বলছি সব ঠিক আছে।'

'কিন্তু...কোথায়? ...মেয়েটা কোথায় গেল? আমি ওকে দেখেছি... ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল...তুমিও নিশ্চয়ই ওকে দেখেছ? ...তারপর সে...'

'হ্যাঁ, আমি ওকে দেখেছি। ও কী করেছে তাও দেখেছি। কিন্তু সে এখন এখানে নেই, রজার। অনেক দূরে চলে গেছে। এখন শান্ত হও। আমি ট্যাক্সি ডাকছি। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। গ্যারাজের লোক এসে তোমার গাড়িটি নিয়ে যাবে। ওটা এখন আর চালাবার অবস্থায় নেই।'

'আমি এখন একটু ভাল বোধ করছি,' হাতের শূন্য কফির কাপটি নামিয়ে বলল রজার। 'তুমি কী জানো বলো আমাকে, বিল।'

'হ্যাঁ, বিল, সব খুলে বলো আমাদেরকে,' বলল রজারের স্ত্রী। 'কী ভয়ঙ্কর একটা রাত গেল! অল্পের জন্য তোমরা রক্ষা পেয়েছ।'

'হুঁ,' বলল বিল। 'আমরা মরেও যেতে পারতাম। মেয়েটা আসলে কাউকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তবে আমাদেরকেই খুন করার মতলব তার ছিল কিনা জানি না। আমি আসলে কোন কিছু নিয়েই নিশ্চিত নই।'

'বলতে থাকো, প্লিজ।'

'বলছি। একটা জটিল গল্প। তবে এ গল্প আমি কোনদিন খবরের কাগজে লিখব না। কারণ এটা কেউ বিশ্বাসই করবে না। রজার, তোমাকে আমি বলেছিলাম না একবার আমি মনমাউথ রোডে গিয়েছিলাম?'

'বলেছ। কিন্তু কেন গিয়েছ বলোনি।'

'তখন বলা উচিত হবে না ভেবে বলিনি। এখন বলছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বিল। ভাবছে।

'আমি ওই মেয়েটাকে চিনতে পেরেছি,' অবশেষে বলল সে।

'চিনতে পেরেছ? কীভাবে? কে সে?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! বলছি। ওর নাম...' আবার থেমে গেল বিল। তারপর শুরু করল। 'ওর নাম ক্যাথলিন হেনসন। মনমাউথ রোডে সে খুন হয়। না তুমি তাকে খুন করনি, রজার। এক বছর আগে সে মারা গেছে। তার ছবি ছাপা হয়েছিল খবরের কাগজে। আমাদের কাগজে তার বড় ছবি ছেপেছিলাম। তাই ওকে আজ রাতে দেখা মাত্র চিনে ফেলি!'

'আমার অবশ্য এসব কিছুই মনে পড়ছে না।'

'না,' বলল বিল। 'তোমার মনে থাকবে কেন? আমি সাংবাদিক মানুষ অনেক কিছুই আমাদের স্মরণে রাখতে হয়। ক্যাথলিন হেনসন তার বাবা-মা'র সঙ্গে মনমাউথ রোডের একটি বাড়িতে থাকত। এক রাতে সে তার বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে পার্টিতে যাচ্ছিল। কিন্তু রেডি হওয়ার পরেও বয়ফ্রেণ্ড না এলে ক্যাথলিন রাস্তায় গিয়ে তার বয়ফ্রেণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।' আবার বিরতি নিল বিল।

'তারপর কী হলো? বলো, প্লিজ, বিল।'

'তারপর কী হলো নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তবে অনুমান করি ক্যাথলিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। এমন সময় মনমাউথ রোডে একটি গাড়ি ঢোকে। ক্যাথলিন ভেবেছিল তার বয়ফ্রেণ্ডের গাড়ি। সে ছুটে যায় গাড়ির দিকে। ভেবেছিল গাড়িটি থামবে। কিন্তু থামেনি। ড্রাইভার ওই এলাকায় ছিল নতুন। জানত না ক্যাথলিন কারও জন্য অপেক্ষা করছে। মেয়েটা যে ঝড়ের গতিতে তার দিকে ছুটে আসবে তাও সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি। গাড়ির গতি কমানোর সুযোগ পায়নি সে। সরাসরি ক্যাথলিনকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মারা যায় মেয়েটা।'

'কী ভয়ঙ্কর!' আঁতকে উঠল রজারের বউ।

'হ্যাঁ,' সায় দিল বিল। 'ভয়ঙ্কর এবং করুণ একটা ঘটনা। পুলিস ধরে নেয় এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তারা ড্রাইভারকে অভিযুক্ত করেনি। আমার কাগজ খোঁজ-খবর নিতে মনমাউথ রোডে পাঠিয়েছিল আমাকে। আমি নানাজনকে নানান প্রশ্ন করেছি কিন্তু নতুন কোন তথ্য জানতে পারিনি। মেয়েটাকে কীভাবে চিনতে পারলাম বুঝতেই পারছ। আমি ওর কথা কখনও ভুলিনি।'

'কিন্তু, বিল, ক্যাথলিন হেনসন আমার সঙ্গে কেন কথা বলল? কেন আমাকে মনমাউথ রোডে বারবার যেতে বলল?'

'তোমার গাড়িচাপা পড়েই মেয়েটি মারা গিয়েছিল,' জবাব দিল বিল। 'আমার পরামর্শ শোনো, রজার। ওই গাড়ি আর কক্ষনো চালিয়ো না!'

দানব

পূর্বাভাস

পল্লবী কেয়া পিংকির বয়স ১৮। উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। দুধে আলতা গায়ের রঙ। তাই তার দাদু তাকে 'পিংকি' বলে ডাকেন। পিংকির গড়ন দোহারা। তবে মুখখানা লাবণ্যে ঢলঢল। সে থাকে আমেরিকার খুদে এক মফস্বলে, পয়েন্ট লেকে। আগে শিকাগো থাকত বাবা-মা'র সঙ্গে। কিন্তু বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গেলে পিংকিকে তার দাদু প্রীতম চৌধুরী নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। পিংকি স্বাধীনচেতা, বন্ধুবৎসল। তার প্রিয় বান্ধবী জেনি বার্টন। আজ সে একটি পার্টিতে এসেছে জেনির প্রেমিক, ফুটবল তারকা জিম ক্লাইনের দাওয়াতে। পিংকি জানত না এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে তার জন্য আনন্দোচ্ছল এ পার্টিতে। কারণ রক্তের হোলিখেলার মাঝ দিয়ে শুরু হলো এমন এক ঘটনা যা পিংকির জীবনটাকেই বদলে দিল বেমালুম...

এক

পল্লবী কেয়া পিংকি সোফায় বসে দ্বিতীয় কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় হাতে গুলি ভরা শটগান নিয়ে ঝড়ের বেগে জিম ক্লাইনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল ওর সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী জেনি বার্টন।

রাত প্রায় দশটা বাজে। বেশ জমে উঠেছে পার্টি। দারুণভাবে সময়টা উপভোগ করছিল পিংকি। গত জুনে পয়েন্ট লেক নামের ক্ষুদ্র এ শহরে এসেছে। এখন সেপ্টেম্বর যাই যাই করছে। এই প্রথম এ শহরের কেউ ওকে পার্টিতে দাওয়াত দিল। স্কুল শুরু হয়েছে কিছুদিন আগে। এ দাওয়াতকে পিংকি দেখছে ওকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিত হিসেবে। আর নিমন্ত্রণটা সে পেয়েছে যার তার কাছ থেকে নয়–ফুটবল তারকা, স্কুলের সবচেয়ে সুদর্শন তরুণ জিম ক্লাইন স্বয়ং ওকে নেমন্তন্ন করেছে। তবে ও যে কারও চেয়ে ভাল করে জানে জিমের জন্য দিওয়ানা জেনি। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, আত্মবিশ্বাসী জেনি গোটা শহরে ওর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জেনি! জেনি! গুলি ভরা শটগান হাতে পার্টিতে চলে এসেছে জেনি।

'হাই, জেনি,' সদর দরজা দিয়ে তীর বেগে বান্ধবীকে ঢুকতে দেখে হাত

নাড়ল পিংকি। ওর হাতটা ঝুলে থাকল শূন্যে এবং হাঁ হয়ে রইল মুখ। শটগান হাতে প্রিয় বান্ধবীকে দেখে রীতিমত হতবাক সে। চোখ অনুসরণ করছে জেনির হাতের অস্ত্র। দেখল জেনি শটগান তুলে তাক করেছে টড গ্রীনের পেট বরাবর। টডের সঙ্গে আজ রাতেই পরিচয় হয়েছে পিংকির। সে পয়েন্ট হাই স্কুল ফুটবল দলে লাইন বেকার হিসেবে খেলে। কথাবার্তা বলে ছেলেটাকে খারাপ মনে হয়নি পিংকির। জেনি ট্রিগার টানতে যাচ্ছে, ঠিক সে মুহূর্তে পিংকির হাস্যকরভাবে মনে হলো ওর বান্ধবী জানে কীভাবে উজ্জীবিত করে তুলতে হয় পার্টি।

জেনি সরাসরি টডের পেটে গুলি করল।

বুলেট ওর পেটে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল, পেছনের দেয়াল মুহূর্তে রঞ্জিত হলো তাজা খুনে। গুঙিয়ে উঠে দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল টড। পার্টিতে উপস্থিত ত্রিশজন মানুষের মাঝে নেমে এল অস্বাভাবিক নীরবতা। কেউ নড়ল না, জেনি ছাড়া। শটগানে পাম্প করে পাঁই করে ঘুরল সে কিচেন অভিমুখে।

তবে বেশি দূর গেল না ও, আসলে যেতে হলো না। জেনি এবং কিচেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল কেথি বেকার, পয়েন্ট হাই-এর হেড চিয়ারলিডার। স্বর্ণকেশী কেথি দেখতে লোভনীয় ক্রীম পাই-এর মত। প্রতিটি ছেলে তার প্রেমে পড়েছে, এবং পিংকির ধারণা কেথিও চুটিয়ে একসঙ্গে একাধিক তরুণের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে প্রেম। তার বয়স কম, তরতাজা, মুখখানা মডেলের মত।

জেনি কেথির টসটসে মুখে তাক করল শটগান এবং টিপে দিল ট্রিগার। কপালে গুলি খেল কেথি। তার খুলির ওপরের একটা অংশ উড়ে গেল, সিঁড়িতে ছিটকে পড়ল হলুদ মগজ। কেথি–মারা গেছে আগেই–গুলির প্রবল ধাক্কায় ছিটকে গেল পেছন দিকে এবং তার লাশটা ধপ করে পড়ল মেঝেতে।

বিমূঢ় নীরবতা আরও ঘনীভূত হলো।

আবার শটগানে পাম্প করল জেনি, এবং লেসার রশ্মির মত তার দুই চোখ খুঁজতে লাগল সিঁড়ি। পিংকির মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। এখনও লিভিংরুমের সোফায় বসে আছে ও, সদর দরজা এবং রক্তাক্ত টডের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। হাতে এখনও ধরে রেখেছে কোকের প্রায় খালি গ্লাস। জেনি তার বামে, পনেরো ফুট দূরে। তবে সে যদি জেনির মাথাটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করে দেখত, দেখতে পেত বান্ধবীর চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে থাকলেও তাতে পাগলামির কোন আভাস বা চিহ্ন নেই। জেনি নির্বিকার চিত্তে দোতলায় চোখ বুলাচ্ছে। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক এবং নিয়মিত। এই মাত্র দু'জন মানুষকে সে নির্মমভাবে হত্যা করেছে অথচ এজন্য বিন্দুমাত্র বিকার নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক লাগছে তাকে।

তবে জেনির কাজ এখনও শেষ হয়নি।

দোতলার সিঁড়ির রেইলিং দিয়ে কেউ উঁকি দিল নিচে। পিংকির বুঝে উঠতে এক মুহূর্ত সময় লাগল যে ওটা জিম ক্লাইন। তার চোখ জিম থেকে ঝটিতি নিবদ্ধ হলো জেনির ওপর, তারপর আবার ফিরে গেল জিমের কাছে।

নিচের দৃশ্যটা দেখে ঝুলে পড়েছে জিমের চোয়াল। জেনির কপালে ভাঁজ

পড়ল। ওকে আবার কাঁধে শটগান তুলতে দেখে শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল পিংকির। পার্টির সবাই দৃশ্যটা দেখছে কিন্তু কেউ কিছু করছে না। ঘটনার আকস্মিকতা সবাইকে স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় করে তুলেছে।

জেনি দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকার পরে ছয় সেকেণ্ডও পার হয়নি। পিংকি মাত্র সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, জেনির দিকে পা বাড়িয়েছে কি বাড়ায়নি, তৃতীয়বারের মত শটগানের ট্রিগার টিপে দিল জেনি।

'থামো!' চিৎকার দিল পিংকি।

মিস হলো শট। জেনিকে ওর দিকে লক্ষ্যস্থির করতে দেখে এক লাফে পিছিয়ে গেছে জিম। দোতলার ছাদে একটা গর্ত তৈরি করল শটগানের গুলি। বাতাসে উড়তে লাগল সাদা প্লাস্টার। জিমকে দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় কাছের কোন দরজা বা জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। তবে পালাতে পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো পিংকির। দেখল দাঁত কিড়মিড় করছে জেনি, শটগানে আবার পাম্প করে এক লাফে উঠে পড়ল সিঁড়িতে। একেক লাফে তিনটে ধাপ বাইছে।

ওকে থামাতেই হবে, মনে মনে বলল পিংকি।

কার্পেটে ঢাকা তিন সারি সিঁড়ি এঁকেবেঁকে উঠে গেছে দোতলায়। জেনি মাত্র প্রথম ল্যাণ্ডিংয়ে পা রেখেছে, পিংকি ছুটে গিয়ে সিঁড়ির সাদা স্তম্ভের মাঝ দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল। ভারসাম্য হারিয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল জেনি, মুহূর্তের জন্য মুঠো আলগা হলো শটগানে।

পিংকি বুদ্ধিমতী। সে সঙ্গে সঙ্গে জেনির পা ছেড়ে দিয়ে চট করে ধরে ফেলল শটগানের ব্যারেল। টানতে লাগল। জেনি যত খুশি জিমকে ধাওয়া করুক তাতে পিংকির কিছু আসে যায় না, কিন্তু অস্ত্র হাতে পিছু না নিলেই হলো।

জেনি ধাঁই করে ডান পায়ে লাথি বসিয়ে দিল পিংকির মুখে।

'বন্দুক ছাড়ো!' খেঁকিয়ে উঠল জেনি।

'উহ্, মা,' ব্যথায় কাতরে উঠল পিংকি, হাত থেকে ছুটে গেল শটগান, পিছিয়ে এল এক কদম।

মুখে রক্তের স্বাদ পেল ও, ঘরটা বনবন ঘুরছে চোখের সামনে। তবে দৃষ্টি ঝাপসা নয় বলে দেখতে পেল জেনি বন্দুকটা হাতে নিয়ে আবার সিঁড়ি বাইতে শুরু করেছে।

পিংকি প্রার্থনা করল মাথার ঝিমঝিম ভাবটা যেন দ্রুত কেটে যায়। কারণ ও জানে বৃত্তাকার সোপান শ্রেণী ঘুরে আসার মত সময় পাবে না। পিংকি তেমন লম্বা-চওড়া নয়, গায়েও খুব বেশি শক্তি নেই তবে ও একজন ভাল অ্যাথলেট। দু'হাতে স্তম্ভটা ধরে লাফ মারল ও। এক লাফে রেইলিং টপকে সিঁড়িতে।

জেনি ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছে, ওপরতলার হলওয়ে ধরে ছুটছে। হলওয়ের পরে বেডরুম। জিমকে দেখতে পাচ্ছে না পিংকি তবে অনুমান করল জিম হয়তো কোন বেডরুমে গিয়ে লুকিয়েছে।

'ওকে কেউ থামাও!' চিৎকার দিল পিংকি। ভয়ঙ্কর মৃত্যুদৃশ্য দেখে

সাময়িকভাবে স্থাণু বনে যাওয়া লোকগুলো সংবিৎ ফিরে পেতে লাগল। লিভিংরুম থেকে কয়েকজন ছুটে এল পিংকিকে সাহায্য করতে। তবে বেশিরভাগ সামনে এবং পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। নানান বিচিত্র শব্দ করছে তারা তবে বেশিরভাগই ভয়ে চিল্লাচ্ছে।

দুটি মেয়ে ওপরতলার হলওয়েতে ছিল। পাশাপাশি হেঁটে আসছিল। জেনিকে শটগান হাতে ছুটে আসতে দেখে দু'জনেরই আত্মা উড়ে গেল। ওরা জেনিকে থামাতে পারবে না, ভাবল পিংকি। আর যারা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে তারাও জেনির কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ঘটে যাবে অঘটন।

কাজেই ওকে আমারই বাধা দিতে হবে, ভেবে ছুটল পিংকি।

হলওয়ের শেষ মাথায়, একটা বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা করছিল জেনি। কিন্তু দরজায় তালা মারা। দরজায় ঘুসি মেরে জিমকে বেরিয়ে আসতে বলার ধৈর্যটুকুও নেই জেনির। সে কয়েক কদম পিছু হঠল, শটগান তুলল দরজার নব লক্ষ্য করে এবং এক গুলিতে ওটাকে ছাতু করে দিল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগল তার কাজটা করতে। জেনি লাথি মেরে কপাট খুলেছে, এমন সময় পেছন থেকে ওর ওপর হামলে পড়ল পল্লবী কেয়া পিংকি।

'ছাড়ো আমাকে!' মাস্টার বেডরুমের মেঝেতে পিংকি ওকে নিয়ে পড়ে যেতে চিৎকার দিল জেনি। পিংকির মনে হচ্ছে সে একটা বুনো জানোয়ারকে ধরে রেখেছে। লম্বায় দু'জনে প্রায় একইরকম হলেও জেনি পিংকিকে সহজেই এক ধাক্কায় গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিল। কার্পেটে গড়িয়ে পড়ল পিংকিও, খোলা দরজার নিচে ঠাস করে বাড়ি খেল মাথা। আবার বিনে পয়সায় ফুলঝুরি দেখল চোখে। এক ঝলক দেখতে পেল জানালার সামনে জিম এবং জেনি সিধে হয়ে দাঁড়াচ্ছে শটগান হাতে। পিংকি হাঁচড়ে পাঁচড়ে খাড়া হতে যাচ্ছে, ভয়াবহ এক বিস্ফোরণের আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। শটগানের গুলিতে জানালার কাচ ভেঙে পড়ল ঝুরঝুর করে।

এ হতে পারে না!

এর আগে জেনি যখন গুলি করেছে, কাছাকাছি ছিল না পিংকি। আর এ মুহূর্তে জেনি ওর কাছ থেকে মাত্র চার হাত দূরে। গুলির আওয়াজে ওর কানের পর্দা যেন ফেটে গেল। কানে হাত চাপা দিল পিংকি।

জেনি ভাঙা জানালার সামনে দৌড়ে গেল। ছেঁড়া পর্দা এবং জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রাতের আঁধারে। চেহারায় ফুটল হতাশা। পিংকি বুঝতে পারল গুলি নয়, জানালার কাচ ভেঙেছে জিম জানালা ভেঙে নিচে লাফ দিয়ে পড়েছে বলে।

জেনি আবার কাঁধে তুলল বন্দুক। গুলি করতে গিয়েও ক্ষান্ত দিল। অনেক দূরে চলে গেছে জিম। গুলি করলেও লাভ হবে না। জেনি পাঁই করে ঘুরল, ছুটল বেডরুমের দরজায়।

পিংকির পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, জেনির একটা হাত ধরে ফেলল পিংকি। কিন্তু জেনি ওর দিকে বন্দুকের কুঁদো উঁচিয়ে ধরছে দেখে সাথে সাথে ছেড়ে দিল হাত গুঁতো খাওয়ার ভয়ে। তবে ওকে মারল না জেনি। এক ছুটে বেরিয়ে গেল খোলা

দরজা দিয়ে–তার বয়ফ্রেণ্ডকে হত্যার নেশা চোখে নিয়ে।

'খোদা!' ফিসফিস করল পিংকি। জানে না কতক্ষণ বসে আছে মেঝের ওপর। কয়েক সেকেণ্ড হতে পারে আবার কয়েক মিনিট হওয়াও বিচিত্র নয়। নিচতলা থেকে দু'জন এসে ওকে সিধে হতে সাহায্য করল। দু'জনেরই মুখ সাদা এবং পিংকির মত তারাও ভয়ে কাঁপছে।

'ওরা কি ওকে থামাতে পেরেছে?' পিংকির গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাঙের ডাক।

একজন মাথা নাড়ল। এর সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে পিংকির কিন্তু রাতের এই বিভীষিকা ওর স্মৃতি ওলট-পালট করে দিয়েছে। লোকটার নাম মনে পড়ছে না।

'ও পালিয়ে গেছে,' জবাব দিল সে।

'আর জিম?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

ডানে-বামে মাথা নাড়ল লোকটা। 'আমি জানি না। দু'জনকেই মাঠের দিকে, লেক অভিমুখে ছুটতে দেখা গেছে।' লোকটা একপাশে কাত করল মাথা। দূর থেকে ভেসে এল সাইরেনের আওয়াজ। 'বোধহয় পুলিস।' মন্তব্য করল সে।

একটা দম নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এল পিংকি। টড এবং কেথি লাশ হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। ওদিকে তাকাবে না তাকাবে না করেও তাকাল পিংকি। কেথির মাথাটা ছিন্নভিন্ন একটা লাল বলে পরিণত হয়েছে। আর শটগানের গুলিতে প্রায় দু'খণ্ড টডের শরীর। ওদের রক্ত মেঝেয় একটা নালা সৃষ্টি করেছে–ক্রমে দীর্ঘতর হচ্ছে। রক্ত ছিটে রয়েছে সর্বত্র। পা ফেলতে রক্তের পুকুরে ডুবে গেল পিংকির জুতো। ও এক ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে, চলে এল ফ্রন্ট ইয়ার্ডে।

পার্টির প্রায় সকলেই ড্রাইভওয়ে কিংবা লনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটাছুটি করছে কেউ কেউ। সাইরেনের কান্না উঠল বাতাসে। মাথায় লাল বাতির ঘূর্ণি নিয়ে দুটো পুলিসের গাড়ি এসে থামল ড্রাইভওয়ের মাথায়। চার পুলিস লাফ দিয়ে নামল গাড়ি থেকে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে মাঠের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে চেঁচাল, 'ওরা ওই দিকে গেছে!'

ওরা কী নিয়ে কথা বলছে বুঝতে পারল না পুলিস অফিসাররা। পিংকি এখনও হাঁপাচ্ছে। ও দৌড়ে গেল কাছের এক পুলিস অফিসারের কাছে। লোকটার চেহারা দেখে বোঝা যায় সে প্রাচ্য দেশীয়–পরনে সাদা পোশাক। বেঁটেখাট, হালকাপাতলা গড়ন, তবে এক ঝলক দেখেই অনুমিত হয় এ লোকই বর্তমানে চার্জে আছে। পিংকি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, পুলিস অফিসার চট করে ওকে ধরে ফেলল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ও দু'জনকে গুলি করেছে,' গুঙিয়ে উঠল পিংকি।

'কোথায়?'

দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে দেখাল ও। 'ওখানে।'

'কে গুলি করেছে?' প্রশ্ন করল লোকটা।
'আমার বান্ধবী। জেনি।'
'কী দিয়ে গুলি করেছে?'
'শটগান।'
'এখন ও বাড়িতে নেই?'
'না,' বলল পিংকি।
মাঠে তাকাল লোকটা। মাঠের পরে জঙ্গল। এ জঙ্গল অনেকখানি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে পয়েন্ট লেককে। এ এলাকা ভালই চেনে পিংকি; সে লেকের বিপরীত দিকে তার দাদুর সঙ্গে থাকে। জেনি নাগাল পাবার আগেই জিম জঙ্গলে ঢুকে যেতে পারলে বেঁচে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে। সাদা পোশাকধারী উর্দিপরা পুলিস অফিসারদেরকে ইঙ্গিত করল বাড়িতে ঢুকতে। আশপাশের গুঞ্জন শুনল সে কয়েক সেকেণ্ড, পরিস্থিতি বুঝে নিতে সময় নিল না। অনেকেই জেনির চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে।
'ও কাকে ধাওয়া করেছে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল পিংকিকে।
'জিম। ওর বয়ফ্রেণ্ড।'
'কেন?'
'আমি জানি না কেন। তবে জেনি ওকে হত্যা করতে চায়। ইতিমধ্যে দু'বার গুলিও চালিয়েছে ওকে লক্ষ্য করে।'
'ছেলেটা কি আহত হয়েছে?'
'বলতে পারব না।'
'জেনি মোট ক'বার গুলি করেছে?'
একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল পিংকি, 'পাঁচবার।'
'ওকে শটগানে গুলি ভরতে হবে,' বিড়বিড় করল লোকটা। সে অপর দু'জন অফিসারকে তার কাছে আসতে ইশারা করল।
'তোমার বান্ধবী অপর দু'জনকে কেন হত্যা করেছে জানো?'
'না,' মাথা নাড়ল পিংকি। 'ও হঠাৎ করে পার্টিতে ঢুকেই গুলি করতে শুরু করে।'
'তুমি কি এখানে থাকো?'
'জী।'
'কোন্ দিকে ছেলেটা দৌড়ে গেছে বলতে পারবে?'
জবাব দিতে একটুও ইতস্তত করল না পিংকি। 'লেকের দক্ষিণ দিকে। ওদিকে জঙ্গল খুব ঘন।'
'জেনি কি ওকে ওদিকে যেতে দেখেছে?'
'বোধহয় দেখেছে।'
'গাড়ি নিয়ে মাঠে যাওয়া যাবে?' মাঠের দিকে হাত তুলল অফিসার।
'না। ওদিকে কাঠের কয়েকটা বেড়া আছে। যেতে পারবেন না।'
লোকটা তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। তারা যে যার অস্ত্র বের করল। 'সেক্ষেত্রে আমরা হেঁটে যাব,' বলল সে। 'জঙ্গলে পৌঁছে ছড়িয়ে পড়ব

তারপর বৃত্তাকারে এগোব।' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ওকে আমরা ধরব।'

পিংকি লোকটার হাত চেপে ধরল। 'আপনারা কী করবেন?'

দৃঢ় গলায় জবাব এল, 'মেয়েটাকে থামাব।'

'ওকে গুলি করবেন না তো?'

'ও যাতে আত্মসমর্পণ করে সে চেষ্টা করব।'

'কিন্তু ও আত্মসমর্পণ করবে না। ওর কিছু একটা হয়েছে। ও নিজেও জানে না কী করছে।'

লোকটা পিংকির মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

'সে ইতিমধ্যে দু'জনকে খুন করেছে। তৃতীয় আরেকজনকে হত্যা করতে চলেছে। ওকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে।'

পিংকি বলল, 'তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। ও আমার বন্ধু। ও আমার কথা শুনবে।'

'বাড়িতে কি সে তোমার কথা শুনেছিল? শোনেনি। তুমি যেতে পারবে না। তোমার নিরাপত্তার দিকটাও আমাকে দেখতে হবে।' ঘুরল সে। 'তুমি এখানেই থাকো। তোমার অন্যান্য বন্ধুরা যেন কোথাও না যায় সেদিকে খেয়াল রেখো। আমরা আসছি।'

'কিন্তু–'

'থাকো!' ধমক দিল লোকটা। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে মাঠে। আকাশে চাঁদ নেই। শীঘ্রি অন্ধকার গ্রাস করল ওদেরকে। লোকটার সঙ্গে মাত্র পরিচয় হলেও পিংকির মনে হয়েছে এ লোক নিজের কাজে বেশ দক্ষ ও যোগ্য। হঠাৎ জেনির চোখের খুনের নেশার কথা মনে পড়ে গেল। পুলিস হয়তো ওকে মেরে ফেলবে।

'না!' আপন মনে বলল পিংকি, 'না!'

কী যেন একটা মিলছে না। জেনির সঙ্গে ওর পরিচয় তিন মাস। তবে একত্রে বহু সময় কাটিয়েছে ওরা। জেনিকে তার কখনওই উন্মাদ টাইপের কিছু মনে হয়নি। পিংকি জেনির বাসাতেও থেকেছে, রাত জেগে গল্প করেছে দু'বান্ধবী। জেনি দৃঢ়চেতা স্বভাবের মেয়ে। নিজের মতামতে বিশ্বাসী। এবং সে বুদ্ধিমতী। ভবিষ্যতে কী করবে না করবে সেসব পরিকল্পনা এখনই করে রেখেছে। স্রেফ আবেগের বশবর্তী হয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসার মেয়ে নয় জেনি।

অথচ সে-ই কিনা দু'জনকে হত্যা করেছে।

আর এখন জিমকে খুন করতে চাইছে।

পিংকি জানে কিছুদিন ধরে জেনি এবং জিমের সম্পর্কটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু জেনির কথা শুনে মনে হয়নি তাদের মধ্যে সিরিয়াস কিছু একটা হয়েছে। জিমের সঙ্গে জেনি সম্পর্ক ছেদ করতে চাইত কিনা তা-ই জানত না পিংকি, গুলি করে প্রেমিকের খুলি উড়িয়ে দেয়ার অভিসন্ধি টের পাওয়া দূরে থাক।

দ্রুত একটা সিদ্ধান্ত নিল পিংকি। সে ইচ্ছে করলে নিজের গাড়ি নিয়ে

পুলিসের আগেই জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারবে। ও আজ দেরিতে পার্টিতে এসেছে, গাড়িটা অদূরেই পার্ক করা। এখন শুধু গাড়িতে উঠে পড়লেই হলো।

কিন্তু জেনিকে ও থামাবে কী করে? এর আগে দু'বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে পিংকি। ওকে থামাতে গেলে জিমকে ছোঁড়া গুলি যদি ওর নিজের গায়ে লেগে যায়?

তবু ঝুঁকিটা নেবে ঠিক করল পিংকি—জেনিকে সে মরতে দিতে পারে না। রাস্তা ধরে ছুটল ও নিজের ব্র্যাণ্ডনিউ গাঢ় সবুজ রঙের টয়োটা ক্যামরির দিকে। গাড়িটা ওর বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছে পিংকি। ওর বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গেছে। দু'জনে দু'শহরে আলাদা থাকেন। ওঁদের কারও কাছেই থাকতে ইচ্ছে করেনি বলে এ শহরে, দাদুর কাছে চলে এসেছে পিংকি। বাবা-মা'র সঙ্গে গত জুনের পর থেকে ওর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। শুধু মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়।

স্টার্ট দেয়া মাত্র চালু হয়ে গেল গাড়ি। ফুটপাত থেকে রাস্তায় নেমে এল পিংকি। প্রথমে মাঠ এবং পয়েন্ট লেক থেকে ভিউ স্ট্রিট অভিমুখে চলল—এটাই একমাত্র রাস্তা যেটা গোটা লেক ঘেরাও করে রেখেছে। কয়েক মিনিট পরে গাড়ির গতিসীমা সত্তরে তুলে ফেলল পিংকি। ওর ডানদিকে এখন লেকের জল দেখা যাচ্ছে। পয়েন্ট লেক পৌনে এক মাইল চওড়া—নীল টলটলে জল। ওর দাদুর বাড়ি লেকের পাড়ে হলেও আজতক হ্রদে সাঁতার কাটেনি পিংকি। মিশিগানের সামারে দস্যুর মত খররোদের কালেও হিমশীতল থাকে হ্রদের জল।

কিছুক্ষণ পরে লেকের দক্ষিণে, জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় চলে এল পিংকি। গাড়ি পার্ক করল কতগুলো গাছের সারির পেছনে। গাড়ি থেকে নামার সময় হঠাৎ একটা আশংকা জাগল পিংকির মনে। ওর বিপদ জেনির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। জেনির মত ওরও কাঁধ পর্যন্ত ঢেউ খেলানো কালো চুল, ওদের দু'জনের উচ্চতাও প্রায় সমান; পুলিস ওকে জেনি ভেবে গুলি করে বসতে পারে। জোর করে দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিল পিংকি। সাদা পোশাকের যে মানুষটির সঙ্গে ও কথা বলেছে তাকে দেখে মনে হয়নি অবিমৃষ্যকারীর মত গুলি চালিয়ে বসবে। সে ওদেরকে সারেণ্ডার করার একটা সুযোগ অন্তত না দিয়ে গুলি করবে না।

পিংকি গাছের ফাঁকে দ্রুত পা চালাল। এ জায়গাটি ওর খুব প্রিয়। দাদুর বাড়ি এখান থেকে স্বল্প দূরে। এখানে প্রায়ই সে হাঁটাহাঁটি করতে আসে। এই তো গত সপ্তাহেও জেনির সঙ্গে এদিকে বেড়াতে এসেছিল। জেনি অস্বাভাবিক নীরব ছিল, কী যেন ভাবছিল। সেদিন যদি পিংকি ওর নীরবতার কারণ জানতে চাইত তাহলে সম্ভবত আজ রাতের রক্তপাত এড়ানো যেত।

দৃশ্যটা মনে পড়তেই পেট গুলিয়ে উঠল পিংকির।

টডের ছিন্নভিন্ন অন্ত্র দেয়াল বেয়ে নিচে পিছলে পড়ছিল।

কেথির হলুদ মগজ ছিটিয়ে আছে রেইলিং এবং মেঝেতে।

নাহ্, জেনি বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

'জেনি,' ফিসফিস করল পিংকি, 'কেন?' তারপর হাত দুটো চোঙার মত করে মুখের সামনে এনে হাঁক ছাড়ল, 'জেনি! জেনি! আমি! পিংকি!'

পাইনের সারির মাঝে আর জলের ওপর দিয়ে ওর কণ্ঠ ক্রমে প্রতিধ্বনিত হয়ে ম্লান হয়ে এল। উষ্ণ রাত-বাতাস আশ্চর্যরকম স্থির। লেক থেকে দূরে, জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে পড়ল পল্লবী কেয়া।

আমি আসলে বোকার মত কাজ করছি, ভাবছে ও। জিম হয়তো এদিকে আসেইনি। কে জানে শিলা ইতিমধ্যে ওর ঘিলু উড়িয়ে দিয়েছে কিনা। পিংকি হয়তো জেনির পরবর্তী টার্গেট হবে। তবু ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর। জেনি জিম ক্লাইনকে চাইত-দারুণভাবে চাইত।

জিম, টড এবং কেথি। এ তিনজনের মধ্যে মিলটা কোথায়?

জিম এবং টড দু'জনেই ফুটবল খেলোয়াড়। কেথি চিয়ারলিডার। নাহ্, মিলছে না। টড এবং কেথির বাবা-মা যখন তাঁদের সন্তানদের নৃশংস মৃত্যুসংবাদ শুনবেন, তখন তাঁদের কী অবস্থা হবে ভেবে অসুস্থ বোধ করল পিংকি।

পল্লবী কেয়া পিংকির বাবা শিকাগো থাকেন, মা বোস্টনে। তবে শিকাগো শহরেই পিংকির জন্ম। ওর মা বিদেশিনী। দাদু প্রীতম চৌধুরী বহুদিন ধরে পয়েন্ট লেক শহরে আছেন। পিংকি বাবা-মা'র চেয়েও বেশি ভালবাসে দাদুকে। এর কারণ সম্ভবত এই যে উচ্চাভিলাষী বাবা-মা মেয়ের সমস্ত জাগতিক প্রয়োজন মেটালেও ভালবাসা, স্নেহ এবং আদর দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আর এগুলো পিংকি পুরোমাত্রায় পেয়েছে দাদুর কাছ থেকে। তাই বাবা-মা'র ডিভোর্স হয়ে গেলে সে শিকাগোর প্রাচুর্যময় জীবন ছেড়ে এ শহরের সাদামাঠা, নিস্তরঙ্গ পরিবেশটাকেই বেশি পছন্দ করেছে শুধুমাত্র দাদু নামের বটবৃক্ষের আড়ালে শান্তিময় একটা জীবন যাপন করতে পারবে বলে, আর প্রীতম চৌধুরীও বংশের একমাত্র প্রদীপ আদরের নাতনীকে সর্বক্ষণের জন্য কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা।

পয়েন্ট লেক-এর হাইস্কুলে ফাইনাল ইয়ারে ভর্তি হয়েছে পিংকি। প্রথম তিনটা মাস বেশ নিরিবিলিতে, শান্তিতেই কেটে গেছে। কল্পনাও করেনি ক্ষুদ্র একটা মফস্বল শহরে এরকম ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করতে হবে।

'জেনি!' আবার ডাকল ও।

একটা হাত বেরিয়ে এল একটি গাছের পেছন থেকে, চেপে ধরল ওর মুখ।

চিৎকার দিল পিংকি, তবে মুখে হাত চাপা দেয়া বলে কোন শব্দ বেরুল না।

'চেঁচামেচি করলে ও জেনে যাবে আমরা এখানে!' ওর কানের পাশে হিসিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ।

জিম ক্লাইন। পিংকির শরীরের পেশীতে ঢিল পড়ল। জিম আস্তে ওর মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিল হাত। ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল। জোরে কথা বলতে নিষেধ করছে।

'ও কি কাছেপিঠেই আছে?' ফিসফিস করল পিংকি।

'মনে হয়,' জিমও গলা নামাল। জোরে জোরে শ্বাস করছে। গা দিয়ে ঘামের গন্ধ আসছে। চারপাশে ভীত চোখে তাকাল। 'ক্রাইস্ট!' বিড়বিড় করল জিম।

‘কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস চলে আসবে,’ মৃদু গলায় বলল পিংকি।
শুনে খুশি হলো জিম, ‘গুড।’
‘এসব ঘটছে কী?’
‘জানলে তো বলব। ও নিচতলায় কাকে গুলি করেছে?’
‘টড এবং কেথিকে,’ জবাব দিল পিংকি।
‘ওরা কি মারা গেছে?’
শিউরে উঠল পিংকি। ‘হ্যাঁ।’
‘গড!’
‘গুলি করার পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল।’
কীসের যেন একটা শব্দ হলো। তবে অন্ধকারে ঠাহর করতে পারল না পিংকি। ‘পুলিসের অপেক্ষায় না থেকে বরং চলে যাই চলো। আমার গাড়িটা কাছেই আছে।’
‘এ কথা আগে বলোনি কেন? জলদি চলো।’
যে পথ দিয়ে পিংকি এসেছে সেদিকে পা টিপে টিপে এগোল ওরা। পিংকি অনুমান করল ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছে। রাতের বেলা জঙ্গলটাকে অন্যরকম লাগছে। জঙ্গলের মাঝখানে, ফাঁকা একটা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। কপালে ভাঁজ পড়ল পিংকির। আগেরবার তো এরকম কোন ফাঁকা জায়গা চোখে পড়েনি!
‘গাছের আড়াল নিয়ে চলো,’ পরামর্শ দিল পিংকি।
‘তোমার গাড়ি কোথায়?’ জানতে চাইল জিম।
‘গাড়িটাকেই তো খুঁজছি,’ বিড়বিড় করল পিংকি।
কাছেই শুকনো ঘাস মাড়িয়ে দেয়ার মুটমুট শব্দ হলো। পাথর হয়ে গেল পিংকি। শংকিত দৃষ্টিতে চারপাশে চোখ বুলাল জিম। কাউকে বা কোন কিছুকে দেখা যাচ্ছে না। আবার ঠোঁটের ওপর উঠে এল আঙুল। মৃদু মাথা দোলাল পিংকি। হয়তো বাতাসের কারণে শব্দটা হয়েছে।
কিন্তু বাতাস তো আর শটগান পাম্প করতে পারে না।
শটগান পাম্প করার পরিষ্কার শব্দ শুনতে পেল ওরা।
‘ডোন্ট মুভ,’ হুকুম করল জেনি।
জেনি নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করার পরপরই গুলি করল না দেখে অবাক পিংকি। তবে জেনিকে সামনে আসতে না দেখে বুঝতে পারল তার বান্ধবীটি এখনও দূরে কোথাও আছে যেখান থেকে গুলি করতে সমস্যা হচ্ছে। ও বুঝতে পেরেছে একেবারে নিঃশব্দে পিংকিদের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব নয়। সাদা পোশাকধারীর কথা মনে পড়ে গেল পিংকির। বলেছিল জেনিকে রিলোড করতে হবে। ওর কাছে বোধহয় আর বেশি গুলি নেই।
জিমের দিকে আড়চোখে তাকাল পিংকি। ও নিশ্চয়ই দৌড় দেয়ার মতলব করেছে কিন্তু কোথায় ছুটে পালাবে বুঝতে পারছে না। জেনির আর সাড়াশব্দ নেই, বৃক্ষসারি থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসছে, কাজেই বোঝা মুশকিল ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে সে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার যে কোন মানে হয়

না তা ঠিক বুঝতে পারছে পিংকি। কারণ পার্টিতেই জেনির আচরণ স্পষ্ট করে দিয়েছে সে জিমকে ছাড়বে না। জিম ভয়ে আধমরা।

'ভাগো,' হিসিয়ে উঠল পিংকি।

'না,' ওদের পেছন থেকে বলে উঠল জেনি।

পিংকি ঘুরতেই দেখল কাঁধের ওপরে শটগান তুলে নিয়েছে জেনি। ওদের কাছ থেকে আনুমানিক ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে সে, মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাছের কয়েকটি নিচু ডাল। এক কদম সামনে বাড়ল জেনি।

'যেখানে আছ সেখানেই থাকো,' বলল ও।

'দাঁড়াও,' চিৎকার করল পিংকি, এক লাফে জিমের সামনে এসে দাঁড়াল। আড়াল করল ওকে। দ্রুত এবং ঘনঘন শ্বাস করছে জিম, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পূর্ব লক্ষণ। আরেক কদম এগোল জেনি।

'পথ ছাড়ো, পিংকি,' শীতল কণ্ঠ জেনির।

'তুমি ওকে খুন করতে পারবে না। আমি খুন করতে দেব না।' গলা ফাটাল পিংকি। আশা করল ওর চিৎকার শুনে পুলিসের লোকগুলো বুঝতে পারবে ওরা কোথায় আছে। জেনি ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল।

'ওকে আমি হত্যা করবই।' বলল জেনি।

'কেন?' অনুনয়ের সুর পিংকির কণ্ঠে।

'কারণ ও মানুষ নয়,' বলল জেনি।

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল পিংকি। 'কী করছ ভেবে দ্যাখো।'

'আমি যা করছি জেনে বুঝেই করছি,' বলল জেনি। বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে বান্ধবীকে ইঙ্গিত করল পথ ছেড়ে দাঁড়াতে।

'সরো, পিংকি।'

'না।'

রেগে গেল জেনি। 'তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না। আমাকে কাজটা করতেই হবে। এটাই তোমার শেষ সুযোগ। হয় সরো নয়তো মরো।'

পিংকি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জিমকে। ওর পেছনে কুঁকড়ে মুকড়ে দাঁড়িয়ে আছে জিম, পিংকিকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এজন্য ওকে দোষ দিল না পিংকি। জিমের পেছনে গোচারণ ভূমি, কিন্তু এখন ছুটে পালানোরও সময় নেই। দশহাতও যেতে পারবে না তার আগেই ওকে দু'টুকরো করে ফেলবে জেনি।

জিমের জন্য জেনির কাছে কেন প্রাণভিক্ষা চাইছে না ভেবে নিজেরই অবাক লাগল পিংকির।

জেনির দিকে ফিরল ও, চোখে চোখ রাখল। জেনি আর মাত্র পনেরো ফুট দূরে। ওদের মাঝখানে আর কোন ডালপালা বাধা হয়ে নেই।

'তুমি আমার বন্ধু,' বলল পিংকি। 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি আমাকে খুন করবে।'

কী যেন ভাবছে জেনি। হয়তো পিংকির যুক্তিই শেষতক মেনে নেবে। তবে ওর শরীরের পেশীতে যখন ঢিল পড়তে শুরু করেছে এমন সময় জেনির আঙুল

শটগানের ট্রিগারে চেপে বসল শক্ত হয়ে।

'আমি দুঃখিত, পিংক,' জেনির কণ্ঠে সত্যি দুঃখের আভাস। 'পৃথিবীতে বন্ধুত্বের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার থাকে।'

ও গুলি করতে যাচ্ছে। আমি মারা যাব।

সত্যি যে এসব ঘটছে, বিশ্বাস হচ্ছে না পিংকির।

ও চোখ বুজল।

বিদায় জানাল পৃথিবীকে।

কিন্তু ওকে গুলি করল না জেনি।

'হোল্ড ইট!' ভেসে এল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'এক পা-ও নড়বে না।'

চোখ খুলল পিংকি। জেনি আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, পাথরের মূর্তি হয়ে। চোখ জোড়া ডানে-বামে নড়ছে। পিংকি কণ্ঠটি চিনতে পেরেছে। জিমদের বাড়িতে সাদা পোশাকধারী যে লোকটির সঙ্গে ও কথা বলেছিল এ সেই। তবে কণ্ঠটা কোন্‌দিক থেকে এল বোঝা যাচ্ছে না। লোকটা নিশ্চয়ই নিরাপত্তার খাতিরে আড়াল ছাড়ছে না।

'মাটিতে শটগান নামিয়ে রাখো,' আদেশ এল। 'ধীরে সুস্থে।'

জেনি মাথা না নাড়িয়েই দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে চারপাশে।

'ডু ইট।' দৃঢ় গলায় বলল অফিসার।

বুক ভরে দম নিল জেনি। ওর সাহস আছে। বলল, 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।' নির্বিকার গলায় বলল অফিসার। 'খুব ভালভাবে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।'

জেনির মাথা সামান্য হেলল ডানদিকে। পিংকি হঠাৎ বুঝে ফেলল লোকটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে–তৃণভূমির কিনারে, কতগুলো ঝোপের আড়ালে।

'ওকে বিশেষ কারণে আমি খুন করতে চাইছি।' বলল জেনি।

'বেশ,' ধৈর্য ধরে বলল অফিসার। 'শটগান ফেলে দেয়ার পরেও কারণটা তুমি আমাকে বলতে পারবে।'

'যদি না ফেলি?' জানতে চাইল জেনি। ঝোপের দিকে শাণিত দৃষ্টি। পিংকি ভয় পেল ভেবে জেনি ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি করতে পারে। পুলিস অফিসারকে সাবধান করে দিতে চেয়েও নিবৃত্ত করল নিজেকে। অফিসার নিশ্চয়ই নিজের বিপদ সম্পর্কে সচেতন।

'তাহলে আমি তোমার মাথায় গুলি করব,' বলল অফিসার। 'আমার হাতের টিপ খুব ভাল এবং কখনও মিস হয় না। শটগান নামিয়ে রাখো।'

'আমি জানি আপনি গুলি করবেন না,' বলল জেনি।

'আমি তোমাকে পাঁচ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'এক, দুই, তিন, চার।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলল জেনি। 'আমি বন্দুক রাখছি।'

'গুড,' বলল অফিসার। 'তবে কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না।'

জেনি ধীরগতিতে উবু হলো, শটগানটা বাড়িয়ে দিল সামনে। পিংকির বুক

ধুকপুক করছে। ও কেবলই ভাবছে জেনি বোধহয় এখুনি লোকটাকে গুলি করে বসবে। ঠিক তখন জেনি হাত থেকে ছেড়ে দিল অস্ত্র, নরম পাতার ওপরে পড়ল ওটা ধপ করে।

'এখন সিধে হও,' বলল অফিসার। 'হাতজোড়া মাথার পেছনে বাঁধো।'

হুকুম তামিল করল জেনি।

এবারে পুলিস অফিসারের চেহারা দেখা গেল। ডান হাতে রিভলভার। সে এতক্ষণ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

'থ্যাংক গড,' ফিসফিস করল জিম। ও পিংকির পাশ থেকে সরে গেল।

'কেউ নড়বে না!' চেঁচিয়ে উঠল অফিসার।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। জেনি ডাইভ দিয়ে পড়েছে একটা গাছের পেছনে। শটগানের তার দরকার নেই কারণ পার্টিতে সে এসেছিল পুরো প্রস্তুতি নিয়ে। তার ডান হাত শরীরের পেছনে চলে গেল, চোখের পলকে সেখানে ঝলসে উঠল একটি পিস্তল। পার্টিতে জেনির কাছে এ অস্ত্রটি দেখেনি পিংকি জেনি নিশ্চয়ই ওর শার্টের নিচে, কোমরে গুঁজে রেখেছিল ওটা।

পুলিস অফিসারও ঝাঁপ দিল মাটিতে যদিও জেনি তার দিকে ফিরেও তাকাল না। ও জিমকে চায়–শুধুই জিম। নিজের মগজে বুলেট ঢুকে যাওয়ার বিপদ আছে জেনেও সে জিমকে হত্যা করতে চাইছে। জিমকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল জেনি। কমলা রঙের ফুলকি ছুটল পিস্তলের মুখ থেকে। জিম একটা চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

আবার গুলি হলো–আবার চিৎকার। জেনির ডান হাতটা অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল। পুলিস অফিসার গুলি করেছে। গুলি লেগেছে জেনির হাতে। ছুটে গেল পিস্তল। ও ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল। তবে সে একা নয়। জিমও কাতরাচ্ছে ব্যথায়। পিংকির পায়ের কাছে বসে বাঁ হাঁটু ধরে গোঙাচ্ছে সে। যাক, তবু বেঁচে আছে জিম, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিংকি। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ধীর গতিতে সিধে হয়েছে পুলিস কর্মকর্তা।

তবে জেনির রাগ এখনও যায়নি। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে মাটিতে পড়ে থাকা পিস্তলটা তুলে নিতে ডাইভ দিল। পাতার ওপর দিয়ে সরীসৃপের মত সরসর করে এগিয়ে চলল। পুলিস কর্মকর্তা গুলি না করে ছুটে গেল ওর দিকে।

অন্ধকারে পিস্তল খুঁজে পেল জেনি। ডান হাতে তুলল। এ হাতেই গুলি খেয়েছে ও। ডান হাত থেকে বাম হাতে পিস্তল নিল জেনি। পুলিস অফিসার ওর কাছে চলে এসেছে এবং নিজে সহজ টার্গেট হওয়া সত্ত্বেও জিমের দিকে অস্ত্র তাক করল জেনি।

অস্ত্র তাক করা পর্যন্তই, আর কিছু করার সুযোগ পেল না জেনি। বেড়ালের ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে এসে পড়েছে পুলিস কর্মকর্তা। জেনির মাথার খুলিতে ধাঁই করে বসিয়ে দিল হাতের রিভলভার। খুলি ফাটার শব্দ শুনল পিংকি।

জেনির হাত থেকে খসে পড়ল অস্ত্র, এক মুহূর্ত চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল কর্মকর্তার দিকে। তবে ও বোধহয় আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কারণ পরমুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। পুলিস অফিসার পিংকি এবং জিমের

দিকে তাকাল।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল সে জিমকে।

'আমার পা ঠিক নেই,' কাতরাতে কাতরাতে জবাব দিল জিম।

কর্মকর্তা তার কোটের নিচে, হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রিভলভার, হাঁটু গেড়ে বসল জেনির পাশে, ওর মাথা পরীক্ষা করে দেখল।

'ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সে। 'ইট'স ওভার।'

কিন্তু পিংকির বিশ্বাস হলো না কথাটা। ভেতরে ভেতরে ভয়ে দিশেহারা ও। ওর ভেতরে একটা নিষ্ঠুর কণ্ঠ যেন বলে উঠল:

'মাই ডিয়ার, এটা মাত্র ঘটনার শুরু হলো।'

দুই

পরদিন সকাল দশটায় থানায় এসে হাজির হলো পল্লবী কেয়া পিংকি। ওকে ঘণ্টাখানেক আগে ফোন করে থানায় আসতে বলেছিল লেফটেনেন্ট নগুয়েন। এ সেই সাদা পোশাকের পুলিস কর্মকর্তা যে গতরাতে পিংকির জীবন বাঁচিয়েছে।

পাশের শহর বালটন থানা। এটি পিংকিদের শহরের চেয়ে আয়তনে পাঁচগুণ বড় এবং সৌন্দর্যে দশভাগের একভাগ। পিংকি গাড়ি চালিয়ে শহরে ঢুকেছে, দেখল থানার সামনে ভিড় করেছে সাংবাদিকরা। হাইস্কুলের পার্টিতে দুটি টিনেজ ছেলেমেয়ে খুন হয়েছে–শহরের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা এটি। নগুয়েন পিংকিকে থানার পেছনের রাস্তা ধরে আসতে বলেছে রিপোর্টারদের চোখ ফাঁকি দেয়ার জন্য। নগুয়েনের সঙ্গে কথা বলার আগে মিডিয়াকে কিছু বলা ঠিক হবে না পিংকির। এতে অবশ্য খুশিই হয়েছে পিংকি। ভয়ঙ্কর ঘটনাটার সে স্মৃতিচারণ করতে চায় না, খুনখারাবীর গল্প *পিপল* পত্রিকার কাছে বিক্রি করার খায়েশও তার নেই।

ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার পিংকিকে খিড়কির দুয়ার দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। নগুয়েনের অফিসে বসতে দিল ওকে। অপেক্ষা করতে লাগল পিংকি। সময় কাটাতে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছে। নগুয়েন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। ছবি দেখে বোঝা যায় বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে সে। লোকটার সঙ্গে যদিও স্বল্প পরিচয় পিংকির, কিন্তু তাকে বেশ সাহসী বলেই মনে হয়েছে ওর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ছবিগুলো দেখছে পিংকি, নগুয়েন ঢুকল অফিসে।

'আমার স্ত্রীর চাপে ছবিগুলো দেয়ালে টাঙাতে বাধ্য হয়েছি আমি,' পেছন থেকে বলল সে।

ঘুরল পিংকি। নগুয়েন বেঁটেখাট, তারের মত পাকানো শরীর, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, বড় বড় বাদামি চোখ। গতরাতে এ লোক মাঠে বেশ ছোটাছুটি করেছে। তখুন খেয়াল করেনি কিন্তু এখন লক্ষ করল লোকটির ডান পা বাম

পায়ের চেয়ে খাটো। হয়তো অতীতে কোন অ্যাক্সিডেন্টের কারণে এমনটি হয়েছে। পিংকি ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে দেখেও সে কিছু বলল না। লজ্জা পেয়ে গেল পিংকি, দ্রুত বলে উঠল, 'আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে অনেক গর্ব করেন।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল নগুয়েন। হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্য।

'তুমি এসেছ বলে আমি খুশি হয়েছে, পিংকি,' ওরা হাত মেলাল। নগুয়েনের হাত বেশ গরম, 'প্লিজ, বসো।'

'আমি এখনও বেঁচে আছি বলে খুশি,' বলল পিংকি।

নগুয়েনের ডেস্কের সামনে, একটি চেয়ার দখল করল। পুলিস কর্মকর্তা বসল ওর বিপরীতে। বেশ রিল্যাক্স লাগছে তাকে, একই সঙ্গে সতর্কও। পিংকির চোখে ভেসে উঠল দৃশ্যটি এ লোকটি গতকাল কীভাবে গুলি করে জেনির হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল পিস্তল। এ কোন সাধারণ লোক নয়, ভাবল ও। বলল, 'এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'আমি তোমাকে মানা করার পরেও ওদের পিছু নিতে গিয়েছিলে কেন?' অনুযোগ নয়, প্রশ্নের সুরে স্রেফ কৌতূহল।

'জেনি আমার বন্ধু,' কাঁধ ঝাঁকাল পিংকি। 'কী ঘটবে আমি জানতাম না।'

'ভয় পেয়েছিলে ও খুন হয়ে যেতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল নগুয়েন। 'ও আরেকটু হলে খুন হয়েই যাচ্ছিল।' একটু ভেবে বলল, 'তুমি খুব সাহসের কাজ করেছ। জেনি কি তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'ওর সঙ্গে মাত্র গত জুনে পরিচয় হয়েছে আমার। তবে তারপর থেকে বহুবার আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। আমরা দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। ওর মাথা আর হাতের কী অবস্থা?'

'গতরাতে ও হাসপাতালে ছিল তবে এখন হাজতে আছে। ডাক্তাররা বলেছেন ওর শরীরে সামান্য খিঁচুনি দেখা দিয়েছে। ওর হাতে তাঁরা ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন।' একটু বিরতি দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নগুয়েন। 'তবে আমার ধারণা ওর কিছু একটা হয়েছে। ওর কী হয়েছে বলতে পারবে?'

'না।'

'একদমই কিছু জান না?'

অসহায় একটা ভঙ্গি করল পিংকি। গলায় কমলালেবু সাইজের একটা ডেলা পাকাল, ঢোক গিলেও ওটাকে দূর করা গেল না। গতরাতে ওর ভাল ঘুম হয়নি–আসলে বলা উচিত দু'চোখের পাতাই এক করতে পারেনি। চোখ বুজলেই বন্দুক আর রক্ত ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। ঘুমাবে কী করে? আশি বছর বয়সেও এ ভয়ঙ্কর স্মৃতি ওকে তাড়া করে ফিরবে।

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' বলল পিংকি। 'জেনিকে গত কয়েকদিন খুব চুপচাপ থাকতে দেখেছি। কিন্তু ওর মধ্যে কোনরকম অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি।'

'যে ছেলেটাকে ও ধাওয়া করেছিল–জিম ক্লাইন, ও মেয়েটার বয়ফ্রেণ্ড, না?'

'হ্যাঁ। জিমের সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন?'

'হুঁ। আজ সকালেই কথা হয়েছে,' বলল নগুয়েন।

'ওর পায়ের অবস্থা কী?'

'ঠিক হয়ে যাবে। জিম আর জেনির মধ্যে কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'কী কারণে যেন জেনি ক'দিন ধরে জিমের সঙ্গে একটা দূরত্ব রেখে চলছিল। তবে আমাকে কখনও বলেনি যে জিমের সঙ্গে ওর কোনরকম মনোমালিন্য চলছে।'

'যে দু'জনকে ও খুন করেছে সেই কেথি বেকার এবং টড গ্রীনের সঙ্গে জেনির সম্পর্ক কীরকম ছিল?' জানতে চাইল নগুয়েন।

'যদ্দূর জানি এদের দু'জনকে তেমন একটা চিনত না জেনি।'

'কিন্তু ও এ দু'জনকে গুলি করেছে। ঠিক?'

'হ্যাঁ। এরপর ও জিমকে ধাওয়া করে।'

'জেনি কি অন্য কাউকে খুন করতে চেয়েছিল?' প্রশ্ন করল নগুয়েন।

'না।'

'জিম, কেথি এবং টডের মধ্যে কমন ব্যাপারটা কী?'

'গতরাতে এই একই প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছে,' জবাব দিল পিংকি। 'জিম এবং টড দু'জনেই ফুটবল টীমে আছে। কেথি একজন চিয়ারলিডার। তিনজনই জনপ্রিয়।'

নিজেকে সামলে নিল পিংকি। ও এমনভাবে কথা বলছে যেন টড এবং কেথি বেঁচে আছে। মাথা নামিয়ে বুক ভরে একটা শ্বাস নিল। নগুয়েন সহানুভূতির চোখে দেখল ওকে।

'মানুষ হত্যার দৃশ্য দেখা খুব কষ্টের,' মন্তব্য করল সে।

মুখ তুলে চাইল পিংকি। ভেজা ভেজা চোখ। 'যুদ্ধের সময় আপনি এরকম দৃশ্য অনেক দেখেছেন, না?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত সময় নিল নগুয়েন। 'যুদ্ধে এরকম দৃশ্য তো দেখতেই হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তবু এসব দৃশ্য দেখে সহ্য করা কঠিন।' জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। একটি ওয়্যারহাউসের পেছনের দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাও?' জিজ্ঞেস করল নগুয়েন।

'জেনি?'

'হ্যাঁ।'

পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল পিংকির। 'ও আপনার সঙ্গে কথা বলবে না?'

'না। বলেছে চুপ করে থাকার অধিকার তার আছে। এমনকী সে তার বাবা-মা'র সঙ্গেও কথা বলতে রাজি নয়।'

'ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা যাবে?'

'সন্দেহ আছে। তবে এজন্য উকিল লাগবে। ওর বাবা-মা বোধহয় বড় লোক?'

'হ্যাঁ। ওদের অনেক টাকা।' বলল পিংকি।

মাথা নাড়ল নগুয়েন। 'ভিক্টিমদের পরিবার প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে। কাজেই বাইরের চেয়ে জেলের ভেতরেই বেশি নিরাপদে থাকবে জেনি। ওকে কথাটা বলে দিয়ো।'

'ওরা প্রতিশোধ নিতে পারে?'

'বলা যায় না।'

'ওর সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব?' জানতে চাইল পিংকি।

'জিজ্ঞেস করতে পার ও কেন করল কাজটা। এটুকু জানতে পারলেই সাহায্য হবে।'

পিংকি নিজের জুতোর দিকে তাকাল। পার্টিতে যে জুতো পরে গিয়েছিল এজোড়া তা নয়। ওজোড়া ছিঁড়ে গেছে। জুতো জোড়া ফেলে দিয়েছে পিংকি। কিন্তু ও জানে ওই জুতো থেকে রক্তের দাগ মুছবে না।

'কার সাহায্য হবে?' নরম গলায় প্রশ্ন করল ও।

'যে কারও সাহায্য হতে পারে,' বলল নগুয়েন।

নগুয়েন পিংকিকে ছোট, ধূসর রঙের বাক্স আকৃতির একটি ঘরে নিয়ে এল। ছাদে ম্লান আলো ছড়াচ্ছে ফ্লুরেসেন্ট বাতি। নগুয়েন জানাল সে জেনিকে নিয়ে আসছে। বান্ধবীর সঙ্গে একান্তে কিছু সময় কাটাতে পারবে পিংকি। সে বসে বসে জেনিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে লাগল। সে সব বড় সুখের দিন ছিল।

এ শহরে পিংকি এসেছে তখন বড় জোর সপ্তাহখানেক হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে শহরের বাইরে থাকছে সে দিন সাতেক ধরে। ওর দাদুর বাড়ি শহর থেকে দূরে, লেকের একেবারে শেষ মাথায়। প্রীতম চৌধুরী আমেরিকায় এসেছেন পঞ্চাশের দশকে। পয়েন্ট লেক শহরে থাকছেন বহুদিন। তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি হলেও এখনও যথেষ্ট তাগত রাখেন শরীরে। পিংকির বাবার জন্ম ডালাসে। পুরোপুরি আমেরিকান জীবন যাপনে অভ্যস্ত তিনি। তাঁর একটাই মেয়ে–পিংকি। নামটা রেখেছেন প্রীতম চৌধুরী। পিংকির বাবা আরিয়ান চৌধুরী পেশায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। শিকাগোতে তাঁর নিজস্ব ফার্ম আছে। সেক্রেটারি হেলেনাকে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। তবে তাঁদের দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। বাবা-মায়ের সংসারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল পিংকি। হোস্টেলে চলে গিয়েছিল ও। বাবা-মা'র ডিভোর্সের পরে, দাদুর অনুরোধে পয়েন্ট লেক নামের এ ক্ষুদ্র, মফস্বল শহরে চলে আসে সে। দাদু বেশ মজার মানুষ। নানান চ্যারিটি নিয়ে আছেন। ব্যবসা করে টাকা জমিয়েছেন। ব্যাংক থেকে যে সুদ পান তাতে দিব্যি চলে যায় তাঁর। নাতনি আসার পরে তার নামে অ্যাকাউন্ট খুলে বেশ কিছু টাকা জমা রেখেছেন। পিংকির যখন প্রয়োজন হয়, নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নেয় টাকা। দাদু নাতনির স্বাধীন জীবন যাপনে একটুও বাধা দেন না। ফলে দারুণ কাটছিল ওর জীবন। একা একা লেকের জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করত। আর একদিন একাকী ঘুরে বেড়াতে গিয়ে জেনির সঙ্গে তার পরিচয়।

জেনি নাচছিল। স্কিন টাইট সবুজ লিওটার্ড আর টাইটস পরে, বুম বক্সে পুরো ভলিউমে মিউজিক চালিয়ে উদ্দাম গতিতে নাচছিল সে। পিংকি জেনিকে

দেখছিল অপলক চোখে। বৃক্ষসারির মাঝে ঘুরে ঘুরে এমন স্বচ্ছন্দে নাচছিল জেনি, মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পিংকি। তার নাচ যেন একটি শিল্প, যেন এক গ্রীক দেবী মনের আনন্দে নেচে চলেছে।

অবশেষে যখন কথা বলে ওঠে পিংকি, নাচ থামিয়ে দেয় জেনি, ওকে জঙ্গলের মধ্যে দেখে বড় বড় হয়ে যায় চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয় মিউজিক। তবে ও রেগেও যায়নি কিংবা বিব্রতও হয়নি। স্রেফ পিংকিকে বলেছিল, 'তুমি এখানে নতুন এসেছ, তাই না? আমার নাম জেনি।'

আমার বন্ধু হবে?

না, একথা বলেনি জেনি তবে বলতে পারত। প্রথম দিনেই ওদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতায় মোড় নেয়।

এরকম আত্মবিশ্বাসী মেয়ে দুটি দেখেনি পিংকি। আর জেনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের, যা বলে বা করে সব ভেবে-চিন্তে, দেখেশুনে। শুধু দুর্দান্ত নাচতেই জানে না জেনি, সে ছবি আঁকতে পারে, গান জানে, পারে বাঁশি বাজাতে এবং বলেছিল—পারে দারুণভাবে বিছানায় ঝড় তুলতে। জিম, বলেছিল জেনি, বিছানার সঙ্গী হিসেবে নাকি অতুলনীয়।

তিন মাস আগে জিমই ছিল জেনির চোখে একমাত্র স্বপ্নপুরুষ।

আর গতরাতে সে এ স্বপ্নপুরুষকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ জেনিকে দোরগোড়ায় দেখা গেল, সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিস। সে জেনিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পিংকির কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে একটি চেয়ারে বসানো হলো জেনিকে। ধাতব চেয়ার, মেঝের সঙ্গে আঁটকানো। জেনির হাতে হাতকড়া। ইতিমধ্যে তাকে জেলখানার পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ধূসর রঙের শার্ট এবং প্যান্ট। অপরিষ্কার। ঢলঢল করছে গায়ে। একরাতের মধ্যে প্রিয় বান্ধবীর চেহারার দশা দেখে শিউরে উঠল পিংকি।

জেনি দেখতে বেশ সুন্দরী। তার কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। তবে ওকে আর দশটা মেয়ের থেকে আলাদা করে রেখেছে ত্বকের উজ্জ্বল, মসৃণ ভাবটা। ওর শরীর যেন মোমের মত, আলো পড়লে পিছলে যায়। জেনির চোখ বড় বড়, টলটলে সবুজ। আর ফিগার? ওর যৌবন দেখলে যে কোন বয়সের পুরুষ টাশকি খেয়ে যাবে। বেদিং সুট পরা, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতার, ৩৬-২৬-৩৬ শরীরের ৫৫ কেজি ওজনের জেনি বার্টন যে কোন পুরুষের হৃৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে বান্ধবীর চেয়ে পিংকির গড়ন একটু মোটার দিকে। ৬২ কেজি ওজন। তবে ইদানীং ওজন আরেকটু বাড়তে শুরু করেছে। এর কারণ ঘন ঘন খাদ্য গ্রহণ।

কিন্তু আজ জেনিকে দেখার পরে পিংকি সারা দিনেও কিছু মুখে তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। জেনির মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ। ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করতে গিয়ে তালুর কাছ থেকে কয়েক গাছি চুল ছেঁটে ফেলা হয়েছে। জেনির ডান হাতের কব্জিতেও ব্যাণ্ডেজ। এক রাতের মধ্যেই ওর আপেল রঙা গাল দুটো চুপসে, তুবড়ে ভেতরে ঢুকে গেছে।

জেনি চেয়ারে বসে লাল টকটকে চোখ মেলে তাকাল পিংকির দিকে।

‘ওয়েল,’ বলল পিংকি।
‘ওয়েল,’ বিড়বিড় করল জেনি।
‘মাথার কী অবস্থা?’
‘জানি না।’
‘ব্যথা করে?’ জানতে চাইল পিংকি।
‘জানি না।’
‘কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?’
‘অল্প। তোমার?’
‘অল্প,’ জবাব দিল পিংকি।
‘ভাল। এখানে কী করছ?’
‘তোমাকে দেখতে এসেছি।’
‘আমি ঠিক আছি। আর কিছু?’
‘ইয়াহ্।’
‘কী?’ প্রশ্ন করল জেনি।
‘তুমি জানো কী। কী হয়েছিল?’
কাঁধ ঝাঁকাল জেনি। ‘তুমি ওখানে ছিলে। সবই তো দেখেছ।’
‘আমি তা বলিনি। আমি কী বলতে চাইছি তুমি ঠিকই বুঝতে পারছ। কেন কাজটা করলে?’
বিরক্ত দেখাল জেনিকে। ‘বললেও আমার কথা বিশ্বাস করবে না।’
‘করব।’
‘না।’
‘কেন নয়?’
‘তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না সেজন্য।’
‘জেনি, তুমি দু’জন মানুষকে হত্যা করেছ। আরেকজন, জিমকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলে। তোমার কেমন লাগছে?’ মেঝেয় চোখ নামাল জেনি। ‘আমার কিছুই লাগছে না।’
‘কিছুই না? অনুশোচনাও হচ্ছে না? খোদা, তুমি জান তুমি ওদের পরিবারের কী দশা করেছ?’
দম নিল জেনি। ‘ওদের পরিবারের জন্য আমার খারাপ লাগছে। অনুশোচনাও হচ্ছে।’
ফোঁস করে শ্বাস ফেলল পিংকি। ‘জানতাম তোমার অনুশোচনা হবে।’
‘আমার অনুশোচনা হচ্ছে এজন্য যে জিমকে আমি হত্যা করতে পারিনি।’
ধৈর্যচ্যুতি ঘটল পিংকির। ‘কেন? জিম তোমার কী করেছে?’
ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল জেনি। ‘ও আমার কিছু করেনি।’
বিরতি দিল পিংকি। ‘তাহলে অন্য কারও কোন ক্ষতি করেছে?’
‘এসব কথা বলে লাভ নেই, পিংকি।’
‘না, আমাকে বলতেই হবে জিম কী করেছে,’ একগুঁয়ে গলায় বলল পিংকি।

তিক্ত হাসি ফুটল জেনির ঠোঁটে। 'তুমি যদি জানতে ও কী করেছে।'

গতরাতে, জেনির একটা মন্তব্য মনে পড়ে গেল পিংকির।

'কারণ ও মানুষ নয়।'

'মানুষ নয়,' বিড়বিড় করল পিংকি।

চমকে গেল জেনি। 'কী বললে?'

'তুমি গতরাতে বলেছিলে জিম মানুষ নয়।'

'না, আমি বলিনি।'

'কথাটা আমি নিজে তোমার মুখে শুনেছি, জেনি। অস্বীকার কোরো না। কেন বলেছিলে কথাটা?'

মুখ শুকিয়ে পেল জেনির, কুঁচকে উঠল গাল। চেহারা দেখে মনে হলো ভয় পেয়েছে। জেনি মুখ ঘুরিয়ে নিল, হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখ।

'কারণ কথাটা সত্যি,' বলল ও।

পিংকি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, জেনির বাহু স্পর্শ করল। 'কী সত্যি? ও কী করেছে?'

শ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে জেনির। 'ভয়ঙ্কর সব কাজ।'

'বলো আমাকে?'

ধীরে ধীরে মাথা তুলল জেনি। 'আমার কথা বিশ্বাস করবে না তুমি,' এ নিয়ে তৃতীয়বার বলল সে।

'করব। বলো, প্লিজ।'

নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছে জেনি। ভাবছে। তবে স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা নয়। অন্যমনস্ক দৃষ্টি, চাউনিতে ভীতি।

'টড এবং কেথি,' অবশেষে বলল ও, 'ওরাও আর মানুষ ছিল না। এজন্য ওদেরকে হত্যা করেছি আমি।'

'ওরা অমানুষিক কোন কাজ করেছে? কাউকে মেরেছে?'

'আমি বলতে চাইছি ওরা আর তোমার-আমার মত ছিল না।'

জেনির কথা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না পিংকি।

'তাহলে ওরা কী ছিল?'

জেনির নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল। 'ওরা ছিল দানব!'

তিন

'জেনি?'

হাসল জেনি। ঠোঁটটা বিকৃত ভঙ্গিতে বেঁকে গেল।

'জানতাম কথাটা বিশ্বাস করবে না।'

'না। আমাকে সব কথা খুলে বলো। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জেনি হেলান দিল চেয়ারে, স্থির দৃষ্টি রাখল পিংকির চোখে। 'শুরু থেকে শুনতে চাও?'

'চাই।'

'কিন্তু খামোকা সময় নষ্ট হবে।'

'নষ্ট করার মত অনেক সময় আমার হাতে আছে।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল জেনি। তারপর চোখ মেলে তাকিয়েই কথা বলতে শুরু করল। ওর গলার স্বর বদলে গেছে। নরম এবং সহজ গলায় কথা বলছে যেন এক মস্ত বিয়োগান্ত ঘটনার স্মৃতিচারণ করছে।

'সেপ্টেম্বরের শুরুতে, স্কুল খোলার আগে চিয়ারলিডার আর ফুটবল খেলোয়াড়রা কীভাবে প্র্যাকটিস করে তুমি জানো।' বলল জেনি। 'রুটিনমাফিক চলে কাজ এবং খেলা। প্রতি বছরই এরকম হয়ে আসছে। এ বছর আমি জিমের প্রেমে পড়ে যাই সে কথা তো তুমি জানোই। মাঝে মাঝে খুব বোর হয়ে গেলে সকাল বেলা গাড়ি চালিয়ে স্কুলে চলে যেতাম ওদের প্র্যাকটিস দেখতে। মেয়েদের কাজও দেখতাম,' কাঁধ ঝাঁকাল জেনি। 'ওইসময় আমি একটা ক্লু পেয়ে যাই।'

'কীসের ক্লু?' জানতে চাইল পিংকি।

ভুরু কোঁচকাল জেনি। যেন সেই সময়ের কী একটা কথা মনে করার চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারছে না। 'আমি ছেলেদের খেলা দেখতাম। দেখতাম জিম আর টড কীভাবে খেলছে। ওদের খেলার ধরনটা কেমন অস্বাভাবিক লাগত আমার কাছে। অবশ্য অ্যাথলেট হিসেবে ওরা সবসময়ই তুখোড়। তবে আমার মনে হত ওরা যেন বড্ড বেশি ভাল খেলছে। টড ছিল লাইন বেকার, জিম খেলত কোয়ার্টার ব্যাকে। জিম একবার টডকে বল দিলে তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। ও কাউকে ডজ দেয়ার প্রয়োজন বোধও করত না। তার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে সে স্রেফ বাধা সরিয়ে এগিয়ে যেত। ওর ধাক্কা খেয়ে চিৎপটাং হয়ে যেত অন্যান্য খেলোয়াড়রা। টডের গায়ে এমনই শক্তি, যেন লোহার তৈরি শরীর। জিম বল পাস করত একদম সোজাসুজি। আর এত জোরে বল ছুঁড়ত যে চোখেই দেখা যেত না। কেউ বল ঠেকানোর চেষ্টা করলে প্রচণ্ড আঘাতে সে পড়ে যেত মাটিতে। ভীষণ ব্যথা পেত সে। কোচদের চোখে এ ধরনের বল ছোঁড়া চমৎকার মনে হলেও আমি লক্ষ করতাম বলের আঘাতে ভূলুণ্ঠিত খেলোয়াড়রা হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সিধে হচ্ছে। তারা আর খেলায় অংশ নিতে চাইত না।'

'ফুটবল প্র্যাকটিসে এরকম ঘটনা ঘটেই থাকে,' বলল পিংকি।

বান্ধবীর মন্তব্য গায়ে মাখল না জেনি। 'তারপর মেয়েদের কথাই ধরো। কেথি ছিল প্রধান চিয়ারলিডার। আমি স্কোয়াড প্র্যাকটিস দেখতাম। দেখতাম মেয়েরা পিরামিডের মত কিছু বানাচ্ছে। আর কেথি যেন হাওয়ায় ভেসে এসে, ডিগবাজি খেয়ে একেবারে মেয়েদের মাথার ওপরে উঠে পড়েছে। এক লাফে দশ ফুট উচ্চতায় ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়।'

'তা সম্ভবও নয়।'

জেনি বলে চলল, 'আমি ওদের তিনজনের ওপর লক্ষ রাখছিলাম–জিম, টড এবং কেথি। তোমার কাছে ব্যাপারটা হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে। কারণ শত হলেও জিম ছিল আমার বয়ফ্রেণ্ড। অবশ্যই ওর ওপর নজরদারী করার আমার কোন প্রয়োজন ছিল না–কারণ সবসময়ই তো ওর সঙ্গে আমার দেখা হত। তবে সত্য এটাই যে আমি ওর সঙ্গে খুব একটা বেশি ঘুরতে যেতাম না। ও-ও তেমন প্রয়োজন না হলে আমাকে ফোন-টোন করত না। আর যখন ওর কাছে আসতাম, কেমন উদাসীন মনে হত ওকে। তবে ওসব নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। আমি দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম ও কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল ভেবে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমি। জিম সবসময় একই জিনিস বা বিষয় নিয়ে কথা বলত। কেউ যদি কোন কিছুতে বিশ্বাস না করে এবং সে বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত কথা বলতে থাকে তখন তোমার অস্বস্তি লাগতেই পারে, তাই না? বিশেষ করে সে বিষয়ে যদি তার আগ্রহ না থাকে।'

'হুঁ।'

'আমি বুঝতে পারছিলাম জিম আমাকে মুখস্থ বুলির মত প্রেম-ভালবাসার কথা আউড়ে যাচ্ছে কারণ আমি ওর কাছ থেকে এগুলো আশা করছিলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত–বাবা-মা বাড়িতে না থাকলে আমরা বিছানায় যেতাম। কিন্তু ও যেন আমার সঙ্গে থেকেও থাকত না। ওর অস্তিত্ব টের পেতাম না।'

'তো?' বলল পিংকি। 'ও তোমার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল, তাই তো? এজন্য আমি দুঃখিত, জেনি। কিন্তু এরকম তো আকছার ঘটছে। এতেই প্রমাণ হয় না যে ও একটা দানব।'

অসহিষ্ণু দেখাল জেনিকে। 'বললাম তো ওকে আমার অন্যরকম, বদলে যাওয়া একটা মানুষ মনে হচ্ছিল। আর আমি যা বলছি ভেবে-চিন্তেই বলছি কারণ আমি ওকে চিনি। ওর মন, ওর অন্তর–আমি ওর সঙ্গে আছি কিন্তু মনে হত নেই।'

'তাহলে ওর মন-অন্তর কোথায় যেত?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'ওগুলো চলে যেত অনেক দূরে।'

মাথা নাড়ল পিংকি। 'তুমি কী বলতে চাইছ আমার মাথায় ঢুকছে না। জিম যদি তোমার সঙ্গে উদাস আচরণই করত তাহলে ওর প্র্যাকটিস দেখতে যেতে কেন?'

'ভাল প্রশ্ন। আমি যেতাম কারণ ও যে বদলে গেছে তার প্রমাণ আমার দরকার ছিল।'

'জেন!'

'আমাকে বলতে দাও। হপ্তা দুই আগের কথা–আমি কয়েক মিনিটের জন্য গিয়েছিলাম প্র্যাকটিস দেখতে। ভুলে আমার পার্সটা ফেলে যাই। ফিরে আসি ওটা নিতে। এসে দেখি মাঠে কেউ নেই, চিয়ারলিডাররাও অদৃশ্য। লক্ষ করি ওয়েট রুমের দরজা খোলা, আমি সেদিকে এগিয়ে যাই। ওই সময় জিমের সঙ্গে আমার সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে, আমি ওয়েট রুমে ঢুকিনি, শুধু উঁকি

মেরেছিলাম। হ্যাঁ, অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাব বলে প্রত্যাশা ছিল আমার। এবং আমি তা দেখলাম।'

'কী দেখলে?' জানতে চাইল পিংকি।

'কেথি, টড এবং জিমকে দেখলাম ঘরে। ওয়েট লিফটিং করছে। চিয়ারলিডারদেরকে তুমি কখনও ভারোত্তোলন করতে দেখেছ? আমি দেখিনি, তবে এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। কিন্তু কেথিকে যা করতে দেখলাম তা রীতিমত অস্বাভাবিক। অল্প কয়েক পাউণ্ড নয় সে কমপক্ষে এক হাজার পাউণ্ড ওজন নিয়ে ওয়েট লিফটিং করছিল।'

'এ অসম্ভব,' বলল পিংকি।

'তা তো বটেই। কিন্তু কাজটা আমি ওকে করতে দেখেছি।'

'বার-এর ওজন নিরূপণে বোধহয় তুমি গোলমাল করে ফেলেছ।'

'না। বরং কেথি ওজনটা তোলার পরে বারটা বাঁকা হয়ে যায়। এতটাই ওজন ও ওটার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। ধাতব ওই বারগুলোতে কতটা ওজন চাপানো হলে ওগুলো বেঁকে যেতে পারে ভাবতে পারো? ওই কেথি কতটা শক্তি ধরত শরীরে ভেবে দেখো!'

'জিম এবং টডও কি একই ওজন নিয়ে ওয়েট লিফটিং করছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না। ওরা ব্যস্ত ছিল মেশিন নিয়ে। মেশিনগুলো খুব স্বচ্ছন্দে ওরা পুশ করছিল, ওদের শরীর ঘামতে দেখিনি আমি। মজার ব্যাপার কি জানো, কেথি যখন হাজার পাউণ্ডের ওজন তুলছিল ওরা কিন্তু মেয়েটার দিকে একবার ফিরেও তাকায়নি। আমি যতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একজনকেও একটা শব্দ উচ্চারণ করতে শুনিনি। লাশ কাটা ঘরের মত সুনসান এবং নীরব ছিল পরিবেশ।'

পিংকি বলল, 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' টেবিলের ওপর ঝুঁকে এল জেনি। পিংকি ঘটনা শুনে প্রভাবিত হবে, এরকম কোন ভরসা নিয়ে ও গল্প শুরু করেনি। কিন্তু এখন ওর ভেতরে সে আশাটা জেগেছে। ও চাইছে গল্পটা পিংকি বিশ্বাস করুক। 'ওয়েট রুমের ওই ঘটনার পরে আমি ওদের ওপর নজর রাখতে শুরু করি। লক্ষ করি ওরা সবসময় একত্রে চলাফেরা করছে। ওরা ক্যাম্পাসের নির্জন কোণে গিয়ে কথা বলে। খেয়াল করি ওদের কাছেপিঠে কেউ না আসা পর্যন্ত ওরা হাসে না পর্যন্ত। আমি ততদিনে জিমের সঙ্গে বাইরে ঘোরা বন্ধ করে দিয়েছি। তবে রাতের বেলা গাড়ি নিয়ে ওর বাড়ির সামনে যেতাম, রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে বসে থাকতাম।'

'কীসের জন্য?' জানতে চাইল পিংকি।

'দেখতে যে ও কখন বাড়ি থেকে বেরুবে এবং অদ্ভুত বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠবে খেলায়।'

'তুমি এমনভাবে বলছ যেন ওরা সবাই ভ্যাম্পায়ার।'

আঁধার ঘনাল জেনির চোখে। 'ওরা ভ্যাম্পায়ারের চেয়েও খারাপ। এক রাতে আমি জিমের বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছি–তখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে–সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে বসল। স্টার্ট দিল গাড়ি। আমি ওর

পিছু নিলাম। জিম রাস্তা থেকে তুলে নিল টড এবং কেথিকে। ওরা এখানে, বালটনের একটি বার-এ চলে এল। ভেবেছিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে বার-এ ওদেরকে ঢুকতে দেয়া হবে না। কিন্তু ওরা রাত দুটো পর্যন্ত ওখানে থাকল। বেরিয়ে এল দুটি জুটিকে নিয়ে। ওই জুটির বয়স ২২/২৩ হবে। সবাই খুব হাসাহাসি, ঠাট্টা-তামাশা করছিল। ওদেরকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মদ খেয়ে বেহেড মাতাল। রাস্তার ওপারে সারারাত খোলা থাকা একটি কফির দোকানে আমি বসেছিলাম। ওদের সব কথা আমি বুঝতে পারিনি তবে পার্টি, নিষিদ্ধ আনন্দ, ওয়্যারহাউস ইত্যাদি শব্দগুলো আমার কানে ভেসে আসে। জিম, টড এবং কেথি ওই দুই জুটিকে ওদের সঙ্গে কোথাও যাবার জন্য সাধাসাধি করছিল। তরুণ-তরুণীদেরকে ওরা পটিয়েও ফেলে কারণ দেখলাম দুই জুটি তাদের গাড়িতে উঠল এবং জিমের গাড়ির পেছন পেছন যেতে থাকল। আমি দ্রুত ওদের পিছু নিলাম। জিম শহরের উপকণ্ঠ অভিমুখে গাড়ি ছোটাচ্ছিল। সে নির্জন একটি ওয়্যারহাউসের সামনে এসে গাড়ি থামাল। ওয়্যারহাউসটা কাঠের তৈরি। জুটিদের গাড়ি এসে থামল জিমের গাড়ির পাশে। ওরা তখনও খুব হাসাহাসি করছে এবং জোরে কথা বলতে বলতে জিম, টড আর কেথির সঙ্গে ওয়্যারহাউসের ভেতরে ঢুকে গেল।

'ওয়্যারহাউসটা না কাঠের তৈরি?' জিজ্ঞেস করল পিংকি। 'ওরা ঢুকল কী করে?'

'জিম একটা ক্রো বার দিয়ে দরজার তক্তা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছে।'

'ওর গায়ে যদি এতই শক্তি তাহলে খালি হাতে দরজা ভাঙল না কেন?'

'বোধহয় তখন শক্তি প্রদর্শন করতে চায়নি।'

'ওরকম নির্জন একটা ওয়্যারহাউসে কেউ একা যায়? দুই জুটি কী করে ভাবল ওরকম একটা জায়গায় পার্টি হতে পারে? কী বোকা ওরা!'

'বললামই তো ওরা পাঁড় মাতাল ছিল,' বলল জেনি। 'আর জিম, টড এবং কেথির নিষ্পাপ এবং মিষ্টি চেহারা দেখে বোঝার সাধ্য কী ওদের মনে শয়তানী আছে। সে যাকগে, আসল কথা হলো ওরা সবাই ভেতরে গিয়েছিল। আমি দূরে গাড়িটা পার্ক করে রেখে কতগুলো কাঠের বাক্সের পেছনে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওদের নির্গমনের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা এল। জিম, টড এবং কেথিকে ওয়্যারহাউস থেকে বেরুতে দেখলাম—অন্যদেরকে নয়।'

'অন্যদের কী হলো?' জানতে চাইল পিংকি।

আরেক ইঞ্চি সামনে ঝুঁকল জেনি। 'ওরা খুন হয়েছে। আমাদের নিষ্পাপ, মিষ্টি চেহারার বন্ধুরা তাদেরকে হত্যা করেছে।'

'তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

পিঠ খাড়া করল জেনি, সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা বিতৃষ্ণা নিয়ে নাড়ল। 'আমি সরাসরি ওদেরকে খুন হতে দেখিনি। কারণ আমি ছিলাম বাইরে। কিন্তু জিম, টড এবং কেথিকে আবর্জনা ফেলার সবুজ রঙের বড় বড় প্লাস্টিক ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। তিনটে ব্যাগ ছিল তিনজনের কাঁধে। ওরা

ব্যাগগুলো জিমের গাড়ির ট্রাংকে ছুঁড়ে ফেলে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। ব্যাপারটা আমাকে বিস্মিত করে। আমি আমার গাড়িতে গিয়ে একটা ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে আসি। ফিরে আসি ওয়্যারহাউসে, পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ি ভেতরে। জায়গাটা জনশূন্য, ধুলোয় ভরা। আমি ওদেরকে ডাক দিই। কিন্তু কারও কোন সাড়া পাই না। হঠাৎ মেঝেতে আমার নজর আটকে যায়। দেখি একটা জায়গার ধুলো অদৃশ্য।' বিরতি দিল জেনি, চোখ বুজল। গভীর দম নিল সে, তারপর আরেকবার, কিন্তু নিঃশ্বাস ফুসফুস থেকে ছেড়ে দিল না। সামনে ঝুঁকে এল।

'কী দেখলে তুমি?' প্রশ্ন করল পিংকি।

চোখ মেলল জেনি। মাথা নাড়ল। 'রক্ত।'

'রক্ত?'

'রক্ত,' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকাল জেনি, বোধহয় ওর হাতে লেগে থাকা রক্তের কথা চিন্তা করছে। 'কংক্রিটের মেঝে থেকে বেশিরভাগ রক্ত মুছে ফেলা হয়েছিল। ওরা সতর্ক ছিল, তবে খুব বেশি সাবধানে কাজটা করতে পারেনি। মেঝেতে তখনও রক্ত লেগে ছিল।'

'কোন লাশ দেখোনি?'

'না,' জবাব দিল জেনি।

'ছেঁড়া জামা-কাপড়? রক্তমাখা পোশাক?'

'না,' ক্লান্ত চোখ ওপরে তুলল জেনি। 'আমার ধারণা আমাদের প্রিয় ক্লাসমেটরা সবুজ গারবেজ ব্যাগে ভরে জামা-কাপড়গুলো নিয়ে গেছে।'

'ব্যাগগুলোতে কি দুই জুটির লাশ ছিল?' বলল পিংকি।

'না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ লাশ লুকোবার মত বড় ব্যাগ ওগুলো ছিল না।'

'তাহলে লাশ—তুমি কী বলতে চাইছ, জেনি?'

জেনি প্রিয় বান্ধবীর চোখে চোখ রাখল। 'ওরা দানব। আর দানবরা ডিনারে কী খায়?'

আতঙ্ক বোধ করল পিংকি। 'ওরা নিশ্চয়ই ওদেরকে খেয়ে ফেলেনি, ফর গড'স সেক।'

'ওই চারজনকে নিয়ে ওরা যা করেছে তাতে গডের কিছু করার ছিল না।'

'জেন!'

'সাতজন মানুষ ওই ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিল, পিংক। শুধু তিনজন বেরিয়ে এসেছে।'

এবারে পিংকির চোখ বুজে মাথা নাড়ার পালা। মাথা ঝাঁকিয়ে যদি মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত গল্পটা বের করে দেয়া যেত, ভাবছে ও। ভয়ঙ্কর ছবিগুলো ওর মাথায় গেঁথে দিয়েছে জেনি। আসুরিক শক্তি, পৈশাচিক খিদে। এসব গল্প শোনাচ্ছে যে মেয়েটি সে মাত্র বারো ঘণ্টা আগে দু'জন মানুষকে হত্যা করেছে। এরকম একটি মেয়ের কথা কি পিংকি বিশ্বাস করবে না করা উচিত? মাথাটা ঠিক রাখতে হলে এ গল্প বিশ্বাস করার প্রশ্নই নেই।

জেনি আসলে উন্মাদ হয়ে গেছে। ও যে কাণ্ডটি করেছে তা এখন আর মেনে

নিতে পারছে না বলেই এ কল্প-কাহিনী তৈরি করেছে। দানব বলে কিছু নেই। দানব-রাক্ষস-ভূত-প্রেত ইত্যাদি থাকে শুধু রূপকথার বইয়ের পাতায়।

চোখ মেলে চাইল পিংকি। 'পুলিসের কাছে সোজা চলে গেলে না কেন তুমি? যা দেখেছ ওদেরকে কেন বলনি?'

'ওই চারজনকে যে জিম, টড এবং কেথি হত্যা করেছে তা আমি প্রমাণ করতে পারতাম না বলেই পুলিসের কাছে যাইনি।'

'কিন্তু বার-এর লোকেরা তো সাক্ষ্য দিত ওরা সবাই একসঙ্গে ওখান থেকে বেরিয়েছে। ওয়্যারহাউসের মেঝেতে তুমি রক্তের দাগও দেখেছ।'

'আমি বার-এ গিয়েছিলাম–কিন্তু মালিক ওদের কথা মনে করতে পারেনি। কারণ ওরকম বহু তরুণ-তরুণী তার বার-এ আসে। সে সবাইকে চিনে রাখে না। আর কয়েকদিন পরে সেই ওয়্যারহাউসেও আমি যাই। গিয়ে দেখি মুছে ফেলা হয়েছে রক্তের দাগ।'

'কিন্তু কে মুছল?'

কাঁধ ঝাঁকাল জেনি। 'হয়তো ওরাই। বোধহয় ওরা সন্দেহ করেছিল ওদের পিছু নেয়া হয়েছে।'

'এরকম মনে হওয়ার কারণ?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'এটা স্রেফ আমার একটা ধারণা। পরে যখন আবার জিমের সঙ্গে আমার দেখা হয়, ও কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।'

'ওয়্যারহাউসের নাম কী?'

'ওটার কোন নামফলক আমার চোখে পড়েনি।'

'ঠিকানাটা জানো?'

'না,' বলল জেনি। 'তবে আমি তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারব।'

'ম্যাপ এঁকে দিতে পারবে?' বলল পিংকি।

'মনে হয় না।'

মাথা ঝাঁকাল পিংকি। নিজের গল্প সত্য বলে প্রমাণ করার প্রতিটি সুযোগ কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে জেনি। আসলে পুরোটাই ওর বানানো।

'তুমি যা দেখেছ তা সত্যি বলে বিশ্বাস করলে পুলিসের কাছে তোমার যাওয়া উচিত ছিল,' বলল পিংকি।

রেগে গেল জেনি। 'ওদেরকে গিয়ে কী বলতাম আমি? বলতাম যে একটি ছোট্ট, মিষ্টি চিয়ারলিডার হাজার পাউণ্ডের ওজন নিয়ে লোফালুফি করছে? বলতাম যে আমার সাবেক বয়ফ্রেণ্ড মানুষ ধরে ধরে খায়? এসব কথা বললে তোমার চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে তার চেয়ে অনেক দ্রুত ওরা আমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে থানা থেকে বের করে দিত।'

'জেনি,' ধৈর্য ধরে বলল পিংকি। 'এখন তোমাকে কেউ গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে না।'

শান্ত গলায় বলল জেনি, 'আমার যা করার দরকার ছিল তা আমি করেছি। সময় থাকতে ওদেরকে বাধা দেয়া উচিত ছিল।'

'মানে?'

ফুঁসে উঠল জেনি। 'মানে কিছু না।'

'অনেক কথাই তো বললে। বাকিটাও বলে ফেলো শুনি।'

'কী দরকার? তুমি কী ভাবছ আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। তুমি ভাবছ জেনি পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং এই কাজটা সে কেন করেছে তার ব্যাখ্যা দিতে এই উদ্ভট গল্পটা ফেঁদে বসেছে।'

'কথাটা তুমি ঠিক বললে না,' মিথ্যা বলল পিংকি।

'আমি ঠিকই বলেছি। শুরুতেই বলেছিলাম আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে না। কী, দেখলে তো? আমার কথা ঠিক হলো তো?' নিজের ওপর রাগ হচ্ছে জেনির। 'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে ভাবাটাই ভুল হয়েছে।'

'চার-চারটে তরুণ-তরুণীর কোন খবর নেই, অথচ ওদের নিখোঁজ সংবাদ কেউ পুলিসকে জানাল না, এটা কী করে সম্ভব? এ নিয়ে তো হৈ চৈ পড়ে যাবার কথা।'

কপালে ভাঁজ পড়ল জেনির। 'জানি না কেন এ নিয়ে কোন আওয়াজ নেই হতে পারে জিম, কেথি এবং টড কেবল শহরে নতুন আসা শিকার খুঁজে বেড়ায়।'

'তোমার ধারণা ওরা প্রতি রাতে খুন-খারাবী করে বেড়াচ্ছে?'

'দানব তো। দানবদের সবসময় খিদেয় চোঁ চোঁ করে পেট।'

'আমাকে তুমি কী করতে বলো, জেনি? ঠিক আছে, স্বীকার করছি তোমার গল্প আমার বিশ্বাস হয়নি। গল্পটা খুবই হাস্যকর। তোমার জায়গায় আমি থাকলে এবং একই কাহিনী তোমাকে শোনালে আমার কথাও তোমার বিশ্বাস হত না।'

'হুঁ।'

'তাহলে আমার করণীয় কী?' জানতে চাইল পিংকি।

'কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

'এর কারণ কী এটা যে জিম এখনও বেঁচে আছে? কারণ সে এখনও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

গম্ভীর মুখে মাথা দোলাল জেনি। 'হ্যাঁ। ওর হয়তো আরও পার্টনার আছে। আরও পার্টনার না থাকার কোন কারণও নেই।'

'পৃথিবী ওদের দখলে চলে যেতে পারে বলে ভয় পাচ্ছ?'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেনি। 'পার্টির আগের দিন আমি ওদের তিনজনকে ক্যারল ম্যাকফারল্যাণ্ড এবং ল্যারি জুরেরের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখেছি।'

'ক্যারল এবং ল্যারিও এখন দানব বনে গেছে?'

'হয়তো বা।'

'তাহলে ওদেরকে খুন করলে না কেন? ওরা তো পার্টিতে ছিল।'

'ওরা দানব হয়ে গেছে কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। তোমার কাছে শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি বলছি, পিংক, কাউকে দানব বলে সন্দেহ করলেই আমি তাকে গুলি করতে পারি না।'

'ঠিক আছে। এসো, কিছুক্ষণের জন্য ভান করি যে তুমি যা বললে সব

সত্যি। যদিও গল্পটা আমার বিশ্বাস হয়নি, তবু ধরো বিশ্বাস করলাম। ওদের দানব হয়ে যাবার কারণ কী?'

'আমি জানি না।'

'কিন্তু কোন ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই তোমার কাছে আছে।'

'নেই,' বলল জেনি। 'তবে ক্যারল এবং ল্যারিও যদি অন্যদের মত হয়ে যায় তাহলে এটাকে আশ্চর্য কাকতালীয় ঘটনা বলতে হবে। ক্যারল চিয়ারলিডার, ল্যারি আছে ফুটবল টিমে।'

'লেফটেনেন্ট নগুয়েনকে তুমি তোমার গল্পটা বলছ না কেন?'

'বলে কী হবে? তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অথচ তুমিই আমার গল্প বিশ্বাস করনি। সে কেন বিশ্বাস করবে?'

'নগুয়েনের ধারণা তোমার আইনজীবীর উচিত হবে না জামিনে তোমাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া। তার আশংকা টড এবং কেথির পরিবার তোমার ওপর শোধ নিতে পারে।'

হাত নেড়ে পিংকির কথা উড়িয়ে দিল জেনি। 'ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে না। শোধ নিতে চাইলে জিম নেবে।'

'তুমি কি জেল থেকে বেরুতে চাও?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'এ প্রশ্নের জবাব কী দেব জানি না।'

'জবাব হলো হ্যাঁ।'

'তোমাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, পিংকি।' বলল জেনি।

'চিন্তা হচ্ছে কারণ তোমার আশংকা ভিনগ্রহের বাসিন্দারা পৃথিবী দখল করে নিতে পারে?'

'ওরা ভিনগ্রহের বাসিন্দা কিনা জানি না। পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা ওদের আছে কিনা তা-ও জানি না। তবে ওরা যে অদূর ভবিষ্যতে পয়েন্ট শহর দখল করে নেবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।'

ঘড়ি দেখল পিংকি। 'তোমার গল্পের সত্যতা প্রমাণ করতে আর কিছু যোগ করতে চাও?'

'দুটো জিনিস। তুমি গতরাতে ওখানে ছিলে। নিশ্চয়ই মনে আছে আমি যখন টড এবং কেথিকে গুলি করি তখন দোতলায় ছিল জিম। আশা করি ভুলে যাওনি জিম তক্ষুণি বুঝে ফেলেছিল এরপরে ওকে ধাওয়া করব আমি।'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো জিম বুঝতে পেরেছিল এরপরে ওর পালা। গুরুত্বটা তোমার উপলব্ধি করা উচিত। ও বেডরুমের জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ছাদে, তারপর লাফিয়ে নেমেছে বারো ফুট নিচের জমিনে এবং বিন্দুমাত্র টাল না খেয়ে ছুটে গেছে মাঠে।'

'শটগান হাতে কেউ আমার দিকে তেড়ে এলে আমিও জানালা দিয়ে লাফ মারতাম।'

'কিন্তু তোমার গা-হাত-পা কেটে যেত,' বলল জেনি, 'রক্ত বেরুত শরীর থেকে। তুমি আহত হতে।'

'জিমের পায়ে গুলি করে তুমি ওকে আহত করেছ, ওর গা থেকেও র[ক্ত]
ঝরেছে।'

'কিন্তু ও কতটা আহত হয়েছে তা তো জানি না!'

'আমি ওকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব,' সিধে হতে গেল পিংকি। '[ও]
এখানে, থানায় আছে।'

জেনি পিংকির একটা হাত চেপে ধরল। চক্ষু বিস্ফারিত, তাতে ভীতি[র]
ছায়া। 'ওর কাছ থেকে দূরে থাকবে।' কণ্ঠে আকুতি ফুটল। 'ও বিপজ্জন[ক]
মানুষ। কথা দাও ওর ধারেকাছে ঘেঁষবে না।'

'জিমের সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কাজেই ওর ধারেকা[ছে]
ঘেঁষার সুযোগ নেই বললেই চলে।'

'কিন্তু আমরা যে কথা বলেছি ও জেনে যাবে। তখন ও তোমার ক্ষতি কর[ার]
চেষ্টা করবে।'

পিংকি জেনির হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। 'আমি আত্মরক্ষা করতে জানি।'

জেনি ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসল। 'ওকথা আমিও ভেবেছিলাম।'

এ কথার প্রত্যুত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না পিংকি। শীঘ্রি আবার দে[খা]
হবে বলে চেয়ারের সঙ্গে শিকল বাঁধা জেনিকে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও[।]
জেনির জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে ওর। কী ভাল একটা মেয়ে আর এখন তার ক[ী]
দশা। জীবনের কী অপচয়! জেলখানার লোহার গরাদের পেছনে থাকার চে[য়ে]
ওর যে একজন মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য প্রয়োজন, আদালত আশা করি তা বুঝ[তে]
পারবেন, মনে মনে বলল পিংকি।

নগুয়েনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হলওয়েতে। সে পিংকিকে তার অফি[সে]
নিয়ে এল। বসতে বলল। কিন্তু বসল না পিংকি। জেনি কী বলেছে জান[তে]
চাইল পুলিস কর্মকর্তা।

'তেমন কিছু বলেনি,' বলল পিংকি।

'তুমি ওর সঙ্গে দশ মিনিটেরও বেশি ছিলে,' বলল নগুয়েন। 'কোন ন[া]
কোন বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে।'

'গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নিয়ে কথা হয়নি। ও গতরাতের ঘটনা নিয়ে একট[া]
কথাও বলেনি।' দু'হাত প্রসারিত করল পিংকি। 'আয়াম সরি।'

ওর দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নগুয়েন। উজ্জ্বল, ঝকঝকে[,]
উষ্ণ চোখ। মানুষটার কাছে মিথ্যা বলেছে বলে অপরাধবোধে ভুগছে পিংকি।
কিন্তু জেনির গল্প লোকটিকে বলার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না ও। জেনি যদি
নিজেই নগুয়েনকে বলতে চাইত তাহলে ভিন্ন ব্যাপার ছিল। কিন্তু নিজে থেকে
নগুয়েনকে দানবের গল্প বলাটা বান্ধবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। তাই ও
চুপ করে রইল।

অবশেষে মাথা ঝাঁকাল নগুয়েন। 'বেশ, পল্লবী,' দরজায় পিংকিকে এগিয়ে
দিল সে। 'তোমার ফোন নাম্বার আমাদের কাছে আছে। আমাদের সঙ্গে
যোগাযোগ রেখো। নতুন কিছু ঘটলে আমাকে অবশ্যই ফোন কোরো।'

'করব,' বলল পিংকি, 'জিম ক্লাইন কি এখানে আছে?'

'কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে,' জানাল নগুয়েন।
'কেমন আছে সে?'
হাসল নগুয়েন। 'এখানে আসার পরে প্রশ্নটা করেছিলে তুমি।'
মাথা ঝাঁকাল পিংকি। 'হুঁ,' মুখে হাসি ফোটাল। 'ভাবলাম আরেকবার খবর নিই। গুডবাই, লেফটেন্যান্ট। আমার জীবন রক্ষা করার জন্য আবারও ধন্যবাদ।'
'এখানে আসার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ,' বলল নগুয়েন।

পল্লবী কেয়া পিংকি চলে যাবার পরে ইউনিফর্মধারী এক পুলিশ অফিসার একটি ক্যাসেট টেপ এবং একটি টেপ প্লেয়ার নিয়ে এসে নগুয়েনের টেবিলে রাখল। অফিসার চলে যাবার পরে নগুয়েন টেপ রিওয়াইণ্ড করে পিংকি এবং জেনির কথোপকথন শুনল। সে অবশ্য ওরা কথা বলার সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের আলাপচারিতা আড়াল থেকে শুনেছে। আড়িপাতার জন্য নগুয়েনের মধ্যে কোন অপরাধবোধ কাজ করছে না। একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং সে এর তলা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে চায়। এটাই তার কাজ। লেফটেন্যান্ট নগুয়েন সম্পর্কে পিংকির অনুমান সঠিক—এ লোক নিজের কাজে অতিশয় দক্ষ।
টেপ রেকর্ডারের দুই তরুণীর বাতচিত শুনতে গিয়ে জেনি কী বলেছে তার চেয়ে মেয়েটির কণ্ঠের দৃঢ়তা বিস্মিত করল নগুয়েনকে। এ মেয়েটি আর দশটা টিন-এজারের মত লঘু টাইপের নয়। জঙ্গলে মেয়েটি কীভাবে তার সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল মনে পড়ে গেল নগুয়েনের। যুদ্ধে নগুয়েনের তত্ত্বাবধানে যেসব সৈনিক লড়াই করেছে তাদের অনেকের চেয়ে এই জেনি মেয়েটির সাহস অনেক বেশি।
কিন্তু ও যে গল্পটা বলল তার কী ব্যাখ্যা? গল্পটি উদ্ভট তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু এ কাহিনী শুনে নগুয়েনের মন কেন খচখচ করে? বহু আগে থেকেই সে যুক্তি বা ব্যাখ্যার চেয়ে নিজের ইনটুইশনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখানে তার কী করার আছে? জেনি জিম কুইন নামে যে ছেলেটাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল সে সম্ভবত খুনী। নগুয়েন জিমের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছে এবং ছোকরাকে তার পছন্দ হয়নি। ছেলেটা কী যেন লুকোচ্ছিল। জেরা করার সময় তার চোখ অস্থিরভাবে নাচানাচি করছিল। ওকে মনে হচ্ছিল খাঁচায় পোরা জন্তু। ছোঁড়া যে কোন আকাম করেছে সে ব্যাপারে নগুয়েন নিশ্চিত। কিন্তু জিমের ওপর দিন-রাত নজরদারী করার মত লোকবল তার নেই। ওকে চোখে চোখে রাখার অধিকারও হয়তো নগুয়েনের নেই।
জেনির গল্পটা পিংকি ফাঁস করেনি বলে চমৎকৃত হয়েছে নগুয়েন। ওরা দু'জন বান্ধবী। গতরাতের ঘটনা ওদের বন্ধুত্বে বিন্দুমাত্র চিড় ধরাতে পারেনি। বন্ধু এমনই হওয়া উচিত।
টেপ শেষ হয়ে যাবার পরে নগুয়েন ডেস্কের ইন্টারকম বোতামে চাপ দিল। ঘরে ঢুকল তার এক লোক, অফিসার মার্টিন। এ লোক জেনিকে পাকড়াও করতে নগুয়েনকে সাহায্য করেছে।
'জেনি বার্টনের জামিনের কোন খবর আছে?' জিজ্ঞেস করল নগুয়েন।

'সোমবারের আগে বিচারপতির শুনানী হচ্ছে না,' জবাব দিল মার্টিন। 'জেনিও জামিন পাবে না।'

'শুনানীটা স্থগিত করা যায় না?'

'জেনির আইনজীবী অভিযোগ করবে।'

'তাদের কাজই তো এটা। শুনানীর সময় বিচারপতি যেন অসুস্থ থাকেন আমি এটা চাই। ওঁর সঙ্গে দেখা করে বলবে তাঁকে এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ। আমি চাই না মেয়েটা ছাড়া পাক। মেয়েটা বিপজ্জনক।'

'বুঝতে পারছি। আর কিছু?'

'বালটনে কাঠের তৈরি যত ওয়্যারহাউস আছে আমি সবগুলোর একটা তালিকা চাই।' বলল নগুয়েন। 'জোগাড় করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।' বলল মার্টিন। 'কীসের জন্য দরকার?'

'একটা কংক্রিটের মেঝে ঝাঁট দেব,' বলল নগুয়েন। 'দেখি ঝাঁট দিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

চার

শুক্রবার রাতের বন্দুক হামলায় নিহত টড গ্রীন এবং কেথি বেকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো মঙ্গলবার সকালে। এ উপলক্ষে পয়েন্ট হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল স্কুল ছুটি দিলেন। এক-চতুর্থাংশ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। টড এবং কেথি স্কুলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ধর্মযাজক যখন তাঁর বক্তৃতায় ওদের দু'জনের উচ্চকিত প্রশংসা করছিলেন, তখন কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তবে নিহত দু'জনের পরিবারের সদস্যারা চ্যাপেলের সামনে কালো পোশাক পরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের অবয়বে শোক এবং ঘৃণার ছায়া।

পল্লবী কেয়া চ্যাপেলের পেছনে বসেছে। ভাবছিল ওরা কী জানেন যে সে জেনির প্রিয় বান্ধবী।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে সমাধিস্থলে গেল না পিংকি। ওর যথেষ্ট শোক প্রকাশ করা হয়েছে; তবে জানে না কেন এখানে এল। অবশ্য ওর মন জানে এ প্রশ্নের উত্তর। অপরাধবোধ। জেনি যে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে, এ ব্যাপারটা খুন-খারাবী হবার অনেক আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল। অবশ্য জেনির আচরণে কোনরকম অস্থিরতা লক্ষ করেনি পিংকি, এমনকী খুন করার পরেও ওকে স্বাভাবিক লাগছিল।

শনিবার সকালের পরে জেনির সঙ্গে আর কথা হয়নি পিংকির। ও গাড়িতে উঠছে, ওকে দেখে এগিয়ে এল জিম ক্লাইন। জিমকে দেখে একটুও ভয় পেল না পিংকি। জেনির বলা গল্পটা নিয়ে সে বেশ কয়েকবার চিন্তাভাবনা করে প্রতিবারই একই উপসংহারে পৌঁছেছে। জেনির মাথাটা গেছে। তাই সে উল্টোপাল্টা চিন্তা করছে। ব্যস, মিটে গেল।

'পিংক,' ডাকল জিম। 'তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

জিম অত্যন্ত সুদর্শন। ঈশ্বর নিজের হাতে যেন গড়েছেন ওকে। সে বেশ লম্বা, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, রেডউড গাছের মত শক্ত শরীর। চুলের রঙ বাদামি, সর্বদা পরিপাটি করে আঁচড়ে রাখে, মুখখানা যেন পাথরে কোঁদা। জিমের কাঁধজোড়া সুপ্রশস্ত, হাতে থোকা থোকা পেশি। ওর বাদামি চোখে মুখের হাসির মত লাজুক চাউনি ফুটে থাকে। যদিও চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ তেমন নেই। না থেকেই বরং ভাল হয়েছে। ওরকম সুগঠিত একটা শরীরের অধিকারী তরুণ যদি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হত তাহলে সে হয়তো সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেত।

পিংকি জিমকে খুব পছন্দ করে। জিমের পার্টিতে আমন্ত্রণ পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছিল। তবে এ মুহূর্তে পার্টির কথা ভাবতে চাইছে না পিংকি।

'অবশ্যই কথা বলতে পারো,' বলল পিংকি। গাড়ির খোলা দরজার পাশে দাঁড়াল। অনেকেই গোরস্তানে যায়নি। পিংকির গাড়িটা চ্যাপেলের পার্কিং লটে অন্তত আরও তিনটে গাড়ির মাঝখানে আটকা পড়েছে। এমনিতেই সে চাইলে এ মুহূর্তে বেরুতে পারছে না।

'তোমার পায়ের কী অবস্থা?' জানতে চাইল ও।

'ভাল,' জবাব দিল জিম। পায়ের দিকে তাকাল। 'অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া গেছে।' মুখ তুলে তাকাল জিম, দৃষ্টি চলে গেল চ্যাপেলে, সেখান থেকে ফিরে এসে নিবদ্ধ হলো পিংকির ওপর। ওকে কেমন বিব্রত লাগছে। 'তুমি শুক্রবার রাতে আমার জন্য যা করেছ সেজন্য শুধু ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

মৃদু হাসল পিংকি। 'তোমার জীবন বাঁচিয়েছেন লেফটেনেন্ট নগুয়েন। ওনাকেই বরং তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।'

'তুমি যদি বাড়িতে এবং জঙ্গলে জেনিকে বাধা না দিতে নগুয়েন আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না।' বলল জিম। 'তোমার জন্য যদি কখনও কিছু করার সুযোগ আমার হয়, কোনদিন, শুধু একবার আমাকে বোলো। বলতে বিন্দুমাত্র সংকোচ করবে না। আমি সিরিয়াসলি বলছি।'

ব্লাশ করল পিংকি। 'হয়তো কোন নির্জন রাতে তোমাকে আমার কাছে পেতে ইচ্ছে করবে। না, না, ঠাট্টা করলাম। ধন্যবাদ। আই মিন, ইট'স ওকে।' ওর গলার স্বর ভারী শোনাল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। 'আরও যদি কিছু করার সুযোগ পেতাম আমি–তাহলে আজ এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমাদেরকে আসতে হত না।'

'তোমার আর কী-ই বা করার ছিল,' বলল জিম। চ্যাপেলের সামনে দুটো শবযান দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীঘ্রি ওতে কফিন তোলা হবে।

'ওদের পরিবারের লোকজনের খবর কী?' জানতে চাইল পিংকি।

'খবর ভাল না,' বলল জিম। 'তারা প্রতিশোধ নিতে চায় যদিও তা পারবে না।'

'জেনির বিরুদ্ধে জোড়া খুনের অভিযোগ আনা হবে। ওর জেল থেকে ছাড়া পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'হুঁ,' দুঃখী গলায় বলল জিম। ধূসর রঙের সুটের পকেটে হাত ঢোকাল। তাকাল পায়ের দিকে।

ওর বাহুতে হাত রাখল পিংকি। কেঁপে উঠল জিম। 'আসল ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'তুমি জানো কিছু?'

জিম ওর দিকে তাকাল। 'তুমি ওর সঙ্গে শনিবার কথা বলোনি?'

'বলেছি। কিন্তু ও আমাকে তেমন কিছু বলেনি।'

'কিছুই না?'

'আবোলতাবোল বকেছে কেবল।'

'যেমন?'

কাঁধ ঝাঁকাল পিংকি। 'কী বলেছে মনে করতে পারছি না।'

মাথা নাড়ল জিম। 'ওর সঙ্গে আমার যা হয়েছে তা হলো আমি ওকে বলেছিলাম ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে পারব না। আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসি। কথাটা শুনে ও ভীষণ রেগে যায়—রীতিমত চণ্ডালিনীর মূর্তি ধারণ করে। আমি তো ওর সেই চেহারা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে ও বলে আমি ওকে ছেড়ে দিলেও ও আমাকে ছাড়বে না, আমি নাকি শুধুই ওর, ওর ভালবাসায় অন্য কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ওকে প্রথম প্রথম এড়িয়ে চলছিলাম, কিন্তু ও আমাদের প্র্যাকটিসে আসতে শুরু করে, আমাকে চোখের আড়াল করতে চাইত না। জেনি টডকে ফোন করেছিল জানতে আমি সত্যি অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি কিনা। একদিন কেথিকে স্কুলে শাসিয়েছেও আমার দিকে নজর দিলে নাকি ও কেথিকে খুন করে ফেলবে।'

ভুরু কোঁচকাল পিংকি। 'জেনি ওরকম বলতে পারে বিশ্বাস হয় না।'

'তুমি কী করে বিশ্বাস করবে? ওকে তুমি কতটুকু চেন—ও আমার প্রেমিকা ছিল। আমি ওর হাড়মজ্জা সব চিনি।'

'ওর সঙ্গে সম্পর্কটা রাখলে না কেন?'

আবার শবযান এবং চ্যাপেলের সিঁড়িতে চোখ চলে গেল জিমের। কফিন বহনকারীরা চলে এসেছে। জিমও বোধহয় ওদের দলে থাকবে। 'এখানে অনেক আওয়াজ। চলো অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলি।'

'এ নিয়ে পরে কথা বললেও সমস্যা নেই,' দ্রুত বলে উঠল পিংকি।

'সেটা কি ঠিক হবে? আমার অনেক কথা বলার ছিল। খেলার পরে, শুক্রবার রাতে বসলে কেমন হয়?'

'তুমি শুক্রবার খেলছ নাকি?' অবাক হলো পিংকি।

'হ্যাঁ। আমার পা সেরে গেছে। তখন আসতে পারবে?'

পিংকি একটু চিন্তা করল। জিম জেনির বয়ফ্রেণ্ড ছিল, আর জেনি ওর সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী। জিম ঠিকই বলেছে শোকাবহ এ পরিবেশ কথা বলার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু জিম পিংকির সঙ্গে ডেট করতে চায়নি—স্রেফ কথা বলতে চেয়েছে। এতে ক্ষতির কিছু নেই।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আমার কোন সমস্যা নেই।'

সকাল এগারোটায় বাড়ি ফিরল পিংকি। ওর দাদু তখনও ঘুমাচ্ছেন। মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলতে যান দাদু। সেসব রাতে দেরি করে বাড়ি ফেরেন। গতকাল অনেক রাত হয়েছে তাঁর বাড়ি ফিরতে। এমনিতে অবশ্য রাত এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। ওঠেন ভোর ছ'টায়।

দাদুর বেডরুমের দরজা খোলা। পিংকি দরজা বন্ধ করে কিচেন টেবিলে বসল খবরের কাগজ পড়তে। জেনির হত্যাকাণ্ড বিষয়ক খবর এখনও সামনের পাতায় ছাপা হয়। পিংকি পুলিসকে আগেই বলে দিয়েছিল মিডিয়ার কাছে পুলিস তার বিষয়ে যেন কিছু না বলে। পত্রিকাঅলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওর নেই। সোমবার ও স্কুলে যায়নি তাই জানে না ক্লাসমেটরা ওর সঙ্গে কীরকম আচরণ করবে। ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আর মৃত দু'জন ক্লাসমেটের গল্প বলে মিডিয়ার হিরোইন হবার কোন খায়েশ পিংকির নেই।

পত্রিকা মাত্র পড়তে শুরু করেছে পিংকি, এমন সময় নক হলো দরজায়। জর্জ উইনস্টন, ওর সঙ্গে পড়ে। কাছেই বাসা। জেনির পরে, ছোট্ট এ শহরে ও-ই পিংকির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হত যদি না ক্লাসে প্রথমদিন দেখেই পিংকির প্রেমে পড়ে যেত জর্জ। তবে ও যে পিংকিকে পছন্দ করে তা কথায় এবং আচরণে সবসময় বুঝিয়ে দেয়। এতে পিংকির অস্বস্তি হলেও সে ভাবটা কখনও ফুটতে দেয় না চেহারায়। জর্জ পিংকির সমান লম্বা, পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। মাথা ভর্তি আলকাতরার মত কালো চুল, ঠোঁটের কোনায় সবসময় একটুকরো হাসি লেগেই আছে। হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে যদি কেউ তার প্রিয় বিষয় সেক্স নিয়ে কথা বলে। পিংকির সঙ্গেও সে সেক্স নিয়ে অনর্গল বকে যায়। পিংকির প্রথম প্রথম লজ্জা এবং অস্বস্তি লাগলেও পরে বুঝেছে জর্জ আসলে ঠাট্টা করে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলে, তার কোন কুমতলব নেই। সে পিংকির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকায়। তবে সে দৃষ্টিতে কামনা নেই, আছে ভালবাসা। লজ্জা কেটে যাবার পরে পিংকিও এখন ফ্রি ভাবে জর্জের সঙ্গে সেক্স নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। কারণ জানে এ ছেলেটি আর দশটা আমেরিকান তরুণের মত নয়, ওর ওপর কখনও হামলে পড়বে না। জর্জ আপাদমস্তক একটি ভাল ছেলে এবং এজন্যেই পিংকি ওকে এত পছন্দ করে।

'আমি কি দেরি করে ফেললাম?' পিংকি দরজা খুলতেই প্রশ্ন করল জর্জ।

হাসল পিংকি। 'না, তুমি একদম ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। ভেতরে এসো। জলদি কাপড় খোলো। আমার স্বামী শীঘ্রি চলে আসবে।'

লাফ মেরে ঘরে ঢুকল জর্জ। 'তোমার স্বামী কোথায়?'

'তোমার বউয়ের সঙ্গে।'

'হতভাগা।'

'ঠিকই বলেছ। আজ কীভাবে হবে?'

'হার্ড অ্যাণ্ড ফাস্ট।'

'অন্য কোনভাবে করা যায় না?' বলে হেসে উঠল পিংকি। জর্জ ওর হাত

ধরতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল। 'শান্ত হও, বালক। আমার স্বামী পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে।'

হতাশ হবার ভান করল জর্জ। 'তাহলে পরের বার।'

'সবসময়ই পরের বার বলে একটা কথা থাকে,' বলল পিংকি।

জর্জ পিংকিকে দ্রুত আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিল। 'তুমি কেমন আছ, পিপি?' ও পিংকিকে আদর করে 'পিপি' বলে ডাকে। পল্লবীর P, পিংকির P। P and P নামে একটি রুট বিয়ার আছে, জর্জের খুব পছন্দ। পিংকি জবাব দেয়ার আগেই লম্বা পা ফেলে লিভিংরুমে ঢুকে পড়ল জর্জ, দুম করে বসে পড়ল একটা কাউচে। 'তোমাদের বাসাটা সত্যি সুন্দর!' ঘোষণার সুরে বলল সে।

পিংকির দাদু প্রীতম চৌধুরীর দোতলা বাড়িটি চমৎকার খোলামেলা। বাড়িটির বেসমেন্টও বিশাল। লিভিংরুমের স্লাইডিং গ্লাসের জানালাগুলো পয়েন্ট লেকের দিকে মুখ ফেরানো। লেকের পানি সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করছে। জর্জ লেকের দিকে তাকাল। হ্রদের তীরে পয়েন্ট হাইস্কুল। স্কুলের অর্ধেক ক্লাস থেকে লেকটা পরিষ্কার দেখা যায়। ক্লাসে মন না বসলে পিংকি কতদিন লেকের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। মন ভাল হয়ে গেছে। সে কাউচে, জর্জের পাশে বসল।

'হেই, গার্ল,' কথাটা পিংকিকে নয়, প্লাস্টিককে উদ্দেশ্য করে বলেছে জর্জ। প্লাস্টিক পিংকির দাদুর প্রিয় কুকুর। সে ছুটে এসে লাফ মেরে উঠে পড়ল জর্জের গায়ে। মুখটা গুঁজে দিল কোলের মধ্যে। পিংকি সুন্দর কুকুরটাকে খুব ভালবাসে কিন্তু প্লাস্টিক পিংকির খুব একটা কাছে ঘেঁষে না। সম্ভবত ও মেয়ে বলেই। কিন্তু জর্জকে দেখলেই প্লাস্টিক যেন পাগল হয়ে যায়। সে কোল থেকে মুখ তুলে চেটে দিতে লাগল জর্জের মুখ। জর্জও ওকে আদর করছে। পিংকি প্লাস্টিককে ইশারা করল তার প্রিয় জায়গায় যেতে। কারণ জর্জের সঙ্গে ওর কিছু জরুরি কথা আছে। কুকুরটার পছন্দের জায়গা হলো কাঠের একটা ব্যালকনি। দোতলায় দাদু এবং পিংকির বেডরুমের সামনে ঝুলবারান্দাটা, পানি থেকে ঠিক দশ ফুট উঁচুতে। ওখানে পানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় প্লাস্টিক। তাকে তখন কেউ দেখলে ভাববে ও কুকুর নয়, বেড়াল। মাছ শিকারের মতলব করছে। যদিও প্লাস্টিক কোনদিন পানিতে নামেনি।

'যাও, মেয়ে,' বলল পিংকি, 'পানি দেখো গে।'

প্লাস্টিক ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল তুমি-আমাকে-আদেশ-করার-কে'র ভঙ্গিতে। তবে পিংকির হুকুম তামিল করল সে। জর্জের কোল থেকে নেমে পা বাড়াল সিঁড়িতে, ওপরে উঠে স্লাইডারে ধাক্কা দিতেই কাচের দরজা খুলে গেল। রোদ পোহাতে ব্যালকনিতে ঢুকল প্লাস্টিক।

'বুদ্ধিমান কুকুর,' মন্তব্য করল জর্জ।

'হ্যাঁ,' সায় দিল পিংকি। 'ও আমার চেয়েও তোমাকে বেশি পছন্দ করে।'

'বেশিরভাগ নারীই আমাকে পছন্দ করে।'

'তুমি কোথায় ছিলে?' জানতে চাইল পিংকি।

'আমি এখানে ছিলাম, আমি ওখানে ছিলাম। আমি সবজায়গায় ছিলাম।' বিরতি দিল জর্জ। 'তুমি ফিউনেরালে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। মাত্র ফিরলাম। তুমি যাওনি কেন?'

'আমাকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।'

'ভাগ্যিস আমন্ত্রণ পাওনি। না, সত্যি করে বলো তো তুমি কোথায় ছিলে? তুমি এবারের উইকএণ্ডে আমাকে একবারও ফোন করনি। অথচ আমি তোমাকে দু'বার ফোন করেছি।'

'কোন মেসেজ রেখেছিলে?' জানতে চাইল জর্জ।

'দুটো।'

'যদি বলি আমার যন্ত্রটা কাজ করছিল না তাহলে কি ক্ষমা পাওয়া যাবে?'

'তুমি বললে ক্ষমা করব। কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে আমার দরকার ছিল।'

জর্জকে এবারে সিরিয়াস দেখাল। পিংকির যে কোন ব্যাপারেই সে সাহায্যের জন্য সবসময় এক পায়ে খাড়া। ও পিংকির হাঁটুতে একটা হাত রেখে বলল, 'আমি দুঃখিত। শিকাগো গিয়েছিলাম একটা কম্পিউটার কনভেনশনে। গতরাতে ফিরেছি। এসে শুনলাম তোমাদের পার্টিতে গোলাগুলি হয়েছে।'

'কনভেনশনে যাবার খবরটা আমাকে জানাওনি কেন?'

'কারণ আমাকে পার্টিতে দাওয়াত দেয়া হয়নি।'

'কথাটা একটু আগেই বলেছ তুমি।'

'আবার বললাম। কারণ ওটাই কারণ।'

জর্জের কথা বিশ্বাস হলো পিংকির। বলল, 'তোমাকে না বলে পার্টিতে গেছি বলে রাগ করেছ? পার্টিটা তো আর আমার নিজের ছিল না। আমি লোকজনকে দাওয়াত দিতে পারি না।'

মাথা ঝাঁকাল জর্জ। 'জিম ক্লাইন পার্টি দিয়েছিল জানি আমি। এবং ও প্রায় খুন হতে বসেছিল সে খবরও অজানা নেই আমার। লোকে জানে তুমি ওর জীবন বাঁচিয়েছ।'

'ওটা লোকের অতিরঞ্জন। পুলিস ওকে রক্ষা করেছে।'

'শুনলাম ওকে লক্ষ্য করা গুলিটা নাকি তোমার গায়ে লেগেছে।'

হেসে উঠল পিংকি। 'গল্পের গরু গাছে ওঠে। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে আমি গুলি খেয়েছি?'

ওকে এক মুহূর্ত দেখল জর্জ। 'তোমাকে ভয়ানক বিধ্বস্ত লাগছে, পিংকু।'

পিংকি নাক টানল, নামিয়ে নিল চোখ, হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। মন-টন খুব খারাপ থাকলে এরকম করে ও। অভ্যাস। 'হ্যাঁ, জানি আমাকে বিধ্বস্ত লাগছে। কারণ আমার মনটাও বিধ্বস্ত হয়ে আছে। দু'জন মানুষ মারা গেছে, জেনি জেলে। ইচ্ছে করছে এ শহর ছেড়ে বাবা-মা কারও কাছে চলে যাই। ওঁরা শুধু মুখে মুখে ঝগড়া করতেন–শটগান ছুড়তেন না।'

ওর কাছে সরে এল জর্জ। একটা হাত রাখল কাঁধে। পিংকি হাতটা সরিয়ে দিল না। 'তুমি কোথাও যাবে না,' বলল জর্জ। 'তুমি যদি এ শহর ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দেব। স্কুলের প্রতিটি মেয়ের সঙ্গে আমি শোবো এবং সব ক'টাকে গর্ভবতী বানিয়ে ছাড়ব (পিংকি জানে জর্জের এখনও

কোন যৌন অভিজ্ঞতা হয়নি)। শেষে নিজেদেরকে বাঁচাতে স্কুলটাই ওদের বন্ধ করে দিতে হবে।' ঝুঁকে এল জর্জ, চুমু খেল পিংকির গালে। 'তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও, পিপি ডিয়ার, এ ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।'

আবার নাক টানল পিংকি, হাসল। মৃদু গলায় বলল, 'জেনির মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'শুনলাম থানায় বসে ওর সঙ্গে নাকি তোমার কথা হয়েছে,' বলল জর্জ।

'খবর সত্যি বাতাসের বেগে ছড়ায়,' বলল পিংকি। 'আমরা কী বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তা শুনেছ?'

'না। কেউ জানে না অমন কাজ জেনি কেন করল। সবাই অপেক্ষায় আছে কারণটা তুমি ওদেরকে বলবে।'

'ওর কথাগুলো যদি তোমাকে বলে দিই গোপন রাখতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই।' বলল জর্জ।

জর্জকে যতটুকু চেনে পিংকি জানে ছেলেটা তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। 'জেনি বলেছে ও টড আর কেথিকে খুন করতে বাধ্য হয়েছিল কারণ ওরা ছিল দানব।'

চোখ পিটপিট করল জর্জ। 'কী?'

ঘটনা বলল পিংকি। সে রাতে পার্টিতে কী ঘটেছিল, জেনি থানায় বসে ওকে কী বলেছে কোনকিছুই বাদ দিল না। কোন বাধা না দিয়ে মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনে গেল জর্জ। ওর চিন্তা-ধারণাগুলো খুব স্বচ্ছ, জীবনেও কোন ক্লাসে সেকেণ্ড হয়নি। পিংকি ওকে গল্পটা বলছে এ আশায় যে যা ঘটেছে তার ওপর নতুন কিছু আলোকপাত হয়তো করতে পারবে জর্জ। গল্প শেষ করে বন্ধুর মন্তব্য শোনার অপেক্ষা করল পিংকি।

'গল্প শুনে মনে হচ্ছে সত্যি জেনির মাথাটা গেছে।' অবশেষে বলল জর্জ।

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'তবে দোষটা হয়তো ওর নয়।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'ব্যাপারটা আমি বলতে চাইছিলাম না। বলে হয়তো কোন লাভও হবে না। এটা একটা থিওরির গল্প। পত্রিকাঅলারা শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানতে পারবে।'

'ঘটনাটা কী?'

'ঘটনাটা গত বছর ঘটেছিল, তুমি এ শহরে আসার আগে। তখন সবে পয়েন্ট হাই-এর উদ্বোধন হয়েছে। এর আগে আমরা বালটন হাইতে বাসে চড়ে যেতাম। বড্ড ঝামেলার ব্যাপার ছিল ওটা—পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দীর্ঘ যাত্রা। তাছাড়া বালটন হাইতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও ছিল খুব বেশি। যা হোক, নিজেদের একটা স্কুল পেয়ে সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম। তবে খুশিটা বজায় ছিল গত বছর পর্যন্ত, ফুটবল সিজন তখন শেষ হবার পথে। একদল ছাত্রের হঠাৎ মাথা এবং পেট ব্যথা করতে শুরু করে। ত্রিশ-বত্রিশজন ছাত্র একযোগে আক্রান্ত হয়। কয়েকজন ক্লাসেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, রেস্টরুমে কারও না কারও ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটা ছিল স্বাভাবিক। সবাই ভয় পেয়ে যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মা,

ফ্যাকাল্টি এবং ছাত্রদেরকে নিয়ে বিরাট মিটিং ডাকা হয়। স্কুলের পানি পরীক্ষা করে দেখতে বিশেষজ্ঞ ডেকে আনা হয়েছিল। এমনকী ক্যাম্পাসের ঘাস এবং ফুলও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা কোথাও কোন সমস্যা পাননি। তারপর হঠাৎ করেই অসুখটার অবসান ঘটে। যদিও সকলে একত্রে সুস্থ হয়ে ওঠেনি। এক্সপার্টরা একে "গণ-হিস্টিরিয়া" বলে অভিহিত করেন।'

'এটাকে তাঁদের হিস্টিরিয়া বলে মনে হবার কারণ কী?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'এর কয়েকটি থিওরি বা যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে অদ্ভুত থিওরি ছিল যে সেবার গরমকালটা ছিল দীর্ঘস্থায়ী। তখন নভেম্বর মাস অথচ তাপমাত্রা ছিল আশির মাঝামাঝি। তোমাকে তো বললামই সমস্যাটা যেমন হুট করে এসেছিল তেমনি হুট করে চলেও গিয়েছিল। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, অল্প কয়েকজন ছাত্র এতে আক্রান্ত হয়। তোমার গল্প শুনে এ কথাটা মনে পড়ে গেল।'

'ফুটবল খেলোয়াড় আর চিয়ারলিডাররা শুধু আক্রান্ত হয়েছিল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'হ্যাঁ। আমার কিছু হয়নি। আমার বন্ধুদেরও না। চিয়ারলিডিং স্কোয়াডের সব মেয়ে রোগটাতে আক্রান্ত হয়। কেথি বেকার তাদের একজন। ওর মা স্থানীয় পত্রিকায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে গালাগাল করে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর আদরের মেয়েকে বিষ খাইয়েছে।'

'জিম ক্লাইন কি আক্রান্ত হয়েছিল? কিংবা টড গ্রীন?'

'ঠিক বলতে পারব না। সম্ভবত হয়েছিল।'

'আর জেনি?' জানতে চাইল পিংকি।

'মনে পড়ে না। শুধু দুটো গ্রুপ আক্রান্ত হয়,' হাসল জর্জ। 'অত্যধিক শারীরিক ক্লান্তি এবং মানসিক চাপের কারণে হয়তো ওদের হিস্টিরিয়া হয়েছিল। গত সিজনে ফুটবল টিম শুধু দুটো খেলায় জিতেছে, বাকিগুলোতে হেরেছে। নতুন শুরু হওয়া একটা স্কুলের জন্য এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, তবে আমার ধারণা খেলোয়াড়রা ক্রমাগত পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে পারেনি।'

'যারা অসুস্থ হয়েছে তারা কি উল্টোপাল্টা কোন আচরণ করেছে?'

'সেরকম কিছু শুনিনি,' বলল জর্জ।

'তাহলে এসবের সঙ্গে জেনির কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তোমার কন্টামিনেশন থিওরি বা দূষিত তত্ত্ব–যে নামই দাও না কেন–এর সঙ্গে জেনির ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না?'

'তুমি ব্যাপারটা উল্টো করে দেখছ,' বলল জর্জ। 'জেনির ভাষ্য অনুযায়ী অন্যরা যা করেছে তার ব্যাখ্যা পেতে কন্টামিনেশন থিওরিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।'

'ওরা ওসব করেছে বলে তুমি সত্যি বিশ্বাস করো?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'না। তোমাকে তো বলেইছি এটা একটা উদ্ভট থিওরি। জিম জেনির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না বলায় ওর নিশ্চয়ই অনেক আঘাত লেগেছিল। মেয়েটা আপসেট হয়ে অমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

'জিম বলেছে ওর জেনির সঙ্গে এখন কোন সম্পর্ক নেই।' বলল পিংকি।
'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলেছ?'
'আজ সকালেই কথা হয়েছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে।' বলল না যে জিম ওর সঙ্গে বাইরে যেতে আগ্রহী। হিংসা হতে পারে জর্জের।
'আছে কেমন সে?' জানতে চাইল জর্জ।
'ভাল। ওর পায়ের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল।'
'এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে গেল?' অবাক জর্জ। 'শুনেছি জেনি নাকি জিমের পায়ের হাড় গুঁড়ো করে দিয়েছে।'
'ও স্রেফ গুজব। জেনির গুলি জিমের গায়ে বলতে গেলে লাগেইনি।' সিধে হলো পিংকি, কাউচের সামনে পায়চারি শুরু করল। 'এই ঘটনাটার আমি শেষ দেখতে চাই। তুমি কি শিওর এক্সপার্টরা অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পাননি?'
'ওটা অফিশিয়াল ঘোষণা। স্কুল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ ছিল। ওই ফাঁকে এক্সপার্টরা সবরকম নমুনা সংগ্রহ করেন। আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। কাজ শেষ করে তাঁরা চলে গেছেন।'
'পরে ওইসব লক্ষণের কোনটা কি আবার লক্ষ করা গিয়েছিল? ট্র্যাক এবং বেসবল সিজন যখন শুরু হলো?'
'গত বছর আমাদের ট্র্যাক কিংবা বেসবল টিম হয়নি। এ বছরেও হবে কিনা জানি না। এখনও টিম তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে তোমার প্রশ্নের জবাব আমি সত্যি জানি না।'
পায়চারি থামাল পিংকি। 'জেনির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল স্রেফ এ অভিযোগটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না।' কপালে ভাঁজ পড়ল ওর 'হয়তো ওই তিনজন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, ফলে তারা উদ্ভট আচরণ করে।'
'জিমের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার কী মনে হয়েছে?'
'ওর আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করিনি।'
'ওকে কি দেখে মনে হয়েছে ও জ্যান্ত মানুষ খেয়ে ফেলতে পারে?'
হাত নাড়াল পিংকি। 'জেনি কিন্তু বলেছে ও কাউকে আহত হতে দেখেনি।
'আমরা ওয়্যারহাউসে গিয়ে একবার দেখে আসতে পারি,' প্রস্তাব দিল জর্জ।
'যাওয়া সম্ভব নয়। জেনি ঠিকানা জানে না।'
'বাহ, এড়িয়ে যাবার ভাল রাস্তা।' বলল জর্জ।
মাথা ঝাঁকাল পিংকি। 'আমিও তাই ভেবেছি। আচ্ছা, আমার সঙ্গে একবার লাইব্রেরিতে যাবে? ছাত্রদের অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর যে সব পত্রিকা ছেপেছে আমি ওতে একবার চোখ বুলাতে চাই।'
কাউচ ছাড়ল জর্জ। 'ঠিক আছে। চলো।'

পয়েন্ট শহরের লাইব্রেরিতে এর আগে কখনও আসেনি পল্লবী কেয়া। শিকাগো লাইব্রেরির তুলনায় এটা কিছুই না। আকারে খুবই ছোট। তবে ওরা শুধু এসেছে

স্থানীয় খবরের কাগজ *দ্য পয়েন্ট হেরাল্ড*-এর পুরানো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে দেখার জন্য। লাইব্রেরিয়ান জানাল লাইব্রেরির পেছনের ঘরে পুরানো সংখ্যার অভাব নেই। মহিলা বৃদ্ধা, জরাগ্রস্ত। চোখেও বোধহয় ভাল দেখতে পায় না। পিংকি আর জর্জ লাইব্রেরিতে ঢুকে দেখে বুড়ি বইয়ের টেপ শুনছে।

যে সংখ্যাগুলোর খোঁজে ওরা এসেছে সেগুলোর সন্ধান পেতে বেশি সময় লাগল না। লেখাগুলো পড়তে গিয়ে পিংকি নতুন একটা তথ্য জানতে পারল। প্রায় তিন ডজন ছাত্র ওইসময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনা হয়। তাঁরা ওদের কোন সমস্যা দেখতে পাননি। কণ্ট্রাক্টর এবং কেমিস্টরাও এসেছিলেন। তাঁরাও স্কুলে কোন সমস্যা দেখেননি। ছাত্ররা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে এক্সপার্টরা চলে যান। তারপর পয়েন্টে আর কোন অঘটন ঘটেনি। উত্তেজনাহীন জীবনযাত্রায় হঠাৎ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে জেনি সেদিন পার্টিতে শটগান নিয়ে হাজির হয়ে।

আরেকটা জিনিস পিংকির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ ব্যাপারটিও সে আগে জানত না। যে কণ্ট্রাক্টিং ফার্ম স্কুল ভবন তৈরি করেছে তার প্রধানের একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। পিংকি জর্জকে লেখাটা দেখাল।

'আমি এ কাজে প্রচুর লোকসান দিই। আমরা যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি সময় লেগেছে ভিত তৈরি করতে। কারণ জমিন ছিল প্রচণ্ড শক্ত। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বলেছেন মাটিতে লৌহের পরিমাণ তাঁদের ধারণার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি। ওখানে স্কুলের বদলে আমাদের ইস্পাতের কারখানা তৈরি করা উচিত ছিল। ভূতত্ত্ববিদরা হয়তো ঠিক কথাই বলেছেন যে উল্কার কারণে হ্রদটির সৃষ্টি।'

'পয়েন্ট লেক উল্কার কারণে সৃষ্টি?' জানতে চাইল পিংকি।

'আমিও তেমনটিই শুনেছি,' জবাব দিল জর্জ। 'মাটিতে মস্ত একটা গর্ত ছিল। পরে সে গর্ত পানিতে ভরে যায়।'

'পয়েন্ট হাই-এর পানির সাপ্লাই আসে কোত্থেকে?'

'লেক থেকে। তুমি জানতে না?'

'না।'

'পিংকি, পানিতে কোন সমস্যা নেই। আমি ওই লেকের পানি খাই। তুমি পান করো। আমাদের কারো কিছু হয়নি। তাছাড়া ছাত্ররা অসুস্থ হবার সময় ওরা খুব ভালভাবে লেকের পানি পরীক্ষা করে দেখেছেন। কোন সমস্যা নেই।'

'আমার দাদুর বাড়ির পানিও আসে ওই লেক থেকে?' প্রশ্ন করল পিংকি।

একটু ভেবে জবাব দিল জর্জ। 'সম্ভবত না। উনি পাহাড়ের ওপরের পাতকুয়ো থেকে পানি তোলেন। আমার পরিবারের লোকজনও ওই কুয়োর পানি ব্যবহার করে। লেকের ওধারে, আমাদের পড়শীদের অনেকেই কুয়োর পানি পান করে।'

'লেক থাকতে লোকে কুয়োর পানি পান করে কেন?'

'তা বলতে পারব না।'

'তুমি বললে কিছু লোকের বিশ্বাস উল্কা আছড়ে পড়ে লেকটা তৈরি হয়েছে।

অন্যরা কি কথাটা বিশ্বাস করে না?'

'উল্কার কারণে লেক তৈরি হওয়ায় তো কোন ক্ষতি নেই। শুনেছি বহু আগে একটি উল্কা আছড়ে পড়েছিল এবং হাডসন-এর জন্ম ওই উল্কা থেকে। তবে পয়েন্ট লেকের বিষয়টি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা, উল্কাই পয়েন্ট লেকের জন্মদাতা।'

'আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীটি কেন এ কথাটি বিশ্বাস করে?' পিংকির প্রশ্ন।

'কারণ এ শহরে কম্পাস দিয়ে তুমি সঠিক রিডিং পাবে না। নিডলগুলো শুধু ঘুরতে থাকবে। এখানকার মাটি ম্যাগনেটিক, আর উল্কা চুম্বক দিয়ে তৈরি। তবে আমার মনে হয় না ছাত্রদের গণ-অসুস্থতা কিংবা জেনির উন্মাদনার সঙ্গে লেকের পানি অথবা উল্কার কোনরকম সম্পর্ক রয়েছে। যদি তা-ই হত তাহলে তো আমরা সবাই আক্রান্ত হতাম। শহরটি তৈরি হবার পর থেকে, গত শত বছরে হাজার হাজার মানুষ এতে আক্রান্ত হত। তারও আগে—ইণ্ডিয়ানরা ছিল এ অঞ্চলে। যদ্দূর জানি লেকের পানি পান করে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি।'

গা-টা ছমছম করে উঠল পিংকির। জানে না কেন। হয়তো ও ভাবছিল এমন একটা লেকের তীরে ওরা বাস করছে যেখানে ভিনগ্রহের বাসিন্দারা ঘাপটি মেরে রয়েছে। এ ভাবনাটাই ওর শরীরে ভয়ের বরফ জল ঢেলে দিয়েছে। লেকের পানি গরম কালেও কেমন হিমঠাণ্ডা হয়ে থাকে মনে পড়ে গেল ওর।

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' অনিশ্চিত সুরে বলল পল্লবী কেয়া পিংকি।

পাঁচ

শুক্রবার রাতে ফুটবল খেলা দেখতে গেল পিংকি।

টড এবং কেথির সম্মানে পয়েন্ট হাই-এর ফুটবল খেলা স্থগিত করার একটা প্রস্তাব উঠেছিল। শেষতক সিদ্ধান্ত হলো বাতিল করার চেয়ে দুজনের উদ্দেশে খেলাটা উৎসর্গ করাই ভাল হবে। নতুন স্কুল বর্ষের এটা প্রথম খেলা, প্রতিদ্বন্দ্বী বালটন হাই, খেলা হবে বালটনের স্টেডিয়ামে। কারণ পয়েন্ট হাই-এর নিজস্ব স্টেডিয়াম নেই।

স্কুলে গোটা হপ্তা একটু অন্যরকম কেটেছে পিংকির। সে যেখানেই গেছে ওকে উদ্দেশ্য করে পেছনে লোকের ফিসফিস শুনেছে। মোটামুটি দুটি কারণে সে স্কুলে বিখ্যাত হয়ে উঠল: প্রথমত জেনিকে সে হত্যাকাণ্ডে বাধা দিয়েছিল, দ্বিতীয়ত সে জেনির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। স্কুলে সারা হপ্তায় খুব কম লোকের সঙ্গেই পিংকির কথা হয়েছে। তবে জিম ক্লাইনকে সে ধারে কাছেও দেখতে পায়নি। হতে পারে পায়ের ঘা-টা এখনও শুকোয়নি জিমের।

তবে শুক্রবার রাতে তাকে মাঠে হাজির হতে দেখা গেল। কোয়ার্টার ব্যাক খেলবে।

পিংকি জর্জকে না বলেই খেলা দেখতে এসেছে। এজন্য একটু

অপরাধবোধে ভুগছে ও। জর্জ ওকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যেতে চেয়েছিল। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না, বাড়িতেই থাকবে বলে ওকে এড়িয়ে গেছে পিংকি। এখানে জর্জের হাজির হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে কারণ ফুটবল তার দু'চক্ষের বিষ এবং ফুটবল খেলোয়াড়রা যেন তার জনম জনমের শত্রু।

হটডগ আর বড় একটা কোক হাতে গ্যালারিতে সুবিধেজনক একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল পিংকি। জেনির কথা খুব মনে পড়ছে। গেল বিষুৎবার জেনির বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলেছে ও। কথা বলতে রীতিমত কষ্টই হয়েছে পিংকির। এমন নয় যে জেনির অসুস্থতার খবর নিতে গিয়েছিল ও। জেনির এখনও জামিন হয়নি। মামলার শুনানীই হয়নি জামিন হবে কীভাবে? জেনির বাবা-মা জানেন না তাঁদের মেয়ের জামিন হতে এত সময় লাগছে কেন। তাঁরা এমন করুণভাবে কথা বলছিলেন, কান্না এসে গেছিল পিংকির।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। আজেবাজে চিন্তাগুলো মাথা থেকে সরিয়ে খেলায় মনোনিবেশের চেষ্টা করল পিংকি। ফুটবল ওর প্রিয় খেলা। প্রায় সব খেলাই ওর পছন্দ। ভলিবল কিংবা বাস্কেটবল দলে সুযোগ পাবার অপেক্ষায় ছিল পিংকি। কিন্তু শুনে হতাশ হয়েছে এখনও কোন দল গঠন করা হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও নেই।

একনজর বোলালেই বোঝা যায় প্রায় সবার প্রিয় দল বালটন হাই। দুই দলের খেলোয়াড়রা যখন ফুটবলে লাথি মারার জন্য লাইন করে দাঁড়াল, পিংকি লক্ষ করল বালটনের প্লেয়াররা আকার-আকৃতিতে পয়েন্ট হাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণটা সহজ। বালটন হাই-এর একটি নিজস্ব স্টুডেন্ট বডি আছে আয়তনে পয়েন্টের পাঁচ গুণ। পয়েন্ট হাইস্কুল বলে প্রথম লাথি মারার সুযোগ পেল। উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল পিংকি। পরবর্তী ষাট মিনিট দারুণ উত্তেজনাকর একটি খেলা দেখল ও এবং যার মধ্যমণি ছিল জিম ক্লাইন।

জিম পাঁচটি পাস দিল, এর মধ্যে শেষেরটি ত্রিশ গজ দূর থেকে। ওর পাস ঠেকাতে গিয়ে কাউকে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে দেখল না পিংকি। জিম খুব জোরে থ্রো করে এবং নিখুঁতভাবে। তার পারফরমেন্স বিস্ময়কর তবে অতি মানবিক কোন কিছু তার মাঝে লক্ষ করল না ও। অথচ জেনি বলেছিল জিম নাকি অমানুষিক শক্তি দিয়ে বল খেলে।

চমৎকার খেলা হচ্ছিল। পয়েন্টের চেয়ে বালটনের খেলোয়াড়রা আকার-আকৃতিতে বিশালকায় হলেও তারা পয়েন্টের মত দ্রুতগতি কিংবা সুসংগঠিত নয়। প্রথমার্ধের খেলার শেষে স্কোর দাঁড়াল ২১-৭। পয়েন্ট স্বভাবতই উল্লসিত এবং উজ্জীবিত। হাফটাইম ব্রেকের সময় খেলোয়াড়রা যে যার লকারে ফিরে যেতে শুরু করেছে, পিংকি দ্রুত বেড়ার দিকে এগোল। গ্যালারি এবং মাঠকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এ বেড়া। সবশেষে মাঠ ছাড়ছিল জিম। ও পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাক দিল পিংকি।

'তুমি তো ওদেরকে ভর্তা বানিয়ে ফেললে।' বলল ও।

হেলমেট খুলে মাথা তুলে তাকাল জিম। ওকে বিজয়ী একজন গ্ল্যাডিয়েটরের মত লাগছিল। হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। 'আমরা কি আজ

রাতে কোথাও যাচ্ছি?'

'তুমি ব্যস্ত না থাকলে যেতে পারি।'

'খেলা শেষ হবার বিশ মিনিট পরে শাওয়ারের বাইরে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

'আমি থাকব ওখানে।'

দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমার্ধেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে এবারে ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাটা হলো আরও বেশি। বালটন পেরে উঠল না পয়েন্টের সঙ্গে। তবে খেলায় সুপার ন্যাচারাল কিছু ঘটল না। শুধু দু'জন খেলোয়াড় আহত হয়েছে। তাও বালটনের ফুটবল খেলায় এরকম হয়েই থাকে, ভাবল পিংকি। দ্বিতীয় খেলোয়াড়টি খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে ব্যথা পেল–তাকে বহন করে নিয়ে যেতে হলো মাঠ থেকে।

ফাইনাল স্কোর হলো ৪২-৯।

খেলা শেষ হবার পরে নির্দিষ্ট জায়গায় গেল পিংকি জিমের সঙ্গে দেখা করতে। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে তার দেখা মিলল। দেরি করার জন্য দ্রুত ক্ষমাপ্রার্থনা করল জিম। কাঁধে ইকুইপমেন্ট ব্যাগ, ভেজা চুল, জিমকে দারুণ লাগছিল। এরকম একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় আছে ভেবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে হলো পিংকির।

'ওদেরকে আসলে আমরা খেলার শুরুতেই ভড়কে দিয়েছিলাম,' পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল জিম। বিজয়ের আনন্দে গত হপ্তার করুণ ঘটনার বিষণ্নতা ওর চেহারা থেকে এ মুহূর্তে অদৃশ্য। 'ওরা আমাদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি।'

'তোমাদের জয়টা এমন সহজ ছিল ভাবছিলাম খেলা দেখতে গিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলি কিনা।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জিম। তাকাল পিংকির দিকে, 'আশা করি আমি তোমাকে নিরুৎসাহিত করিনি।'

হেসে উঠল পিংকি, বিব্রত। 'না, তুমি দারুণ খেলেছ। অথচ এই তোমরাই গত বছর কেমন গো-হারান হেরেছ।'

'গত এক বছরে আমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আসলে আমরা সবাই উন্নতি করেছি।' শান্ত গলায় বলল জিম। 'টড এবং কেথির স্মৃতি আমাদেরকে খেলাটায় বাড়তি শক্তি জুগিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল পিংকি। 'ওরা যদি বেহেশতে থেকে থাকে তোমাদের খেলা দেখে নিশ্চয়ই প্রশংসা করেছে।'

'হুঁ,' বিড়বিড় করল ও। তারপর চোখ ফেরাল পিংকির দিকে। 'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'আমি মাত্রই দুটো হটডগ খেলাম।'

'কিন্তু ডেজার্ট তো খাওনি। চলো কোথাও গিয়ে একটু পেটপুজো করি।'

'আচ্ছা,' পার্কিং লটের দূরপ্রান্তে হাত তুলে দেখাল পিংকি। ওখানে ওর গাড়ি পার্ক করা। 'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা করব,

বলো?'

মুচকি হাসল জিম। 'আমার সঙ্গে যেতে ভয় লাগছে?'

অন্ধকার ছিল বলে জিম দেখতে পায়নি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে পিংকি। ও জিমের পেশীবহুল বুকে আঙুলের খোঁচা দিল। 'আমি তোমাকে ভয় পাই না, বিগ বয়।'

ওরা যে যার গাড়িতে ফিরে এল পয়েন্টে। রাত দশটার দিকে সাইডার ক্যাফে নামে এক স্থানীয় রেস্টুরেন্টে মিলিত হলো দু'জনে। জায়গাটা বড়লোকদের জন্য—স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাউকে চোখে পড়ল না। পিংকি জানে জিম জেনির মতই পয়সাঅলা ঘরের সন্তান। জিম নিউ ইয়র্ক স্টেক, শ্রিম্প, বেকড পটেটো, সালাদ, সব্জি এবং দুধের অর্ডার দিল। বলল খেলার পরে ওর সাংঘাতিক খিদে পায়। পিংকি শুধু ভেষজ চা খেতে চাইল। এক জোড়া হটডগ খাওয়ার পরে আর খিদে নেই ওর।

'অপ্রিয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনাটা আগেভাগেই সেরে নিই, কী বলো?' খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে বলল জিম।

'জেনি এবং গোলাগুলির ঘটনা?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'হুঁ।' পেশীবহুল হাতজোড়া ভাঁজ করে টেবিলে ঝুঁকে এল জিম। মোমের আলোয় ওর কালো চোখের চাউনি ভারী চনমনে এবং উষ্ণ। দীর্ঘক্ষণ ওই চোখের তারায় তাকিয়ে থাকা যাবে না, মনে মনে বলল পিংকি। 'ফিউনেরালে আমার এবং জেনির পুরো গল্পটা তোমাকে বলিনি,' বলল ও।

'কোন্ কথাটা বলোনি?'

'তোমাকে বলেছিলাম না আমি অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছি শুনে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল জেনি?'

'বলেছ।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল জিম। 'ব্যাপারটা বড্ড বিব্রতকর। এখন বুঝতে পারছি বোকার মত কথাটা বলা উচিত হয়নি। কার সঙ্গে ডেট করছি তাও জেনিকে বলাটা ভুল হয়ে গেছে। ওকে নিজের রাস্তা মাপতে বলাটাও ঠিক হয়নি।'

গভীর দম নিল পিংকি। 'তারপর?'

'আমি তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যেতে চেয়েছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জিম।

'তুমি ওকে বলেছিলে কথাটা?'

'হ্যাঁ।'

'না বললেই ভাল করতে।'

চেয়ারে হেলান দিল জিম। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'এখন বুঝতে পারছি।'

'খোদা!' বলল পিংকি। পিটপিট করল চোখ। ওর জন্য জেনিকে ত্যাগ করতে চেয়েছিল জিম ক্লাইন। ছেলেটার মধ্যে কোথাও একটা গোলমাল আছে।

ওর ভেতরকার বিস্ময় প্রশ্নটা ঠেলে বের করে দিল মুখে। 'তুমি আমার সঙ্গে ঘুরতে যেতে চেয়েছিলে কেন?'

চেহারা দেখে মনে হলো প্রশ্নটা অবাক করেছে জিমকে, তারপর হেসে ফেলল সে। 'কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

'কেন? মানে তুমি তো আমাকে ভাল করে চেনোই না।'

'ভাল করে চেনো না এমন কাউকে তোমার কোনদিন মনে ধরেনি?'

'তা ধরবে না কেন?' জলজ্যান্ত উদাহরণ ওর সামনেই বসে রয়েছে। 'কিন্তু জেনি খুব ভাল মেয়ে।' ডানে-বামে মাথা নাড়ল পিংকি। জিমের কথা শুনে আত্মশ্লাঘা অনুভব করছে, একই সঙ্গে খানিকটা বিভ্রান্ত। 'ও নিশ্চয়ই খুব শক পেয়েছে।'

মুখ বিকৃত করল জিম। 'তা তো পেয়েছেই।'

ওর মন্তব্য ধাক্কা দিল পিংকিকে। 'তুমি কি ওকে ঘৃণা করো?'

'না। হ্যাঁ। আমি ওকে ঘৃণা করতে পারি না, কিন্তু করতে চাই। টড আমার বন্ধু ছিল।'

'আর কেথি?' পিংকি প্রতিযোগিতার বিষয়টি নিয়ে ভাবছে।

'কেথিও আমার বন্ধু ছিল। আমরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম।'

'জেনি বলেছে আমাকে।'

উৎসুক হলো জিম। 'কী বলেছে?'

চুপ করে রইল পিংকি। জিমকে নিয়ে বসে রয়েছে রেস্টুরেন্টে, তাতেই মনে হচ্ছে জেনির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। জিমের কাছে জেনি সম্পর্কে এমন কিছু বলতে চায় না যাতে প্রিয় বান্ধবীকে বিব্রত করা হয়। 'বলেছে তুমি ওর সঙ্গে শীতল আচরণ করতে, ওর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলে।'

অধৈর্য দেখাল জিমকে। 'সম্পর্ক ভেঙে গেলে ওরকম আচরণ লোকে করে। আমি ভেবেছি যা ঘটছে তা মেনে নিয়ে নিজের মত জীবনযাপন করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি রয়েছে জেনির। আর কী বলেছে তোমাকে?'

'আর কিছু না।'

'শনিবার সকালে ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'তোমাকে বললাম তো দেখা হয়েছে। ও কেন খুনগুলো করল তার কারণ আমাকে ব্যাখ্যা করেনি। তুমি আমার সঙ্গে ঘুরতে যেতে চেয়েছ সে বিষয়ে কিছু বলেনি।'

'আমি কথাটা বলিনি যদি তুমি আবার অন্য কিছু মনে কর।'

'না, ঠিক আছে,' দ্রুত বলে উঠল পিংকি, ওর বুক ধড়ফড় করছে। পরের কথাটা ও বলতে চায়নি, কিন্তু বলতে ওকে হতই। 'জেনি এখনও আমার বন্ধু।'

মাথা ঝাঁকাল জিম। 'তুমি আমার সঙ্গে যদি কথা বলতে না চাও আমি কিছু মনে করব না।'

'আমি তা বলিনি...'

'পিংক?'

'কী?'

'তুমি কী বলতে চেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'জানি না।'

টেবিলের মোমবাতির দিকে আনমনা হয়ে তাকিয়ে রইল পিংকি, তারপর চোখ তুলল জিমের দিকে। ওর তারার চারপাশটা ঘিরে আছে বেগুনি রঙের ফুটকি। এগুলো আগে কখনও লক্ষ করেনি পিংকি। অদ্ভুত এক জোড়া চোখ।

ও আমার মত মেয়ের জন্য বড্ড বেশি হট, ভাবল পিংকি।

'আমি তোমাকে পছন্দ করি,' মৃদু গলায় বলল ও।

জিমের কণ্ঠে আবার কৌতূহল ফুটল। 'আমার কোন্ জিনিসটা তোমার পছন্দ?'

পোশাকের নিচে তোমার ওই পেশীবহুল শরীরটা।

'তোমার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি আর সূক্ষ্ম রসবোধ,' বলল পিংকি।

হাসল জিম। 'ঠাট্টা করছ।'

কাঁধ ঝাঁকাল পিংকি। 'আই জাস্ট লাইক ইউ। ইউ আর কিউট।'

হাত বাড়িয়ে পিংকির হাত মুঠোয় নিল জিম। 'তুমি খুব সুন্দর।'

পিংকির গালে রঙের ছোপ। 'জেনির তুলনায় আমি কিছুই না।'

'জেনি এখন জেলে। ও হয়তো ওখান থেকে কোনদিন ছাড়াও পাবে না। ওকে নিয়ে আর কথা না বলি।'

পিংকিকে আপত্তির সুরে কিছু বলতে যেতে দেখে একটা আঙুল তুলল জিম। হঠাৎ কঠোর শোনাল কণ্ঠস্বর।

'অন্তত আজ রাতে নয়, ঠিক আছে? এসো মজা করি।'

মাথা নামাল পিংকি। 'ঠিক আছে।'

জিমের খাবার এসে গেছে। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল প্লেটের ওপর। পিংকি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখল দ্রুত খাবারগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জিমের প্লেট থেকে। না চিবিয়েই গিলে ফেলছে খাবার। খাবার চিবিয়ে খাওয়া উচিত এ নিয়ে জিমকে বক্তৃতা শোনাতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করল পিংকি। প্লেট চেটেপুটে শেষ করে ডেজার্ট এবং চিকসেকের অর্ডার দিল জিম।

পিংকি শুধু ওর খাওয়া দেখছে।

বাবার ক্রেডিট কার্ড দিয়ে খাবারের বিল মিটিয়ে দিল জিম।

'এখন কী করবে?' রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল ও। গরম একটুও কমেনি যদিও এখন প্রায় মাঝরাত।

'সোজা বিছানায় যাব,' জবাব দিল পিংকি। তারপর মুচকি হেসে যোগ করল, 'তুমি ইচ্ছা করলে তোমার গাড়ি নিয়ে আমার বাড়ি পর্যন্ত আসতে পার। আমি এখনও তেমন ক্লান্ত হইনি। কাজেই দু'জনে মিলে একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারি।'

পিংকি জানে ও গভীর রাতে বাড়ি ফিরলেও দাদু কিছু বলবেন না। কারণ পিংকিকে তিনি শুরু থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। যদিও ও সে স্বাধীনতার খুব একটা অপব্যবহার করে না। আজ কেন জানি ইচ্ছে করছে একটু রাত করে বাড়ি ফিরতে।

'লেকের পাড়ে?' জানতে চাইল জিম।
'তোমার যেখানে খুশি, জিম।'

ছয়

পিংকিদের বাড়ি পৌঁছার সময় মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা প্রায় ঘটিয়ে ফেলেছিল জিম। ড্রাইভওয়েতে পিংকির পাশাপাশি গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরু রাস্তায় পাশাপাশি দুটো গাড়ি চলা সম্ভব নয়। ভারসাম্য হারিয়ে জিমের ফোর-হুইল ড্রাইভের ফ্রন্ট বাম্পার সোজা গিয়ে বাড়ি খেল পিংকির দাদুর প্রোপেন ট্যাংকে। কী কাণ্ড করেছে বুঝতে পেরে গাড়ি থেকে লাফ মেরে নেমে এল জিম।

'আমি কি ওটার সিল ভেঙে ফেলেছি?' জিজ্ঞেস করল ও। নিজের গাড়িতে উঠে যান্ত্রিক বাহনটাকে সামান্য পিছিয়ে নিল।

পিংকি ছুটে গেল ট্যাংক অভিমুখে। শহরের মেয়ে সে, প্রোপেন ট্যাংক সম্বন্ধে তেমন ধারণা নেই। জিমের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ট্যাংক পরীক্ষা করে দেখল। ট্যাংকের ধাতব দেয়াল তুবড়ে গেছে। ব্যাপারটা ওকে চিন্তিত করে তুলল। জিম চলে এল ওর পাশে, বিরাট পাঞ্জা বোলাল ডেবে যাওয়া ধাতব দেয়ালে।

'মনে হয় কোন সমস্যা হয়নি,' মন্তব্য করল সে।

'ঠিক জানো? নাকি দাদুকে ডেকে আনব?'

'কোন ঝামেলা তো দেখতে পাচ্ছি না। ট্যাংক ফুটো হয়ে গেলে বুঝতে পারতাম। তবে সকালে একবার এটাকে চেক করে দেখা উচিত। মেরামতির প্রয়োজন হলে টাকা যা লাগে আমি দেব।'

'ট্যাংক আবার বিস্ফোরিত হবে না তো?' ঘরে যেতে যেতে প্রশ্ন করল পিংকি। ওর মনে হচ্ছে আণবিক একটা বোমার সঙ্গে আছে ও। যে কোন মুহূর্তে—ভিড়িম!

'বিস্ফোরিত হতে হলে প্রচণ্ড ধাক্কা বা সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়,' জিম দাঁড়িয়ে গেল। নজর বোলাল চুয়াল্লিশ ফুট লম্বা মোচাকৃতির সিলিণ্ডারের দিকে। 'তোমার দাদুর কাছে এতবড় একটা ট্যাংক আছে ভেবে অবাক লাগছে আমার। বড় বড় খামার বাড়িতে, বড় গোলাঘর গরম রাখতে এ ধরনের ট্যাংক ব্যবহার করা হয়।'

'দাদু বলেছে বছর দশেক আগে এদিকে সাকুল্যে পাঁচটা পরিবার বাস করত। তারা সবাই এই একই ট্যাংক ব্যবহার করেছে।'

'ওই বাড়িঘরগুলোর কী হলো?'

'বোধহয় সবগুলো পুড়ে গেছে।' বলল পিংকি। 'তখন তোমার বয়স বড় জোর বছর আষ্টেক হবে। এরকম কোন কিছুর কথা তোমার মনে পড়ে?'

'অল্প অল্প। অস্পষ্ট।'

'পয়েন্ট শহরের জল হাওয়াতেই তুমি বড় হয়েছ, না?'

'হ্যাঁ।' ট্যাংকের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'বড়সড় একটা আগুন লাগলেই এ বুড়ো শেষ।'

'কিন্তু বিস্ফোরণটা ঘটবে কীভাবে?'

'ট্যাংকটা ভরা থাকলে ওটা বাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত।' মটমট করে হাতের আঙুল ফোটাল জিম। 'ঠিক এভাবে।'

'আমার দাদু এই তো সেদিন ট্যাংক ভরল।'

হেসে উঠল জিম। 'তাহলে আমি আর বাড়িতে ঢুকছি না, বাপু।'

কল্পনায় বিশাল বিস্ফোরণের ছবি দেখছে পিংকি। অকারণেই উত্তেজনা বোধ করল ও। 'ট্যাংক বিস্ফোরিত হলে জমিনে কি ওটা উল্কার মত গর্ত তৈরি করতে পারে?'

'কী?'

'তুমি তো জানোই গল্পটা। এখানে ছোটখাট একটা উল্কা ছিটকে পড়েছিল, না?'

'মনে হয় না সেরকম কিছু ঘটবে। কিন্তু জানতে চাইছ কেন?'

'এমনি।' বলল পিংকি।

পিংকি বাথরুমে গেল। জিম ওর পেছন পেছন ঘরে ঢুকল। প্লাস্টিক লিভিংরুমের সোফায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। একটু নড়লও না। প্রীতম চৌধুরী বাড়িতে নেই। আজও এক বন্ধুর বাড়িতে দাবার আড্ডা বসেছে। সেখানে গেছেন।

বাথরুম সেরে পিংকি আর জিম হাতে হাত ধরে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। হাঁটতে লাগল হ্রদের তীর ধরে। জিম ওর নরম হাত নিজের শক্ত মুঠোয় বন্দি করেছে। কেউ কোন কথা বলছে না। জেনির কথা ভেবে একটু একটু অপরাধবোধে ভুগছে বটে পিংকি, কিন্তু জোর করে বান্ধবীর চিন্তা সরিয়ে দিল মাথা থেকে। পশ্চিমের আকাশে নিচু হয়ে ঝুলছে আধখানা চাঁদ, রুপোলি রশ্মির প্রতিফলনে ঝিলিমিলি হ্রদের জল, জোছনা আদর মাখছে দুই তরুণ-তরুণীর নগ্ন বাহুতে। রাতের নৈঃশব্দে অদ্ভুত ছন্দ তুলেছে লেকের দিকে মুখ ফেরানো পাহাড়ের ওপর বসানো তেলকূপের তেল তোলার মেশিনের একটানা শাঁই শাঁই শব্দ। পিংকির চোখে তেলকূপগুলো লেকের অনেকটাই সৌন্দর্যহানি করছে। জিমকে বললও সে কথা।

'ওই তেলকূপগুলো কিন্তু আমাদেরকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এনে দিচ্ছে,' বলল জিম। 'গত পাঁচ বছর ধরে ওই কূপ থেকে হাজার হাজার ব্যারেল তেল তোলা হচ্ছে। আর ওগুলো তেমন শব্দও করে না। তোমার কানে বাজছে কারণ এখন রাত গভীর এবং চারদিক নীরব। ওগুলো আধুনিক কুয়ো, এয়ার প্রেশারে কাজ করে।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন ওগুলো তোমার দোস্তো।'

হাসল জিম। 'আমার বাবা ওই বারোটি তেলকূপের কুড়ি পার্সেন্ট মালিক। আমি যে গাড়িটি চালাই সেটি কেনা হয়েছে ওই তেলের টাকা দিয়েই।'

জিমের হাত ছেড়ে দিল পিংকি, খেলাচ্ছলে ধাক্কা দিল ওকে। 'তুমি এখনও হাইস্কুলের গণ্ডি পার হতে পারনি অথচ ইতিমধ্যে অর্থলোভী পরিবেশ ধ্বংসকারীদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছ।'

ওকে খপ করে ধরে ফেলল জিম, টেনে আনল কাছে।

'এ পৃথিবী নিয়ে কে ভাবতে চায়? এখানে জন্ম নিয়েছি কেবল ফুর্তি করতে।'

'আমাদের সন্তানদের কী হবে? তাদের ছেলে-মেয়েদের?'

'আমি তাদের নিয়ে ভাবি না।'

'ভাবা উচিত,' বলল পিংকি, টের পেল ওর মুখের ওপর গরম নিঃশ্বাস ফেলছে জিম।

'কেন? ওদের হয়তো কোনদিন জন্ম না-ও হতে পারে।'

জিম আগ্রাসী চুমু খেল পিংকিকে। নিজেকে ও সমর্পণ করল জিমের কাছে। জিম ওকে শক্ত করে চেপে ধরে থাকল। সুদীর্ঘ চুম্বনে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় পিংকির। এমন সময় ওকে ছেড়ে দিল জিম।

'আমি কি একটু নিঃশ্বাস নেয়ারও সুযোগ পাব না?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পিংকি।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জিম। 'আমি তোমাকে আমার নিঃশ্বাস দেব।'

ওর হাতটা ধরে ফেলল পিংকি। 'এক মিনিট। আমার জন্য বড্ড দ্রুত হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা।'

হাসল জিম। হাতটা নিজের পাশে ছেড়ে দিল, তাকাল পানির দিকে। 'সাঁতার কাটবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পানি খুব ঠাণ্ডা।'

শার্ট খুলতে লাগল জিম। 'হাহ! আমরা দু'জনেই গরম হয়ে আছি। তাছাড়া রাতটাও বেশ উষ্ণ। এসো।'

'আমি বেদিং সুট আনিনি।'

শার্ট খুলে ফেলল জিম। হাসতে হাসতে বলল, 'তাহলে তো আরও ভাল।'

'দাঁড়াও,' বলল পিংকি।

'কী?'

'আমি সাঁতার জানি না,' মিথ্যা বলল ও।

'আমরা গভীর পানিতে নামব না।'

'আমার সর্দি লেগেছে।'

'পিংক।'

'সত্যি বলছি। এখন পানিতে নামা ঠিক হবে না।'

চাঁদের দিকে মুখ তুলে হেসে উঠল জিম। 'আমি সাঁতার কাটতে গেলাম। ইচ্ছে হলে এসো। নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সাঁতার কাটা দেখো। তবে দেখলে বিপদ আছে। কারণ আমি হুট করে টান মেরে তোমাকে পানিতে নামিয়ে আনতে পারি। এরকম আগেও করেছি, তুমি জানো।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল পিংকি। 'না, আমি জানতাম না।'

জিম জামাকাপড় খুলে শুধু শর্টস পরে দৌড়ে গেল লেকে, বাচ্চাদের মত পানি ছিটাতে লাগল। কোমর পানিতে নেমে ডাইভ দিল। কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ দূরে যাওয়ার পরে ভেসে উঠল। ও খুব ভাল সাঁতারু। ওর সঙ্গে সাঁতার কাটছে চাঁদের আলো, রূপার ঢেউ হয়ে বুদ্বুদ ছড়িয়ে পড়ছে।

'কাম অন!' হাঁক ছাড়ল জিম।

'নেক্সট টাইম।' চেঁচাল পিংকি।

সিকি মাইল দূরে, লেকের মাঝ বরাবর সাঁতার দিল জিম। পিংকি আশংকা করল জিম হয়তো অতটা যেতে পারবে না, ঠাণ্ডায় খিঁচ ধরবে শরীরে। ডুবে যাবে। কিন্তু ওর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে লেকের মাঝখানে পৌঁছে গেল জিম। তারপর ডিগবাজি খেয়ে অলস ভঙ্গিতে ফিরতে লাগল তীরে। পিংকি এক পায়ের জুতো খুলে ফেলল। পায়ের পাতা ডোবাল পানিতে। পাতালের স্রোতের সঙ্গে এ লেকের নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে, ভাবল ও। গত কয়েক মাস ধরে এখানকার তাপমাত্রা আশি ডিগ্রির ওপরে কিন্তু পানির তাপমাত্রা ষাট ডিগ্রির ওপরে হবেই না।

জিমের তাগত নিশ্চয়ই অনেক বেশি না হলে এমন ঠাণ্ডা পানিতে ও এতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারত না। জিমের তাগতের উদাহরণ একটু পরেই পেয়ে গেল পিংকি। তীরে এসে পড়েছে জিম। পানি থেকে উঠেই ছুটে এল পিংকিকে লক্ষ্য করে। ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইল না পিংকির। কয়েকদিন আগেও ওর জীবন ছিল বিশ্রীরকম পানসে, আর এখন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ওকে ধাওয়া করছে অত্যন্ত সুপুরুষ এক তরুণ যার বাহুডোরে বাঁধা পড়ার স্বপ্ন প্রায়ই সে দেখেছে। জিমের দিকে একপলক তাকিয়েই ও বুঝতে পারল ওকে পানিতে নামানোর মতলব করেছে ছেলেটা। ছুট দিল পিংকি। ঘাসে মোড়া তীর ধরে দৌড়াল। ঢুকে পড়ল গাছপালার ভেতরে।

'আমার ঠাণ্ডা লেগেছে!' চেঁচিয়ে জিমকে শোনাল পিংকি।

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না!' বলল জিম।

একটা ঝোপের আড়াল নিল পিংকি। এখানে অবশ্য সহজেই ওকে খুঁজে বের করতে পারবে জিম। তখন ও জিমের সঙ্গে ভিজতে রাজি আছে।

হঠাৎ জিমের আর্তচিৎকার শুনতে পেল পিংকি। ঝোপের আড়ালে উবু হয়ে বসে ছিল, দাঁড়িয়ে গেল ঝট করে। ভাবল ওর সঙ্গে চালাকি করছে জিম। জিমকে পঞ্চাশ হাত দূরে দেখতে পেল ও, একটা গাছের পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে, ডান হাতটা চেপে ধরে রেখেছে। চেহারা দেখে মনে হলো ব্যথা পেয়েছে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে প্যান্ট পরে নিয়েছে জিম।

আমি আর কাউকে ওর মত এত দ্রুত প্যান্ট খুলতে এবং পরতে দেখিনি, ভাবল পিংকি।

ও দ্রুত চলে এল জিমের কাছে। ওকে সিধে হতে সাহায্য করল।

'তোমাকে ধরার জন্য বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করছিলাম,' দুষ্টু হেসে বলল জিম।

'খোদা।' ফিসফিস করল পিংকি। জিমের ডান হাত রক্তে লাল। তবে

কোথায় কেটেছে বুঝতে পারছে না।

'কী হয়েছে?'

'একটা গাছের সঙ্গে বাড়ি খেয়েছি,' ওদের পাশে একটা গাছ আঙুল তুলে দেখাল জিম। 'এটা।'

'লেগেছে?'

'গাছের? আমার দিকে ও ছুটে আসছিল, কাজেই ওর লেগেছে।'

খিলখিল হাসল পিংকি। 'যেমন কর্ম তেমন ফল। আমাকে ভেজানোর মতলব করেছিলে, শাস্তিও পেয়েছ। আমার বাসায় চলো। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিই।'

প্রথমে রাজি হলেও পরে লেকের পাড়ে যেখানে শার্ট খুলে রেখেছিল জিম, সেখানে এসে মত বদলাল। ও পানিতে ক্ষত ধুয়ে নিয়ে শার্ট ছিঁড়ে ফালি দিয়ে নিজেই ব্যাণ্ডেজ করতে চায়। ওর ক্ষতস্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

'হাত দিয়ে ক্ষতটা চেপে রাখো,' বলল পিংকি। 'তাহলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে।'

'চাপ দিলে ব্যথা পাব। চাপ দিতে চাই না।'

লেকের দিকে ফিরে ইশারা করল পিংকি। 'পানিটা কি পরিষ্কার?'

'লেকের পানিই আমরা স্কুলে খাই।'

'আমিও তা-ই শুনেছি।'

'কী শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'বাদ দাও। এসো, শার্টটা পানিতে ভিজিয়ে নিই।' জিমের পাশে এসে দাঁড়াল পিংকি, শার্টটা তুলে ধরল। 'দেখি তো কতটা কেটেছে।'

'খুব জ্বলবে কিন্তু,' চেহারা বিকৃত করে বলল জিম।

পিংকি দেখল বেশ গভীরভাবে কেটেছে। পানি দিয়ে ক্ষত ধোয়ার আগে একটু ইতস্তত করল জিম। পিংকি ওর পাশে উবু হয়ে বসল, ওর প্যান্টও ভিজে গেল।

'আমি সাহায্য করব?' জানতে চাইল ও।

'আমি কি বাচ্চাদের মত আচরণ করছি?'

'একদমই না।'

'গুড,' বলল জিম। 'আমি কি তোমাকে আবার চুমু খেতে পারি?'

'পারো। তবে আগে–'

পিংকির অধরে ঠোঁট চেপে ধরে ওর জবান বন্ধ করে দিল জিম। আবারও দীর্ঘ এবং কঠিন হলো চুম্বন পর্ব। জিম পিংকিকে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল।

জিম ওকে কাছে টেনে নিয়েছে, পেটে গরম, আঠালো কিছুর স্পর্শ পেল পিংকি। ও ভুলেই গিয়েছিল জিমের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। ও ঝট করে উঠে বসল, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল জিমকে।

'তোমার রক্ত লাগছে আমার গায়ে!' চেঁচিয়ে উঠল পিংকি।

'ইট'স ওকে।'

'নো, ইট'স নট ওকে।' রক্ত লেগেছে পিংকির পেট এবং বুকে। 'তুমি আমাকে একদম নোংরা করে ফেলেছ।' অনুযোগের সুরে বলল পিংকি।

হেসে উঠল জিম। 'ধুয়ে ফেললেই হবে।'

'ধুয়ে ফেললেই হবে না।' একটু বিরতি দিল পিংকি। 'তোমার হাতের কী অবস্থা?'

চাঁদের আলোয় হাত উঁচু করে ধরল জিম। গোটা হাত রক্তে মেখে গেছে। 'খুব শিগগির রক্ত বন্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ও।

'জিম! তোমার অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ। শিরাটিরা কেটে গেছে কিনা কে জানে!'

'এজন্যেই আমার জামাটা ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছি।'

'তুমি আসলে আমার জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছ।'

ওকে খপ করে ধরল জিম। 'ঠিক বলেছ।'

জিমকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল পিংকি। 'তোমার রক্ত পড়া বন্ধ করা দরকার।'

নেকড়ের মত হাসল জিম। 'তুমি এখানে একটু চুমু খেলেই পারো। তাহলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।' রক্তাক্ত হাতটা পিংকির মুখের সামনে নিয়ে এল সে।

মাথা ঘুরিয়ে নিল পিংকি। 'তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার বমি পাচ্ছে! তোমার শার্ট কোথায়? আমি শার্টটা তোমার হাতে বেঁধে দেব। থাক, পানিতে ক্ষত ধুতে হবে না। তাতে রক্ত পড়া বাড়বে বই কমবে না।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে।'

জিমের শার্ট দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল পিংকি। মিনিটখানেক বসে রইল দেখতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিনা। মনে হচ্ছে রক্তপাতের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গিয়ে পিংকির হাত, জামা-কাপড় রক্তে মাখামাখি।

'রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যাবে,' বলল পিংকি, উঠতে যাচ্ছে।

'চলো ফিরি।'

'আরেকটু থাকো।'

'জিম।'

ওকে চেপে ধরে আবার চুমু খেতে লাগল জিম। ওকে অনেক কষ্টে ঠেলে সরাল পিংকি। আবার চুমু খাওয়ার সুযোগ না দিয়ে লাফ মেরে খাড়া হলো ও।

'আমরা এখন যাব,' বলল পিংকি।

ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল জিম।

'এত জলদি?'

'হ্যাঁ,' জিমের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'সূর্য ওঠার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে।'

গাড়িতে ওঠার আগে, বিদায় বেলায় জিম আরেকবার চুম্বন করল পিংকিকে। পিংকি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজি হলো না জিম। বলল ও ঠিক আছে। জেনি ঠিকই বলেছিল জিম একটা দানব। বড্ড খিদে তার।

তবে জিম যখন ওকে স্পর্শ করছিল, স্বপ্নিল আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল

পিংকির তনুমন।

তবে ও আমার প্রিয় দানব।

বাড়ি ফিরল পিংকি। বিছানায় শোয়ার পরে নিজেকে বড্ড একা লাগল। মনে হচ্ছিল ও অচেনা একটা জগতে প্রবেশ করেছে।

এ দুনিয়াটি জ্যান্ত। কোটি কোটি বছর ধরে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হচ্ছে সে। এ দুনিয়ার মৃত্যু নেই। এখানে জীবনের প্রবেশ ঘটলে সে তাকে বিশেষ একটি পদ্ধতিতে হত্যা করে তারপর খেয়ে ফেলে এবং তাকে দেয় অনন্তজীবন যা তার নিজের অংশ। এর গতি কখনও থেমে থাকবে না, এ বিশ্বাস করে তাকে কেউ থামাতেও পারবে না।

এ দুনিয়া সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে।

বিশেষ করে তাদের জন্য, এ দুনিয়া দর্শনে যাদের আগমন ঘটে।

ওরা তার খুব সহজ শিকার।

ফুলে ছাওয়া তৃণভূমি ধরে হাঁটার সময় নিজেকে দর্শনার্থী বলে মনে হচ্ছিল পল্লবী কেয়া পিংকির। সূর্য ঝলমলে আলো ছড়াচ্ছে কিন্তু আকারে যেন ছোট। তবে তাতে কিছু আসে যায় না। পিংকি স্বর্গে প্রবেশ করেছে এবং নিজেকে তার সুখী লাগছে। ভ্রমণটা ছিল দীর্ঘ, এখন সে আরামে, মুক্তভাবে, সকলের অগোচরে বিশ্রাম নিতে পারবে।

বাতাসে কীসের মিষ্টি গন্ধ। একটা জলধারার পাশে এসে উবু হলো পিংকি। পানি পান করবে। কিন্তু তেষ্টা মেটানোর পূর্ব মুহূর্তে একটা দৃশ্য দেখে সে চমকে গেল। সূর্যটাকে হঠাৎ করেই ঘন, কালো একটুকরো মেঘ গ্রাস করেছে। মেঘের আড়ালে সূর্য ডুব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার ঘনাল তৃণভূমিতে, তবে পরিবর্তনটা স্বাভাবিক নয়। আলোর রঙ বদলে গেছে। অদ্ভুত মেঘখণ্ডটি থেকে লাল আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিংকির মাথার ওপরে সূর্যটাকে রোগাক্রান্ত হৃৎপিণ্ডের মত লাগল।

'খোদা,' ফিসফিস করল পিংকি। চোখ কুঁচকে তাকাল আকাশে। কিন্তু ওখানে খোদা নেই। এরকম জায়গায় খোদা থাকেন না।

গরম লাগছে পিংকির। নাকে একটা গন্ধ ধাক্কা মারল। গন্ধটা মিষ্টি নয়–তবে কেমন চেনা চেনা গন্ধ। পিংকি বুঝতে পারল কীসের গন্ধ।

'না,' ফিসফিস করল ও। 'না, খোদা।'

আকাশের বুক ফালাফালা করে দিল বিদ্যুতের তরবারি। যেন বিশাল এক দানবের পেট চিরে ফেলা হলো। তবে যে জিনিসটার বিস্ফোরণ ঘটল সেটা একখণ্ড মেঘ। কিন্তু সাধারণ মেঘ নয়। মেঘের কাটা বুক দিয়ে ঝরতে লাগল রক্ত। বৃষ্টির মত অঝোরে ঝরছে পৃথিবীতে।

কিন্তু পিংকি তো পৃথিবীতে নেই। ও অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছে স্বর্গে যাবে বলে, দুর্ভাগ্যক্রমে ঢুকে পড়েছে নরকে।

রক্তে পিংকির পুরো শরীর ভিজে গেল। শীঘ্রি ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যে সব কিছু

রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। নাকে শুধুই রক্তের গন্ধ। পিংকির পায়ের নিচ দিয়ে রক্তের নহর বইছে। কিন্তু রক্ত শুধু আকাশ থেকে মাটিতে পড়েনি। আগে মাটি ফেটে বয়ে গেছে রক্তের নদী।

ওর পায়ের নিচে রক্তের সঙ্গে কী যেন মিশে গেছে। এটা পৃথিবীর মস্তিষ্ককোষ। এ কোষগুলো পৃথিবীকে দিয়েছে চিন্তা করার শক্তি, ইচ্ছা, কামনা-বাসনা। পৃথিবীর পেটে ছিল তীব্র খিদে যা কখনও পূরণ হবার নয়।

হঠাৎ পিংকির পায়ে ভয়ঙ্কর ব্যথা অনুভূত হলো। চিৎকার দিল ও, দাপাদাপি শুরু করল। কোটি কোটি অদৃশ্য দাঁত যেন ওর পায়ের পাতা খেয়ে ফেলছে। সেই কামড় থেকে রক্ষা পেতে লাফাচ্ছে পিংকি। কিন্তু কামড়ের যন্ত্রণাটা তীব্র। ভারসাম্য রক্ষা করতে পারল না পিংকি, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রক্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দানব উঠে এল ওর গায়ে, মুখে, এমনকী হাঁয়ের মধ্যেও ঢুকে গেল, তারপর কুরে কুরে খেতে লাগল মাংস...

ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল পিংকির। ঝট করে উঠে বসেছে বিছানায়, বুকের খাঁচায় লাফাচ্ছে কলজে, পরনের নাইট-গাউন ঘামে ভিজে সপসপে। লাফ মেরে নামল বিছানা থেকে, ছুট দিল বাথরুমের দিকে। কিন্তু তার আগেই হড়হড় করে বমি করে দিল। কয়েক মিনিট ঘরের মেঝেয় পড়ে রইল ও, আগুন-গরম নিঃশ্বাস ফেলছে, যদিও ওর হাত-পা বরফ ঠাণ্ডা।

অবশেষে সিধে হলো পিংকি, ফিরে এল বিছানায়। কিন্তু তক্ষুণি ঘুম এল না। ওই স্বপ্নটা আর দেখতে চায় না পিংকি। কক্ষনও না।

সাত

বেডরুমের দরজায় দুমদুম করাঘাত করে পরদিন সকালে পিংকির ঘুম ভাঙাল ওর বন্ধু জর্জ উইনস্টন। গুটিয়ে উঠে বিছানায় গড়ান দিল পিংকি। ওর মুখের ভেতরটা শুকনো, হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ শব্দ বাড়ি মারছে মাথায়। ও জানে দরজায় কড়া নাড়ছে জর্জ। দাদু কখনও ওর ঘুম ভাঙান না। নিজে প্রায়ই দেরি করে ঘুমান বলে কেউ লেট লতিফ হতে চাইলে তার ঘুমের ডিস্টার্ব করেন না।

'ভাগো,' ঘুম জড়ানো গলায় বলল পিংকি।

দরজা একটু ফাঁক করল জর্জ। 'আসব?'

'না।'

এবারে পুরো দরজা খুলে ফেলল জর্জ। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

চোখ বুজল পিংকি। 'জানি না। বোধহয় ফ্লুতে ধরেছে।'

নাক কোঁচকাল জর্জ। 'বমি করেছ নাকি?'

'হুঁ।'

'টয়লেটে গেলেই পারতে।'

'সামলাতে পারিনি।' চোখ মেলল পিংকি। 'ক'টা বাজে?'

'এগারোটা।'

পিংকির পাশে, বিছানায় বসল জর্জ। 'কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

'আমি এখানে ছিলাম, আমি সেখানে ছিলাম,' বিছানার চাদরটা চিবুকের কাছে শক্ত মুঠিতে ধরে রইল। ওর পরনে শুধু নাইটগাউন। ব্রা পরেনি। দেখল গতরাতের জামা-কাপড় ঘরের এক কোণে ফেলে রাখা। 'সত্যি এগারোটা বাজে?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'হ্যাঁ,' ওর কপালে একটা হাত রাখল জর্জ। 'নাহ, কপাল তো ঠাণ্ডা। জ্বর হয়নি।'

'ভাল খবর।' পিংকির মাথা ব্যথা করছে না কিন্তু মনে হচ্ছে মাথার ভেতরে কী যেন ঠেসে ঢোকানো রয়েছে। গতরাতের দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। শিউরে উঠল। এমন বিশ্রী স্বপ্ন দেখার মানে কী?

'ঠাণ্ডা লেগেছে?' জানতে চাইল জর্জ।

'না। মনে হয় কাল রাতের খাবারটা ঠিক হজম হয়নি।'

'কী খেয়েছিলে?'

'দুটো হটডগ।' ইতস্তত করছে পিংকি। 'কাল রাতে খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'একা?'

'হুঁ।'

'আমাকে বললে না কেন?'

'তুমি তো ফুটবল খেলা পছন্দ কর না।'

'কিন্তু চিয়ারলিডারদেরকে তো পছন্দ করি।' বলল জর্জ।

'খেলায় আমরা জিতেছি।'

বিস্মিত দেখাল জর্জকে। 'বালটনের বিরুদ্ধে?'

'ওদেরকে আমরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। বিয়াল্লিশ বনাম নয়।'

'দারুণ। জিম ক্লাইন কেমন খেলল?' জিজ্ঞেস করল জর্জ।

'কী?'

'জিম। কোয়ার্টার ব্যাক, যাকে জেনি বলেছে দানব।'

'দুর্দান্ত।'

শিস দিল জর্জ। 'ও তো গতবার মাঠে সব গুবলেট করে ছেড়েছিল। এবার হয়তো নিজেকে বদলে ফেলেছে।'

লেকের দিকে তাকাল পিংকি। প্লাস্টিক যথারীতি ব্যালকনিতে শুয়ে পা[illegible] দেখছে। রোদ পড়ে এমন ঝলমল করছে পানি, ধাঁধিয়ে যায় চোখ। 'আমি এখ[illegible] গোসল করব,' বলল পিংকি। 'তারপর ড্রেস পরব।'

'আমি কি সে দৃশ্য দেখতে পারি?' মুখ বাড়িয়ে বলল জর্জ।

হেসে ফেলল পিংকি। 'আরেকটু বড় হও তারপর।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জর্জ। শাওয়ার নিল পিংকি। তারপর নাশ্তা[illegible] টেবিলে চলে এল। এখন একটু ভাল লাগছে। খিদেও পেয়েছে বেশ। দাদু[illegible]

ঘরের দরজা বন্ধ। কিচেন টেবিলে তিনি চিরকুট রেখে গেছেন।

মামণি,

শিকাগো গেলাম ঘোড়দৌড় দেখতে। নিজের যত্ন নিয়ো। তোমার বাবা-মা'র মেজাজ খারাপ হয় এমন কিছু করতে চাইলে করতে পারো।

তোমার বুড়োটা

'তোমার দাদু আসলে একটা মজার মানুষ,' বলল জর্জ। 'এ বয়সেও জীবনটাকে কী দারুণ উপভোগ করছেন। সত্তর বছর বয়সে আমিও তোমার দাদুর মত থাকতে চাই।'

'আশা করি সত্তর বছর বয়সেও আমার প্রতি তোমার আগ্রহ একটুও কমবে না,' রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল পিংকি।

'বড় হও বলতে তুমি বুড়ো হতে বলছ?'

হিহি করে হাসল পিংকি। 'সময়ই সেটা বলে দেবে।' টেবিলের ওপর ছড়ানো স্থানীয় খবরের কাগজের দিকে ইঙ্গিত করল। 'নতুন কোন খবর আছে?'

জর্জ বলল, 'কেন, নতুন খবরটা তুমি জান না? কাল রাতে তো তুমি ওখানেই ছিলে।'

'মানে?'

কাগজটা পিংকির দিকে ঠেলে দিল জর্জ। প্রথম পাতায় বালটন হাইস্কুলের ফুটবল দলের একজন খেলোয়াড়ের ছবি ছাপা হয়েছে। সুদর্শন এক তরুণ—নাম ফ্রেড কিথ। হেডিংয়ে লিখেছে ঘাড় মটকে খেলোয়াড় পঙ্গু।

আঁতকে উঠল পিংকি। 'কী? ওকে যখন মাঠ থেকে নিয়ে গেল তখন দেখে তো মনে হয়নি ও মারাত্মক আহত হয়েছে! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ওর গলায় টিউব ঢোকানো হয়েছে,' করুণ মুখ করে ডানে-বামে মাথা নাড়ল জর্জ। 'নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লেগেছিল বেচারার।'

পিংকি লেখাটি পড়ল।

গতরাতে বালটন হাইস্কুলের জুনিয়র ছাত্র ফ্রেড কিথকে বালটন মেমোরিয়ালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঘাড়ে আঘাতজনিত কারণে ভর্তি করা হয়। বালটন হাই এবং পয়েন্ট হাই-এর মধ্যকার খেলায় সে আঘাত পেয়েছে। ফ্রেড রাইট ডিফেনসিভ গার্ড হিসেবে খেলছিল। শুরুতে আঘাত তেমন মারাত্মক বলে মনে হয়নি। দলের ট্রেনার এবং একজন সহকারী কোচের সাহায্যে ফ্রেড মাঠ ত্যাগ করে। প্রাথমিক পরীক্ষায় তার সার্ভাইকাল ইনজুরি হয়েছে ভেবে স্ট্রেচারেও তাকে তোলা হয়নি। দলের ট্রেনার স্টিভ স্পারবার পরে জানান তিনি ফ্রেডের আঘাত পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং আঘাতটা তাঁর কাছে মারাত্মক কিছু বলে মনে হয়নি। 'ছেলেটার সঙ্গে ওর খুব জোরে ধাক্কাও লাগেনি,' বলেন মি. স্পারবার।

ছেলেটা মানে ল্যারি জুরের বলেছে সে আশা করছে ফ্রেড শীঘ্রি সুস্থ হয়ে যাবে।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে জানা যায় ফ্রেডের ঘাড়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ সার্ভাইকাল কর্ড মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘাড়ের ওই অংশ ক্ষতিগ্রস্ত

'হুঁ।'

শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল জেনির। 'কবে,-কোথায় দেখা হলো?'

'স্কুলে।'

'কিছু বলেছে?' জানতে চাইল জেনি।

'বলেছে। বলল সে তোমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবে না শুনে নাকি তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

পাতলা হাসি ফুটল জেনির ঠোঁটে। 'আর কী বলল?'

'আর কিছু বলেনি।'

'ঝেড়ে কাশো, পিংক।'

পিংকির গলার স্বর তীক্ষ্ণ শোনাল। 'তুমি ঝেড়ে কাশো, জেনি। গতবার তোমার সঙ্গে কথা বললাম তুমি আজগুবি একটা গল্প শুনিয়ে দিলে ওরা নাকি এলিয়েন তাই তুমি ওদের দু'জনকে খুন করেছ।'

'আমি কখনও বলিনি যে ওরা এলিয়েন। তুমিই বলেছিলে কথাটা।'

'তুমি ওদেরকে দানব বলেছিলে। যা হোক, আমি এসব শুনে ক্লান্ত। আমাকে সত্যি কথাটা বলো সেদিন পার্টিতে শটগান নিয়ে হাজির হয়েছিলে কেন?'

চোখ সরু করে ওকে দেখছে জেনি। 'তোমার কী হয়েছে, পিংক? ভয় পেয়েছ কেন?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল পিংকি। 'গতকাল খেলতে গিয়ে একটা ছেলের ঘাড় ভেঙেছে।'

আগ্রহী দেখাল জেনিকে। 'ঘটনা খুলে বলো।'

'ওর নাম ফ্রেড কিথ। বালটনের হয়ে খেলে-খেলত। ল্যারি জুরের সঙ্গে ওর ধাক্কা লাগে। ফ্রেডকে বোধহয় বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে কাটাতে হবে।'

সশব্দে শ্বাস টানল জেনি। 'আমি জানতাম ল্যারি ওই হারামজাদাদের একজন।' টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে তবলা বাজাল ও। 'আর কিছু?'

'তুমি কবে ছাড়া পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'বলতে পারব না। আর কিছু?'

'শুনলাম কাল নাকি তোমার জামিন হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার এখানে থাকা উচিত। আমি ফিউনেরালে গিয়েছিলাম। টড এবং কেঁথির পরিবার তোমার ওপর দারুণ খেপে আছে।'

'তাতে কী এসে যায়?' চেয়ার ছাড়ল জেনি, পায়চারি শুরু করল। 'ল্যারি দানব হয়ে গেছে, তার মানে ক্যারলও তা-ই।' দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওরা দলে এখন কতজন?'

'তোমার কতটা অ্যামুনিশন দরকার সে হিসেব করছ?'

'শাট আপ,' দাবড়ে উঠল জেনি।

লাফ মেরে খাড়া হলো পিংকি। 'তুমি আমাকে আর বোকা বানাতে পারবে না-আমি জানি এখান থেকে ছাড়া পাবার পরমুহূর্তে তুমি ওদেরকে ধাওয়া করবে।'

রক্তচক্ষু মেলে ওর দিকে তাকাল জেনি। 'আমি এখান থেকে বেরুবার পরমুহূর্তে ওরা আমার পিছু নেবে। নিজের দিকে তাকাও, পিংকি, আমাকে বলো কে কাকে বোকা বানাতে চাইছে। জিম কি হঠাৎ করে তোমার প্রেমে দিওয়ানা হয়ে গেল? সে কি তোমাকে বলেছে আমাকে সে ত্যাগ করেছে যাতে তোমাকে পেতে পারে?'

জমে গেল পিংকি। 'বলেছে।'

অক্ষত হাতটা দিয়ে নিজের হাঁটুতে ঘুসি মারল জেনি। 'জানতাম এ কথাই বলবে! তুমি কি ওর সঙ্গে ডেটিংয়ে যাচ্ছ?'

হাঁটুজোড়া দুর্বল ঠেকল পিংকির। বসে পড়ল চেয়ারে। 'গতরাতে গিয়েছিলাম।'

কটমট করে ওর দিকে তাকাল জেনি। 'তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল?'

আড়চোখে বান্ধবীকে দেখল পিংকি। 'বেশিরভাগ লোকের ধারণা তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, জেনি।'

টেবিলে ফিরে এল জেনি, ধপ করে বসল চেয়ারে। তিক্ত হাসি ফুটল মুখে। 'আমার বান্ধবী পল্লবী কেয়া পিংকি। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সে এতটাই মরিয়া যে এক মানব জন্তুকে পছন্দ করে বসেছে।'

'ও-ই আমাকে পছন্দ করেছে,' বলল পিংকি।

'ও তোমাকে পছন্দ করেছে কারণ আমি তোমাকে কী বলেছি জানার জন্য সে মরিয়া। স্বীকার করো, ও এ ব্যাপারে তোমার কাছে জানতে চায়নি?'

'মামুলী কিছু প্রশ্ন করেছে,' উদাস গলায় বলল পিংকি।

'তো প্রথম ডেটের দিনে তোমরা কী করলে?'

'একসঙ্গে খেলাম। একটা রেস্টুরেন্টে। আমরা কোন মানুষ খাইনি।'

'তারপর কী করলে?' জিজ্ঞেস করল জেনি।

'ওকে নিয়ে আমাদের বাসায় গেলাম এবং বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। হয়তো তুমি এখন ওদের একজন হয়ে গেছ।'

টেবিলে কিল মারল পিংকি। 'আমার কথা শোনো। আমার কী করার ছিল? তুমিই তো বললে জিম একটা খুনি। আমি কি বসে বসে দেখতাম ও কাউকে হত্যা করে কিনা? আমি ওর সঙ্গে ছিলাম বলে তোমার বরং খুশি হওয়া উচিত। আমি তোমার হয়ে খোঁজ-খবর করছি।'

জেনি সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি কি ওর সঙ্গে ঘুমিয়েছ?'

'না।'

'ওকে চুমু খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'শয়তানী,' বলল জেনি।

'তুমি গত হপ্তায় জিমকে খুন করতে চেয়েছিলে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে আমি ওর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম বলে তুমি আমাকে হিংসা করছ।'

'একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম,' অবশেষে বলল ও। 'স্বপ্নটা দেখে ভয় পেয়ে যা আমি।'

'স্বপ্নে কী দেখেছ?'

দরজার দিকে ঘুরল পিংকি। 'দেখলাম আমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলা হয়েছে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব, জেনি। ভাল থেকো।'

'তুমি বেঁচে থেকো, পিংক,' বলল জেনি।

জেনির সঙ্গে কথা শেষ করে নগুয়েনের অফিসে ঢুকল পল্লবী কেয় নগুয়েন ওকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করল না। গত হপ্তার মত এবারে নগুয়েনকে মিথ্যা বলল পিংকি। এবং সন্দেহ করল নগুয়েন হয়তো ওর ক বিশ্বাস করেনি। লোকটা কি দরজায় কান পেতে ওদের কথা শুনেছে? না- শুনতে পারে। কারণ আড়িপাতা আইন বিরুদ্ধ কাজ।

ওয়েটিংরুমে জর্জ অপেক্ষা করছিল পিংকির জন্য। ওকে নিয়ে গাড়ির দি পা বাড়াল।

'কাজ হলো?' জানতে চাইল জর্জ।

'বলা মুশকিল। মুরগি রাখে এরকম একটা ওয়্যারহাউস খুঁজে বের কর হবে,' বলল পিংকি।

'কুছ পরোয়া নেই,' বলল জর্জ।

লেফটেনেন্ট নগুয়েন স্বাভাবিকভাবেই পল্লবী কেয়ার কথা বিশ্বাস করেনি। কা পিংকি যখন জেনির সঙ্গে কথা বলছিল সে আড়ি পেতেছে এবং দু'জনের আল রেকর্ড করে রেখেছে। ওর এক অফিসার মার্টিন, যে পার্টির রাতে জেনি পাকড়াও করতে সাহায্য করেছিল, সে কথোপকথনের টেপ নিয়ে নগুয়েনে অফিসে ঢুকল। দুই বান্ধবীর আলাপচারিতা দু'বার শুনল ওরা। তারপর নগুয়ে বলল, 'বালটনে একা একা ওয়্যারহাউস খুঁজতে গিয়ে আমরা ভুল করেছি এজন্যেই ওটার সন্ধান পাইনি।'

'ভুলটা আমার,' বলল অফিসার মার্টিন। সে বেঁটেখাট, গাঁট্টাগোট্টা, জীবনে প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সিরিয়াস। নগুয়েন তাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। 'অ মেয়েটার নিবাস কোথায়?' জানতে চাইল মার্টিন।

'পল্লবী কেয়া পিংকি? তা বলতে পারব না। তবে বোঝাই যাচ্ছে সে জেনি কথা এক বিন্দু বিশ্বাস করেনি–কেই বা করবে? তবে এর মধ্যে কিছু এলিমে রয়েছে যা ওকে নাড়িয়ে তুলেছে।' নগুয়েন রেকর্ড প্লেয়ার থেকে টেপ বের ক ওতে অস্বস্তি নিয়ে আঙুল বোলাতে লাগল। গত হপ্তায় যে পিংকিকে দেখেছে, আজকের পিংকিকে তার থেকে ভিন্ন মনে হচ্ছে। গত শনিবার নগুয়ে বিশ্বাসই করত না যে পিংকি তার বান্ধবীর বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ডেটিংয়ে যে পারে–এ তো পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা। হয়তো জিম ছোকরার মধ্যে এমন কি আছে যাতে সহজেই মেয়েরা গলে যায়। ছোঁড়া তো দেখতে মন্দ নয়। রীতিম সুদর্শনই বলা চলে।

জিমের কথা ভাবতে গিয়ে ভিয়েতনামের এক তরুণ সৈনিকের কথা ম

পড়ে গেল নগুয়েনের। ছেলেটির নাম ছিল ট্রান কুয়ান। অমন খুনে স্বভাবের মানুষ দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি তার। ভিয়েতনামে নগুয়েনের দলের সদস্যরা যত ভিয়েতকং হত্যা করেছে, একা কুয়ান খুন করেছিল তার বেশি। মানুষ না, সাপের মত শিকার করত কুয়ান। ভিক্টিমকে পেছন থেকে ছুরি মারতে কিংবা গুলি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না সে। ছেলেটাকে নগুয়েন ঘৃণা করত, একই সঙ্গে তাকে তার প্রয়োজনও হত।

তবে এ প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় যে রাতে নগুয়েন দেখে ট্রান কুয়ান গ্রামের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার পরে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলেছে। নগুয়েনের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ধরা পড়ার পরেও দাঁত বের করে হাসছিল কুয়ান। নগুয়েন জায়গায় বসে কুয়ানকে গুলি করে হত্যা করে। এজন্য সে কখনও আফসোস করেনি।

সুদর্শন, ক্লিন-কাট জিম ক্লাইনের সঙ্গে ট্রান কুয়ানের মিলটা কোথায় যে নগুয়েন দু'জনকে একত্রিত করে দেখছে? এ প্রশ্নের জবাব জানা নেই নগুয়েনের। তবে জবাবটা না জানতে পারলে ভবিষ্যতে কী জানি কী ঘটে ভেবে ভয় লাগছে তার।

'এ তিনটে ছেলেমেয়ের ওপর আমি নজর রাখতে চাই,' অবশেষে বলল নগুয়েন। পল্লবী কেয়া, জিম এবং বিশেষ করে জেনির ওপর। তোমার সাহায্য দরকার।'

'নিশ্চয়ই সাহায্য করব,' বলল মার্টিন। 'আমি জেনির ওপর নজর রাখব। মেয়েটা যেমন মেজাজী মনে হয় না জামিন নিয়ে বেশিদিন বাইরে থাকতে পারবে।'

'ওর বয়স মাত্র আঠারো। কিন্তু জানোই তো মেয়েটা কীরকম বিপজ্জনক?'

'সে প্রমাণ তো গত হপ্তায় ওই পার্টিতেই পেলাম।'

'যা দেখেছ ভুলে যেয়ো না,' সিধে হলো নগুয়েন। 'ওয়্যারহাউসের তালিকাটির ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নাও, কেলির ওপর মনোযোগ দিতে হবে। আমি শিওর পিংকি এ মুহূর্তে ঠিক এ কাজটিই করছে। জেনির বর্ণনানুযায়ী ওরকম ওয়্যারহাউস যদি সত্যি থাকে, পল্লবী কেয়াকে সম্ভবত সেখানে পাওয়া যাবে।'

নয়

স্থানীয় ইয়েলো পেজ-এ পিংকি এবং জর্জ একটি ফুড হোল সেলারের ওয়্যারহাউসের নাম খুঁজে পেল। কেলিতে ওয়্যারহাউসটা। জর্জ বলল জায়গাটা সে চেনে। ওখানে গাড়ি করে পৌঁছাতে মাত্র বিশ মিনিট সময় লাগল। দেখে মনে হলো এটা জেনি বর্ণিত সেই ওয়্যারহাউস। কতগুলো মুরগির খাঁচার পেছনে গাড়ি পার্ক করল পিংকি। শনিবার বলে শহরের শিল্পাঞ্চল প্রায় জনশূন্য। মুরগির

'আমি দুঃখিত,' বলল পিংকি। ইচ্ছে করল জর্জকে স্পর্শ করে, ওকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু নরকের মত এ জায়গায় তা সম্ভব নয়। ও জানে না হঠাৎ করে কেন জিমের কথা জর্জকে বলতে গেল।

'তুমি ওকে পছন্দ কর?' জানতে চাইল জর্জ।

'ঠিক জানি না। হয়তো বা।'

নাক কোঁচকাল জর্জ। 'জেনি যা বলল তার কী হবে? এই শুকনো রক্তের ব্যাখ্যা কী? এখানে কি আমরা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে এসেছি? যদি তা-ই হয় তাহলে বলব ওই ছোঁড়া কোন নম্বর পাবারই যোগ্য নয়।'

'জর্জ।'

'আমি কী দোষ করলাম?' প্রশ্ন করল জর্জ।

'তোমার কোন দোষ নেই, জর্জ,' মৃদু গলায় বলল পিংকি। 'সব দোষ আসলে আমার। আমার কিছু একটা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তোমার শরীরে হরমোনের স্রোত বইতে শুরু করেছে।'

কাঁদতে লাগল পিংকি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসায় ও নিজেই বিস্মিত। 'আমি সিরিয়াস। আমার শরীর ভাল লাগছে না।'

চুপ হয়ে গেল জর্জ। একটা হাত রাখল পিংকির গায়ে।

'কী হয়েছে তোমার?'

আমার খিদে পেয়েছে। আমার আরেকটা বড়সড় হ্যামবার্গার দরকার। ওরা আমাকে কাঁচা মাংস দিলেও আমি এখন খেয়ে ফেলতে পারব।

নাক টানল পিংকি। 'কাল রাতে একটা বাজে স্বপ্ন দেখেছি।'

'আমি কি স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম?'

অশ্রু ভেজা চোখে হেসে ফেলল পিংকি। 'না, স্বপ্নে আমি একা ছিলাম। দেখি বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে চলে এসেছি। কিন্তু সে স্বপ্নের কথা এখন বলতে পারব না। কেন জিমের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলাম তা-ও এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তোমাকে শুধু বলি—আমি তোমাকে পছন্দ করি। তুমি আমার খুব ভাল বন্ধু।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জর্জ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি আবার ওর সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছ?'

'না।' মিথ্যা বলল পিংকি।

'কথা দিচ্ছ?'

জর্জের নিষ্পাপ, সুন্দর মুখখানা দেখল পিংকি। ওয়্যারহাউসের অন্ধকারেও বাদামি চোখজোড়া চিকচিক করছে। হাত বাড়িয়ে ওর চুল নেড়ে দিল পিংকি। চুমু খেল গণ্ডদেশে।

'হ্যাঁ,' বলল ও।

পিংকির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জর্জ। তারপর বলল, 'পুলিসের কাছে যেতে আমাদের বাধা কোথায়?'

'আমি আরও রিসার্চ করতে চাই।'

'কীসের ওপরে?'

'ইণ্ডিয়ানদের ওপরে।'

'কী!'

সিধে হলো পিংকি। থুতনির নিচে ফ্ল্যাশলাইট চেপে ধরে দু'হাত মুছল প্যান্টে। 'তুমি বলেছিলে ওরা এ এলাকায় সর্বপ্রথম বাস করত। আমি ওদের গল্পটা শুনতে চাই।'

দশ

পিংকি জর্জকে বাড়ি পৌঁছে দিল। পথে দু'জনের তেমন কথা হলো না। পিংকি জিমের সঙ্গে ডেটিংয়ে গিয়েছিল এ খবরটা এখনও হজম করে উঠতে পারেনি জর্জ। আর পিংকি ভাবছে খাওয়ার কথা। ওর পার্সে নয় ডলার আছে। কিন্তু এ টাকা দিয়ে খিদে মিটবে কিনা সন্দেহ। তাই ভাবছে কোন এটিএম বুথে নেমে কিছু টাকা তুলে নেবে। হঠাৎ এমন রাক্ষুসে খিদে কেন লাগছে বুঝতে পারছে না পিংকি।

ওকে দোরগোড়া থেকে বিদায় দিতে জর্জের মন সায় দিচ্ছিল না। তাই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'লাইব্রেরিতে।'

'তোমার সঙ্গে আমি গেলে ক্ষতি কী?' জানতে চাইল জর্জ।

'কারণ আমার মুড ভাল নেই। কেমন অস্থির লাগছে।'

'তুমি সবসময়ই অস্থির মুডে থাক। আমি তোমার মুড ভাল করে দিতে পারি।'

পেট চোঁ চোঁ করছে পিংকির। খিদের চোটে পাকস্থলি হজম হয়ে না যায়। 'আমি যাই, প্লিজ? পরে ফোন করব।'

গাড়ি থেকে ধীর গতিতে নামল জর্জ। 'তুমি আজ রাতে কী করছ?'

'জানি না। বিশ্রাম নেব। বোধহয় সত্যি সত্যি ফ্লু বাধিয়ে বসেছি। কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে।'

'বেশ,' গাড়ির দরজা বন্ধ করল জর্জ। 'মন্দ লোকদের কাছ থেকে দূরে থেকো, পিপি।'

'আচ্ছা।'

গাড়ি নিয়ে একটানে একটা ম্যাকডোনাল্ড'স-এর দোকানে চলে এল পিংকি। বড় একটা বার্গার আর কোকের অর্ডার দিল। মুখে খাবার নিয়ে চিবুতে আরাম লাগল পিংকির। কিন্তু হ্যামবার্গারটা ওকে তৃপ্ত করতে পারল না। মাংসটা ওরা খুব বেশি ভেজে ফেলেছে। তবুও, প্রথমটা শেষ করার আগেই দ্বিতীয় আরেকটা বার্গারের অর্ডার দিল পিংকি। এবারে মাংসটা আধা সিদ্ধ রাখতে বলল ও। দ্বিতীয় বার্গারটা প্রথমটার চেয়ে সুস্বাদু লাগল। খিদেও মিটল। তবে পুরোপুরি পেট ভরেনি পিংকির। ভাবল আরেকটার অর্ডার দেবে কিনা। বাড়ি

হাততালি দিল বুড়ি। 'তাই, না?' বলল সে। 'তবে এখানকার একসময়ের বসবাসকারী ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে মজার মজার গল্প শুনতে চাইলে শাইনিং ফিদারের কাছে চলে যাও। সে তোমাকে দারুণ দারুণ কাহিনী শোনাবে। অনেকদিন ধরে সে এলাকায় আছে।'

'কে তিনি?'

'এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান, উইণ্ড ব্রেকের কাছে, হাইওয়ে সেভেনটিনের ধারে থাকে। ওখানে একটা দোকান আছে চিপ স্টাফ নাম। শাইনিং ফিদারের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যাণ্ডডটার দোকানটা চালায়। তবে তার ব্যাপারে সাবধান। তুমি কিনতে চাও বা না চাও, সে তোমাকে কম্বল বা কার্পেট গছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। তার দেয়া তিনটে কার্পেট আমার ক্লজিটে পড়ে আছে।'

'এই শাইনিং ফিদারের বয়স কত?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'তা জানি না। আমি যখন প্রথম তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তার চুল সাদা দেখেছি।' বুড়ি বিরতি দিল, প্রায় টাক পড়া সাদা মাথাটা চুলকে নিয়ে যোগ করল, 'সেটা ছিল আমেরিকার মহামন্দার সময়, ত্রিশের দশকে। আমি তখন ছোট্ট খুকী।'

পিংকি লাইব্রেরি থেকে রেড ইণ্ডিয়ানের দোকানে যাবার পথে একটি খাবারের দোকানে থামল। এমন ঘন-ঘন খিদে পাচ্ছে কেন জানে না ও। পিংকি এক ফুট লম্বা জার্মান সসেজ এবং ব্রেড কিনল খাওয়ার জন্য। তবে ব্রেড স্পর্শ করল না। হাইওয়ে সেভেনটিনের দিকে গাড়ি চালাতে চালাতে গবগব করে খেতে লাগল সসেজ। খাওয়া শেষ হবার পরে বুঝতে পারল সসেজের মাংসটা পুরোপুরি সিদ্ধ ছিল না।

কিন্তু অর্ধসেদ্ধ মাংস খেতেই ভাল লেগেছে ওর।

বাইরে থেকে চিপ স্টাফকে সস্তা দোকান বলেই মনে হলো। ইটের প্রাচীন একটি বাড়ির লাগোয়া কাঠের একটি কুটির বিশেষ দোকানটি। রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে চিপ স্টাফ। ধুলোর লনে দাঁড়িয়ে আছে কাঠের একটি ঘোড়া। পিংকি গাড়ি পার্ক করে ভেতরে ঢুকল। বুড়ো ইণ্ডিয়ানের গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যাণ্ডডটার ওকে স্বাগত জানাল। মহিলা নেটিভ আমেরিকান। হাতে একটি ব্ল্যাংকেট। কম্বলটা সে পিংকিকে দেখাতে চাইল।

'আমি আসলে শাইনিং ফিদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল পিংকি। দোকানের তাক বোঝাই করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মাটির তৈজসপত্র, কাপড়ের ঝুড়ি, কাঠের তৈরি মূর্তি—শপিং মলে কেনাকাটায় অভ্যস্ত কোন তরুণীকে আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই এখানে।

'ফিদার ঘুমাচ্ছেন,' বলল মহিলা। এর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, ভয়ানক স্থুলকায়া। কোমর ছাপানো কালো লম্বা, ঘনচুল পনিটেল করে বাঁধা। সে পিংকির হাতে কম্বলটা গুঁজে দিল। 'এটার জন্য ষাট ডলার দিলেই হবে। খাঁটি ম্যানটন ব্ল্যাংকেট।'

বাদামি রঙের কম্বলটা দেখে মনে হলো এটি ওয়াল-মার্ট থেকে কিনে আনার পরে এতে সুঁই-সুতোর কিছু কাজ করা হয়েছে। 'আমার কাছে ষাট

ডলার নেই,' বলল পিংকি। 'আমি ম্যানটনের ওপরে একটি রিপোর্ট লিখছি। সোমবার ক্লাসে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। আপনার দাদুর সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি। আমি কি পরে আসব?'

মহিলাকে কৌতূহলী দেখাল। 'তোমার লেখায় কি আমাদের সম্পর্কে ভাল কথা আছে?'

'খুব ভাল কথা আছে।'

'তোমার কাছে কত আছে?'

'দুই ডলারের মত।'

মহিলা কাছের তাক থেকে মাটির ছোট একটি মূর্তি তুলে নিল। এক কিশোরী নেটিভ। 'এটার দাম দু'ডলার। এটা নাও। তারপর ফিদারকে গিয়ে ঘুম থেকে তুলবে।'

'আমি ওঁর ঘুম ভাঙাতে চাই না। উনি হয়তো বিরক্ত হবেন।'

মহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে মূর্তিটি একটি বাদামি ব্যাগে রেখে দিল। 'উনি সারাক্ষণ ঘুমান। বাথরুম করানোর জন্য ওঁর ঘুম ভাঙাতে হয়।'

পিংকি দুই ডলার মহিলাকে দিল। মহিলা দোকানের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেরার পথে কোন ATM বুথে থামতে হবে পিংকিকে। কিছু মুদি সদাই কিনতে হবে। ঘড়ি দেখল ও—পাঁচটা বত্রিশ। জিম ওর সঙ্গে সাতটার সময় দেখা করবে বলেছে।

মহিলা আবার তার চেহারা দেখাল, পেছন পেছন আসতে ইশারা করল পিংকিকে। দোকান লাগোয়া বাড়ির দিকে চলল দু'জনে। নোংরা কিচেন পার হয়ে একটা লিভিংরুমে ঢুকল, সেখান থেকে ছোট একটি শয়নকক্ষে। এ ঘরটি অন্যগুলোর চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরিপাটি বিছানা। খোলা জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্য দেখা যাচ্ছে। ঘর ম-ম করছে সুগন্ধিতে: কোনার দিকে জ্বলছে ধূপের কাঠি। শাইনিং ফিদার কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘোলাটে ছবির একটি টিভির সামনে বসে আছে। পিংকিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে কী যেন বলল। তার কথা কিছুই বুঝতে পারল না পিংকি।

'কী?' বিড়বিড় করল ও।

'উনি বলেছেন, "হাই, কেমন আছ?"' বলল মহিলা।

'উনি ইংরেজি বলতে পারেন না?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'পারতেন, কিন্তু এখন অনেক ইংরেজি শব্দই ভুলে গেছেন। উনি ম্যানটন ভাষায় কথা বলেন। আমি তোমাকে অনুবাদ করে দেব।' আঙুল তুলল মহিলা। 'ওঁর সামনে গিয়ে বসো, ওই কম্বলের ওপরে। কম্বলটা পছন্দ হয়েছে তোমার? আমি ওটা ওয়াল-মার্ট থেকে কিনেছি।'

'খুব সুন্দর জিনিস,' বলল পিংকি, বুড়োর পায়ের কাছে, মেঝেতে বসল। বুড়ো ক্ষুদ্রকায়, কুঁজো, মাথায় সুতোর মত সাদা চুলের পরিমাণ খুবই কম। তবে এত বয়স হলেও গায়ের চামড়ায় তেমন ভাঁজটাজ পড়েনি, চকচকে কালো চোখ জোড়ার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং সতর্ক। পিংকির মনে হলো বুড়ো ওই চোখ দিয়ে ওর ভেতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে, এমন কিছু যা এই রেড ইণ্ডিয়ানকে জানতে দিতে

চায় না পিংকি।

আমার লুকোবার কী আছে?

অনেক কিছু। দানবদের নিয়ে অদ্ভুত একটা গল্প। একটি অধৈর্য চুম্বন রক্তমাখা একটি ওয়্যারহাউস। তীব্র খিদে। আজকাল অনেক কিছুই গোপ রাখছে পিংকি।

'হ্যালো,' বলল ও বুড়োকে।

মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ। লোকটা ইংরেজি বলা ভুলে গেলেও কিছু কিছু শ নিশ্চয়ই বুঝতে পারে। সে তার নাতনিকে ম্যানটন ভাষায় কী যেন বলল।

'ফিদার বলছেন তুমি তোমার রচনায় লিখবে ম্যানটনরা ছিল সর্বকালে সেরা বীর যোদ্ধা জাতি।' বলল মহিলা।

শাইনিং ফিদারের দিকে তাকিয়ে হাসল পিংকি। 'ওকে বলুন সে কথা আ অনেক আগেই লিখেছি।' মহিলা পিংকির কথা অনুবাদ করে দিল বুড়োকে পিংকি বলে চলল, 'ওঁকে বলুন আমি পয়েন্ট লেক সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

মহিলা পিংকির কথা আবার তর্জমা করে দিল বুড়োকে। শাইনিং ফিদারকে ডানে-বামে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলো পিংকি 'উনি লেক নিয়ে কোন কথা বলতে চান না,' বলল মহিলা। 'বলছেন ওটা ম জায়গা।'

'সেজন্যেই তো আমি লেক সম্বন্ধে জানতে চাইছি,' বলল পিংকি।

শাইনিং ফিদারের কথা অনুবাদ করে চলল তার নাতনি। 'উনি বলছেন উনি কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীকে লেকের পানি পান করতে মানা করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে তারা তাঁর কথা আমল দিতে চায়নি, পরে ঠেকে শিখেছে। দাদু বলছেন শহরের পানীয় জলের পুরোটা লেক নয়, আসে কুয়ো থেকে এবং তিনি সে ব্যবস্থা করেছেন।'

মাথা নাড়ল পিংকি। 'ওকে বলুন লেকের পাড়ের নতুন স্কুলের পানীয় জল আসে লেক থেকে এবং ওই পানি পান করে অনেক ছেলেমেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তবে তাদের অসুখটা কী আমরা জানি না।'

তর্জমা করা কথাটা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান। গায়ে কম্বলটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে নড়েচড়ে বসল। কথা বলার ভঙ্গি আগের চেয়ে দ্রুততর হয়ে উঠল। 'উনি বলছেন এ অসুস্থতার জন্য লেকের পানি দায়ী' বলল মহিলা। 'স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওই পানি পান করা উচিত হয়নি। ওরা যদি পানি পান করা বন্ধ করে দেয় তাহলে সুস্থ হয়ে উঠবে। নইলে ওদের কপালে খারাবী আছে। উনি তোমাকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিতে বলছেন। বলছেন শ্বেতাঙ্গ সেটলারদের দশাও এরকম হয়েছিল। তারা ওঁর কথা না শুনে লেকের পানি পান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তারা লেকের পানি ব্যবহার বন্ধ করে দিলে সুস্থ হয়ে ওঠে।'

'পানি পান বন্ধ না করলে কী ঘটবে ওঁকে একবার জিজ্ঞেস করুন,' অনুনয় করল পিংকি।

প্রশ্ন শুনে ডানে-বামে মাথা নাড়ল শাইনিং ফিদার। 'উনি এ বিষয়ে কথা বলতে চান না,' জানাল নাতনি।

'কেন?' প্রশ্ন করল পিংকি।

মাথা নেড়েই চলেছে বুড়ো। 'উনি বলছেন ওদের ভাগ্যে কী ঘটবে তা তোমার জানা উচিত হবে না।' শাইনিং ফিদারের বক্তব্য জানিয়ে দিল মহিলা।

'ওকে জিজ্ঞেস করুন ম্যানটনরা লেকের নাম কেন সেথিয়া রাখল,' বলল পিংকি।

জবাব দিল শাইনিং ফিদার। 'তোমার জানা উচিত হবে না।'

'আমি জানি কথাটার মানে রক্তস্নান।' বলল পিংকি।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বুড়ো। নিশ্চুপ। অবশেষে সে তার গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যাণ্ডডটারকে মৃদু কণ্ঠে কী যেন বলল। 'তুমি আর কী জানতে চাও জিজ্ঞেস করছেন উনি।'

'ওকে বলুন আমি কাআতু সম্পর্কে পড়েছি এবং আমি–'

চিৎকার করে পিংকিকে থামিয়ে দিল শাইনিং ফিদার। ভয়ানক মাথা নাড়ছে, ম্যানটন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। 'ওই শব্দটা তোমাকে উচ্চারণ করতে মানা করছেন উনি,' বলল মহিলা। 'বলছেন ওটা শয়তানের রাজত্বকালের অশুভ একটা শব্দ। তবে তুমি শব্দটা সম্পর্কে কেন জানতে চাইছ জিজ্ঞেস করেছেন তিনি।'

বুড়োর চোখে চোখ রাখল পিংকি। 'ওঁকে বলুন স্কুলের বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি পরিবর্তন লক্ষ করেছি। ভয় পাচ্ছি ওরা কাআতুতে রূপান্তরিত হলো কিনা।'

অভিশপ্ত শব্দটি পিংকি আবার উচ্চারণ করায় শাইনিং ফিদার নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়েছে। কারণ তক্ষুণি সে সাড়া দিল না। আবার যখন কথা বলল তার গলা নরম শোনাল।

'ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছে উনি জানতে চাইছেন,' বলল মহিলা। 'জিজ্ঞেস করছেন কেউ মারা গেছে কিনা এবং কারও মৃত্যু হলে সে কীভাবে মারা গেল।'

'দু'জন মারা গেছে,' জানাল পিংকি। 'একটি মেয়ে ওই দু'জনকে মেরে ফেলেছে। তার ধারণা ওরা পিশাচ জাতীয় কিছু ছিল। তবে যারা মারা গেছে তারা হয়তো কাউকে হত্যা করেছিল।' বিরতি দিল ও। 'ওরা নাকি চারজন মানুষকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলেছিল।'

পিংকির জবাব শুনে হতভম্ব দেখাল শাইনিং ফিদারকে। মেয়েটার দিকে অপলক, সতর্ক চোখে তাকিয়ে রইল। আবার কথা বলল সে।

'উনি জানতে চাইছেন মেয়েটা ওই অদ্ভুত ছেলেমেয়েগুলোর সবাইকে হত্যা করতে পেরেছে কিনা।'

'না, পারেনি,' জবাব দিল পিংকি।

শাইনিং ফিদার প্রশ্ন করল, 'এখনও কতজন বেঁচে আছে?'

'আমি ঠিক জানি না,' বলল পিংকি। 'ম্যানটনরা লেকের নাম রক্তস্নান

দিয়েছিল কেন?'

জবাব দিল শাইনিং ফিদার। 'কারণ ওখান থেকেই সবসময় রক্তপান শুরু হত।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল পিংকি। 'লেক কি রক্তে ভরা ছিল?'

শাইনিং ফিদার জবাব দিল, 'লেক পানিতে ভরা।' তর্জমা করল মহিলা। 'উনি একটা শব্দ উচ্চারণ করতে চাইছেন না যেটা রক্ত ভরা।'

'আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি,' বলল পিংকি। 'কাআতু মানে কি স্বাভাবিক লোকজন কিন্তু লেকের পানি পান করার কারণে তারা বদলে যায়?'

শব্দটা কানে যেতে ঘেউ ঘেউ করে উঠল শাইনিং ফিদার। শব্দটা সে শুনতেই চায় না। মহিলা বলল, 'উনি বলছেন যারা বদলে গেছে তারা স্বাভাবিক নয়। তারা পুরোপুরি বদলে যাবে, তবে খুব ধীরে ধীরে।'

'একথার মানে কী?' বলল পিংকি।

শাইনিং ফিদারের জবাব অনুবাদ করল তার নাতনী। 'বাইরের চেয়ে আগে ভেতর থেকে তাদের পরিবর্তন হয়। এবং শুরুতে বোঝাও যায় না।'

'তাহলে ওদেরকে চিনব কী করে?' প্রশ্ন করল পিংকি।

কথা বলার সময় পিংকির ওপর নিবদ্ধ রইল শাইনিং ফিদারের চোখ। 'তারা সবসময় রক্ত পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে।'

না, আমি রক্ত খেতে চাই না। আমি শুধু হ্যামবার্গার আর সসেজ খাব। আমি রক্ত খেতে চাই না।

'ওহ, নো!' ফিসফিস করল পিংকি।

শাইনিং ফিদার হঠাৎ ঝুঁকে এসে খপ করে চেপে ধরল পিংকির হাতের কব্জি। ঝাড়া মেরে হাত সরিয়ে নিতে চাইল পিংকি, কিন্তু বুড়োর গায়ে অনেক শক্তি। পিংকির হাত আরও জোরে চেপে ধরে বুড়ো আঙুলের ফাঁকে নরম একটা টিস্যুর মত জিনিস ঢুকিয়ে দিল। ওর পালস খুঁজছে বুড়ো। স্থির হয়ে রইল পিংকি, বুড়োকে পরীক্ষা শেষ করার সময় দিল। বুড়ো পিংকির পালস পরীক্ষা করে কী বুঝেছে কে জানে কিন্তু তাকে মোটেই খুশি মনে হলো না। কয়েক সেকেণ্ড পরে সে ঝাঁকি মেরে সরিয়ে দিল পিংকির হাত এবং ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দরজা দেখিয়ে দিল, ম্যানট্রন ভাষায় কী যেন চিৎকার করে বলল।

'উনি তোমাকে চলে যেতে বলছেন,' দ্রুত উঠে পড়ে বলল মহিলা। পিংকির বাহু ধরে ওকে সিধে হতে সাহায্য করল। 'উনি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলছেন এবং আর কখনও এখানে এসো না। তুমি ওঁকে রাগিয়ে দিয়েছ।'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে তো আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' আপত্তি জানাল পিংকি। কিন্তু মহিলা ওকে ছাড়ল না, প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল দরজায়। পিংকি এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল, বুড়োর দিকে বাড়াল এককদম। বুড়ো এমনভাবে ওকে দেখছে যেন পিংকি ভয়ানক ছোঁয়াচে একটা রোগ বাধিয়ে বসেছে। 'আমি কী দোষ করলাম?' রেগে গেছে পিংকি। 'আপনি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন কেন?'

বুড়োর এরকম প্রতিক্রিয়া একদমই আশা করেনি পিংকি। বুড়ো বলল,

'কাআতু।'

'তুমি চলে যাও,' হুকুম করল মহিলা।

'আমি কাআতু নই!' চিৎকার দিল পিংকি। 'আমি একটি টিনেজ মেয়ে মাত্র। আমি আপনাদের কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে। আর আপনারা কিনা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন!'

'চলে যাও এখান থেকে,' পিংকির হাতটা আবার চেপে ধরল মহিলা।

'আমাকে ছাড়ুন!' গলা ফাটাল পিংকি। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আরেক কদম বাড়ল শাইনিং ফিদারের দিকে। পিংকিকে সে শয়তান জাতীয় কিছু একটা ভেবে নিলেও ওকে ভয় পাচ্ছে না। 'আমাকে আপনি কাআতু বললেন কেন?' খেঁকিয়ে উঠল পিংকি। 'আমি তো কাউকে আঘাত করিনি।'

'কী চাও?' ভাঙা ইংরেজিতে প্রশ্ন করল বুড়ো।

'আমি জানতে চাই এ জিনিসটা সত্যি কিনা,' বলল পিংকি। 'এবং সত্যি হলে এটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই কীভাবে ঠেকানো যাবে তা জানতে চাই।'

শাইনিং ফিদার গলায় বাঁধা ছোট একটি সোনার চেন খুলে নিল হাতে। চেনের শেষ মাথায় সোনালি একটি বাদুড়ের অ্যামুলেট ঝুলছে। এ জিনিসটা এতক্ষণ বুড়োর শার্টের তলায় লুকানো ছিল। পিংকিকে দিল সে ওটা। পিংকি গভীর মনোযোগে চেনটা দেখতে লাগল। বাদুড়ের মূর্তি। মুণ্ডহীন বাদুড়।

মাথা ঝাঁকাল শাইনিং ফিদার। 'কাআতু।'

ভুরু কোঁচকাল পিংকি। 'এটার মাথা কই?'

'পরো,' বলল বুড়ো।

'আমার গলায় পরব? কিন্তু তাতে কী লাভ হবে?' মরিয়া হয়ে উঠেছে পিংকি। 'আমি এখন কী করব?'

হাত তুলে নিজের গলা কাটার ভঙ্গি করল বুড়ো।

'ওদেরকে হত্যা করো।'

'কাকে?'

'খাদকদেরকে।' বলল সে।

'ওদের মাথা কেটে ফেলতে বলছেন?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'ওদেরকে হত্যা করো,' পুনরাবৃত্তি করল বুড়ো।

'আমার কী হবে?' প্রশ্ন পিংকির। 'আমিও কি ওদের মত হয়ে যাচ্ছি?'

শাইনিং ফিদার জানালা দিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাল। স্ফীত কমলালেবুটার অর্ধেক শরীর জমিনে ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, নামিয়ে আনছে রাতের আঁধার। ঘর অন্ধকার হতে শুরু করেছে, বাড়ছে ঠাণ্ডা। বুড়ো ফিরে তাকাল পিংকির দিকে। গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল পিংকির।

'ক্ষুধার্ত?' জিজ্ঞেস করল সে।

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা দোলাল পিংকি। ওর খিদে পেয়েছে।

'সবসময়।'

'পানি, রক্ত।' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বুড়ো, ম্যানটন ভাষায় কী যেন

বলল বিড়বিড় করে। পিংকি মহিলার দিকে তাকাল।

'উনি কী বললেন?' জানতে চাইল ও।

'তুমি অনেক গভীরে সাঁতার কেটেছ,' জবাব দিল মহিলা।

'আমি লেকেই নামিনি, সাঁতার কাটা দূরে থাক। লেকের পানি খুব ঠাণ্ডা।'

শাইনিং ফিদার মাথা নামিয়ে ম্যানটন ভাষায় কথা বলল। 'কী?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'তোমার রক্ত লেকের মতই শীতল,' অনুবাদ করে দিল মহিলা।

পিংকির বুকের খাঁচায় বাড়ি খেতে লাগল হৃৎপিণ্ড। ও বলল, 'আমি এখন যাব।'

মহিলা বলল, 'হ্যাঁ, তোমার চলে যাওয়াই ভাল।'

এগারো

বাড়ি ফেরার পথে একটা মুদি দোকান চোখে পড়ল পিংকির। ওরা চেক নেয়, কাজেই পিংকিকে আর এটিএম বুথ খুঁজে বের করতে হলো না। ও সব রকমের খাবার কিনল। যে পরিমাণ মাংসে ওর আর দাদুর সারা মাস চলে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি মাংস কিনল পিংকি। গরু আর খাসির বড় বড় রান। আস্ত গরু পাওয়া যাবে কিনা দোকানীকে জিজ্ঞেস করতে সে হাসতে গিয়েও হাসল না। কারণ পিংকির চেহারা সিরিয়াস। দোকানী জানতে চাইল বন্ধুবান্ধব মিলে ও পিকনিক করছে কিনা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল পিংকি। 'আমার বন্ধুরা সবাই শহরের বাইরে থেকে আসছে।'

পিংকি বাড়ি ফিরে দেখল সদর দরজায় ওর জন্য অপেক্ষা করছে প্লাস্টিক। ওকে দেখে কুঁইকুঁই করে উঠল সারমেয়। পিংকি সকালে জানোয়ারটাকে খেতে দিতে ভুলে গিয়েছিল। ও ডগফুড খুঁজল কিন্তু পেল না কোথাও। ব্যালকনিতে গিয়ে এক টুকরো কাঁচা মাংস দিল কুকুরকে। প্লাস্টিক চোখ বুজে, মনের আনন্দে হাড্ডি চিবাতে লাগল।

পিংকি মাংস চড়িয়েছে হাড়িতে, খুলে গেল সদর দরজা। ভেতরে প্রবেশ করল জিম ক্লাইন, তারকা কোয়ার্টার ব্যাক। রান্নাঘরে তাকাল সে। অন্ধকার। আলো বলতে কেবল লিভিংরুমের টেবিলে একটি ছোট বাতি জ্বলছে। ওটার পাশে দাঁড়িয়েছে জিম।

'হ্যালো, পিংক,' বলল সে। 'আমি কি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম?'

'না, ভেতরে এসো। আমি ডিনার রাঁধছিলাম। তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

'খিদেয় আমার পেট জ্বলছে,' বলল জিম।

সো, মাই ডার্লিং বয়। তুমি কি দানব? তুমি কি মানুষ খাও? তুমি কি আমাকে খেয়ে ফেলবে? তোমাকে কি আমার হত্যা করতে হবে? তুমি কি

ভিনগ্রহ থেকে এসেছ? তুমি কি শয়তান? আজ রাতে তুমি কী করবে? আমাকে চুমু খাবে? প্রেম করবে? আমাকে তোমার মত বানাবে? ওহ, মাই ডার্লিং বয়। এজন্যেই না তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে গিয়েছিলে? এ কারণেই তো তুমি এ পৃথিবীতে এসেছ? সব সুন্দরী মেয়েদেরকে হজম করার জন্য। এবং তাদেরকে আরও পিশাচী বানাবার মতলব করেছ।

'আমরা কি এখানে বসে খাব?' জিজ্ঞেস করল পিংকি। জিম নীরবে বসল কিচেন টেবিলে, অন্ধকারে ওকে লক্ষ করছে।

'তেলকুপে বসে খাব।'

'অত উঁচুতে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ তো।'

'আমরা খেতে খেতে লেক দেখব,' বলল জিম।

'হাউ রোমান্টিক!'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। ইউ আর সো কিউট!'

'ধন্যবাদ,' বলল পিংকি।

'আজ সারাদিন কী করলে?' জানতে চাইল জিম।

'কিছু না।'

'জেনির সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হুঁ।'

'ও কী বলল?'

'তেমন কিছু বলেনি।' জবাব দিল পিংকি। হঠাৎ জিমকে ওর খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করল। ওকে চুমু খেতে মন চাইছে, স্পর্শের জন্য অস্থির হয়ে উঠছে শরীর। কিন্তু জিমকে যৌনকাতর মনে হচ্ছে না। স্রেফ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে পিংকির দিকে। পিংকি জানে ওর শরীরের ভেতরে পরিবর্তন ঘটছে। কোন ডাক্তার হয়তো ব্যাপারটা টের পাবে না। কিন্তু জিম ব্যাপারটা ঠিকই জানে। ওর ভেতরেও সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছে পিংকি। জিমের হাত কিচেন টেবিলে। নখগুলো কালো হয়ে আছে—যেন ভারী কিছু পড়ে থেঁতলে গেছে। কাঠের টেবিলে তবলার বোল তুলল সে আঙুল ঠুকে, ছন্দায়িত শব্দগুলো প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নীরব বাড়িতে।

'তোমার রান্না কি শেষ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মাত্র চড়ালাম।'

'তাতে কিছু আসে যায় না।'

'আসে যায়,' গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দিল পিংকি। 'চলো, খাবারটা ব্যাগে ভরি।'

জিম আজ শীতল আচরণ করছে পিংকির সঙ্গে। পিংকি খানিক আগেই জিমকে মেরে ফেলার কথা ভাবছিল। কিন্তু কাজটা কখনওই পারবে না পিংকি। জিম কেন, কাউকেই ওর পক্ষে হত্যা করা সম্ভব নয়। এরকম কিছু করার আগে নিজের মরণ হওয়াও ভাল। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে বাথরুমে ঢুকল পিংকি।

শাইনিং ফিদারের দেয়া মন্ত্রপূত কবচটা শার্টের নিচে রাখল। এটা ওকে কতটু নিরাপত্তা দিতে পারবে জানে না পিংকি। হয়তো কোন নিরাপত্তাই দিতে পার না। তবু ওটা রেখে দিল ও। বুড়ো রেড ইণ্ডিয়ানের হুকুম মনে পড়ে গেল:

'ওদেরকে হত্যা করো—খাদকদেরকে।'

পাহাড় বেয়ে ওঠার সময় একটিও কথা বলল না জিম ক্লাইন। তবে এজন্য কি মনে করল না পিংকি। জিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল ও জিম খাবারের বোঝাটা বহন করছে। গন্ধটা যেন গলায় রশি বাঁধা কুকুরছানা মত টেনে নিয়ে চলেছে পিংকিকে। খাবারের বাক্সে মাংস, ব্রেড এবং এ বোতল মদ পুরে দিয়েছে ও।

তেলকূপগুলো বেশ লম্বা, চেহারা পতঙ্গের মত। জিম বারোটার ক বলেছিল তবে ছ'টা কূপ চোখে পড়ল পিংকির। ওগুলো বিরতিহীনভাবে মা খুঁড়ে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে চলেছে। তেল চকচকে টিউবে জোছনা প ছলকাচ্ছে। ওগুলো মাটির ভেতরে ঢুকছে, বেরুচ্ছে—ঢুকছে, বেরুচ্ছে।

একটা কুয়োর পাদদেশে বসল ওরা দু'জনে, উপত্যকা এবং লেক তাদে সকল সৌন্দর্য নিয়ে বিছিয়ে রয়েছে ওদের পায়ের নিচে। খাবারের প্যাকে খুলল ওরা। প্রতিটি জিনিসেরই অল্প করে স্বাদ নিল জিম। কিন্তু পিংকি মাং ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করল না। আঙুল চেটে খেল ও।

'লেকটা গোলাকার,' খাওয়া শেষে মন্তব্য করল জিম। ও ঠিক বলেছে—ওপর থেকে জলের গোলাকার বৃত্তটা পরিষ্কার বোঝা যায়। মহাশূন থেকে চাঁদনী রাতে লেকটাকে মনে হবে বিষণ্ণ একটি চোখ। আকাশে মে ভেসে যেতে দেখলে চোখটি হয়তো পিটপিট করবে। পিংকি একবার ভাব দুঃস্বপ্নটার কথা জিমকে বলে। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। ও যে জিমকে সন্দেহ করছে তা জিম টের পেয়েছে কিনা জানে না পিংকি। কাজেই বিষয়টি নিয়ে কথা না বলাই ভাল।

হয়তো কোন একসময় জিমকে ওর হত্যা করতে হতে পারে।

কিন্তু ও তো আর জেনি নয়। ও এখনও কাউকে খুন করার কথা ভাবতেই পারে না।

'শুনেছি উল্কাপাত থেকে এ লেকের সৃষ্টি,' বলল পিংকি।

'হুঁ। এক লাখ বছর আগের কথা।'

ওর দিকে ঘুরল পিংকি। 'তুমি কী করে জানো?'

কাঁধ ঝাঁকাল জিম। 'এ কথা সবাই জানে। ভাবা যায়? আকাশ ফুঁড়ে এক চাঙড় পাথর বেরিয়ে আছড়ে পড়েছে এখানে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে এ থেকে হাজারটা পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছে। এ উপত্যকার জন্ম হয়েছে, বহুদিন এটি ছিল আগুনে উপত্যকা। লোহা মিশ্রিত পাথর গলে গিয়ে মাটির গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করেছে, হয়ে উঠেছে এটার অংশ বিশেষ। অবশেষে শীতল হবার পরে পানি জমানোর মত একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

'সেথিয়া,' বলল পিংকি। জিমের বর্ণনা এমন প্রাঞ্জল যেন সে উল্কাপাত স্বচক্ষে দেখেছে।

ভুরু কোঁচকাল জিম। 'এ নাম কখনও শুনিনি।'

'ম্যানটনরা পয়েন্ট লেকের এ নাম দিয়েছিল।'

'এর অর্থ কী?'

'আমি জানি না,' বলল পিংকি। 'তোমার হাতের কী অবস্থা?' লম্বা আস্তিনের জামা পরেছে জিম। ওর ডান নাকি বাম হাত কেটেছিল মনে করতে পারল না পিংকি।

'ভাল,' জবাব দিল জিম।

'এখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা?'

'হুঁ।'

'ব্যথা লাগে?' জানতে চাইল পিংকি।

'না,' হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল জিম। 'চলো।'

'কোথায়?'

'সাঁতার কাটব।'

'হাতের ক্ষত নিয়ে পানিতে নামবে?'

'ওতে কিচ্ছু হবে না।' বলল জিম।

ভয় পেল পিংকি, 'পানি তো ঠাণ্ডা।'

হাত বাড়িয়ে দিল জিম। 'ওখানে যেতে যেতে তুমি গরম হয়ে যাবে।'

পিংকি ওদের বাড়ি আসতে আসতে ঘেমে গেল। এরপরে কী ঘটবে জানে না ও। ওকে এক সুপ্ত কাআতু রক্তস্নানে সাঁতার কাটার আহ্বান জানিয়েছে। সারা গ্রীষ্ম জুড়েই লোকে লেকে সাঁতার কাটছে। ওদের মধ্যে কেউ তাদের পড়শীদের খেয়ে ফেলেছে বলে শোনা যায় নি। তবে সমস্যা হলো পিংকি দানবদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

ঘরে ঢোকা মাত্র জিম চুমু খেল পিংকিকে।

গতরাতের চেয়ে আজ চুম্বনের স্বাদ ভাল লাগল পিংকির।

পিংকিকে নিয়ে ওর বেডরুমে চলে এল জিম। তবে এখানে থামল না। ব্যালকনির দরজা খুলল জিম। প্লাস্টিক মাংসের সাদা হাড় চাটছিল, মুখ তুলে চাইল। ওদেরকে দেখে ছুটে চলে গেল ঘরের ভেতরে। জিম ব্যালকনিতে চলে এল। তাকাল শান্ত হ্রদে। বাতাস গতকালকের চেয়েও উষ্ণ, কবরের নিস্তব্ধতা চারদিকে।

'চলো, সাঁতার কাটি,' প্রস্তাব দিল জিম।

শারীরিক অনুশীলনটা অন্যভাবে করতে চাও না তুমি?

'এ লেকটা কতখানি গভীর?' প্রায় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'তুমি যা কল্পনা করছ তার চেয়েও বেশি,' শার্ট খুলে ফেলল জিম। হারকিউলিসের মত শরীর একখানা। ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। অস্পষ্ট একটুকরো হাসি ফুটল ওষ্ঠে–আজ সন্ধ্যার সর্বপ্রথম হাসি–সাদা ব্যাণ্ডেজের দিকে পিংকি তাকিয়ে আছে দেখে হেসেছে। 'সর্দি এখনও সারেনি?' জিজ্ঞেস করল

ও।

ইতস্তত গলায় জবাব দিল পিংকি। 'না।'

'তুমি সাঁতার জানো?'

'জানি।' গলায় ঝোলানো কবচটার কথা মনে পড়ল পিংকির। জিমকে জিনিসটা ও দেখতে দিতে চায় না। 'আগে একটু বাথরুমে যাব।'

'যাও।'

দ্রুত বাথরুমে ঢুকে পড়ল পিংকি, মস্তকহীন সোনালি বাদুড় খুলে ফেলল গলা থেকে। এটা কীসের প্রতীক জানে না ও: কাআতু নিশ্চয়ই বাদুড় ছিল না। বোধহয় ভিনগ্রহের দানব-টানব কিছু ছিল। কবচটা মেডিসিন কেবিনেটে লুকিয়ে রাখল পিংকি।

ঝপাস করে জোর শব্দ হলো। পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে জিম। এই-ই সুযোগ। পিংকি এক ছুটে গাড়িতে উঠে কেটে পড়তে পারে। জর্জের বাসায় গিয়ে টিভি কিংবা ভিসিআরে হরর ছবি দেখতে পারে দু'জনে মিলে পপকর্ন খেতে খেতে। স্বাভাবিক একটি শনিবারের সন্ধ্যা কেটে যাবে। কিন্তু ওকে কে যেন জায়গায় বেঁধে রাখল। আচ্ছা, দৈত্য-দানো বলে তো সত্যি কিছু নেই, তবে? অবশ্য ওখানে যদি সত্যি কোন শয়তান থেকে থাকে তাহলে শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করার ভান করলেও কাজ হবে না, এখান থেকে পালাতেও পারবে না পিংকি।

বেদিং সুট না নিয়েই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল পিংকি। চলে এল ব্যালকনিতে। জিম একশো হাত দূরে। ওকে ব্যালকনিতে দেখে হাত নেড়ে ডাকল জিম। 'চলে এসো।'

সেথিয়া। রক্তস্নান। কাআতু। লেকের পানির মত ঠাণ্ডা।

'আসছি,' ফিসফিস করল পিংকি। রাতের বাতাস শীতল পরশ বোলাল গায়ে। ব্যালকনির কিনারে এসে উঁকি দিল। সহস্র-খণ্ড হীরের মত চমকাচ্ছে লেকের জল। কিনারে লেকের গভীরতা কতটুকু জানা নেই পিংকির। ও লাফ দিয়ে পড়ে ঘাড় মটকে ফ্রেড কিথের মত পঙ্গু হতে চায় না।

'জলদি,' তাড়া দিল জিম।

'আচ্ছা,' বলল পিংকি।

তারপর লাফ দিল।

ওর পা ডুবে গেল অতলে। লাথি মেরে দ্রুত পানির ওপরে ভেসে উঠল পিংকি। ঠিক তখন ঠাণ্ডাটা হামলা চালাল ওর গায়ে, যেন একখণ্ড হিমশৈলে অবতরণ করেছে ও।

'উঃ!' চিৎকার দিল পিংকি।

দূর থেকে হাঁক ছাড়ল জিম। 'সাঁতরাও। তাহলে শরীর গরম হবে।'

ভুল বলেছে জিম। তীর থেকে যত দূরে সরে যেতে লাগল পিংকি, শীত ততই পেয়ে বসল ওকে। খুব দ্রুত ও শরীরের তাপমাত্রা হারাচ্ছে। এক মিনিটের বেশি ও বোধহয় পানিতে থাকতে পারবে না।

এমন সময় জিম এসে টান মেরে ওকে নিজের কাছে নিয়ে গেল। চুমু

খেল। ওর শরীর লেগে রয়েছে পিংকির গায়ে। পিংকি মনে মনে ভাবছে মি. শাইনিং ফিদার এ তরুণ সম্পর্কে মস্ত ভুল ধারণা পোষণ করে আছেন। জিমের স্পর্শে শরীর গরম হয়ে উঠল পিংকির। মাথাটা ঈষৎ পেছনের দিকে হেলে গেছে, জিমের পেশীবহুল বাহুর আলিঙ্গনের মাঝে দুর্বল নারী শরীর। জিমকে মনে হচ্ছে দুষ্প্রাপ্য একখণ্ড মাংস যাকে খোদা নিজের হাতে সযত্নে তৈরি করেছেন এবং পিংকি সৌভাগ্যবতী কারণ অন্য সব মেয়েকে হারিয়ে দিয়ে এই সুদর্শন তরুণকে ও একান্ত কাছে পেয়েছে।

'মিষ্টি,' সজোরে ফিসফিস করল পিংকি।

জিম সহসা পিংকির জিভে কামড় বসাল। ব্যথা পেল পিংকি। টের পেল জিভ কেটে বেরিয়ে এসেছে রক্ত। কিন্তু রক্তের স্বাদটা ওকে আনন্দ দিল। মাথায় সেই হাতুড়ির বাড়িটা ফিরে এসেছে হাজারগুণ জোরে, কিন্তু ব্যাপারটাকে আমলে আনতে চাইল না পিংকি। চুমুতে এত সুখ!

জিম কতক্ষণ ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল জানে না পিংকি। যেন অনন্ত কাল। অবশেষে ওকে হাত ধরে লেক ছেড়ে উঠে আসতে সাহায্য করল জিম। চলে এল ব্যালকনিতে। পিংকির দুধসাদা গা যেন শ্বেত মার্বেল, পানির ফোঁটা বা বিন্দুগুলো বরফ টুকরোর মত লেগে রয়েছে শরীরে। কিন্তু এখন শীত করছে না পিংকির। তাই ঠাণ্ডায় কাঁপছেও না। শ্বাস করছে কিনা তা-ও যেন জানে না ও।

বেডরুমে ঢুকল ওরা, পাশাপাশি শুয়ে রইল। জিম তাকাল পিংকির দিকে, পিংকি ওর দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। জিমের চোখজোড়া বড় বড় এবং গভীর; যেন চোখের তারায় মহাশূন্য দেখতে পাচ্ছে পিংকি। ও চোখ যেন এ পৃথিবীর নয়, অন্য ডাইমেনশনের। ওগুলো শুধু জিম নয়, যেন পিংকিরও চোখ–নতুন জন্ম নেয়া দুই যমজ–অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে জ্বলজ্বল করছে। জিমের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের চক্ষু মুদে এল পিংকির, প্রবেশ করল এক আঁধার রাজ্যে।

অমর দুনিয়ায় আগমন ঘটেছে পিংকির। তবে শরীর ছাড়াই। ওর শরীরটাকে একজনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধুই দেহ, আত্মা নয়। দ্বিতীয়টির কোন প্রয়োজন নেই বা ছিল না পিংকির। ওর মনটা এখন দুনিয়ার মন, আর এ জগৎ সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে।

কিছুক্ষণ পরে মুখে বাতাসের ঝাপটা পেল পিংকি। আকাশে আগুনের বিরাট বলের মত সূর্যের রশ্মিতে চোখ জ্বালা করে উঠল। সবকিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে পিংকির কাছে। তবু মনে হচ্ছে এ জায়গাটা ওর চেনা। ওর শরীর এখানে বড় হয়েছে। এর নাম পৃথিবী। ওই অমর দুনিয়া ওকে গলাধঃকরণ করার আগে এখানেই পিংকির বাড়ি ছিল। তবে ফিরে এসে কোন নস্টালজিয়ায় ভুগছে না ও, ওর এখন শুধু খিদে পেয়েছে।

দূরে কয়েকজন মানুষ দেখতে পেল পিংকি। হেঁটে আসছে এদিকেই। ওরা একটি গাড়ি থেকে নামল, যে বাহনে চড়ে পৃথিবীতে গিয়েছিল পিংকি। ওদেরকে দেখে হাত নাড়ল সে। কথা বলল। লোকগুলো পিংকিকে দেখতে পেয়ে খুশি।

তারা ভেবেছে পৃথিবীতে বুঝি শুধু একাই বেঁচে আছে পিংকি। তবে পিংকির কথা তারা কিছুই বুঝতে পারল না। পিংকি শুধু ভাবছিল এদের মাংস খেতে কেমন লাগবে। পরে, অন্ধকারে জানা যাবে ব্যাপারটা।

সূর্য যেন অতিরিক্ত রকমের উজ্জ্বল। অসুস্থ লাগছে ওর।

পিংকি ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে চায়।

এবং স্বপ্ন দেখতে চায়।

ও নানান স্বপ্ন দেখে। এ জগতে স্বপ্ন ছাড়া কিছু নেই। এখানে আছে একের পর এক দুঃস্বপ্ন। এ ঘুম থেকে জেগে ওঠার কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু অবশেষে পিংকির শরীর জেগে উঠল এবং প্রতিশোধের বাসনায় এগিয়ে চলল।

সময় বয়ে চলল। খাদ্য গ্রহণের রাত এল। ধোঁকা দেয়ার দিন এল। পিছু নেয়ার রাত গড়াল। অবশেষে এল লুকিয়ে থাকা আর পালিয়ে বেড়ানোর দিনগুলো। যেসব ঘনিষ্ঠ বন্ধুর শরীর ধারণ করেছিল পিংকি, সকলে হয় মারা গেছে কিংবা তাদেরকে খেয়ে ফেলা হয়েছে অথবা তারা ছিল ওর মত, পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কাছ থেকে যাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল যে দূরের জগৎ দ্বিতীয় নিবাস তৈরির জায়গা নয় বরং ওখানে গেলে আলিঙ্গন করতে হয় মৃত্যু যার কোন শেষ নেই।

শেষের দিকে পালিয়ে বেড়ানোও কঠিন হয়ে উঠল কারণ সময় যত গড়াতে লাগল ততই শরীরটা এমন একটি জিনিসে পরিণত হচ্ছিল যে যারা ওই শরীরের ওপর নজর রেখে চলছিল তারা আতংকিত হয়ে উঠল। তবে এ নতুন শরীর নানা দিক থেকেই শ্রেষ্ঠতর ছিল। এ শরীর বলবান; এটা উড়তে পারে। সে এক জায়গায় খাদ্য গ্রহণ করার পরে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে স্বল্প সময়ে। তবে সে অন্যদের কাছ থেকে এমনভাবে আলাদা হয়ে যাচ্ছিল যে প্রথমে খাবার সংগ্রহ তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল, তারপর হয়ে উঠল অসম্ভব। সে দুর্বল হতে শুরু করল। সূর্যের আলো সে আর সহ্য করতে পারে না, তাই মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে। তবে কাজটা ছিল ভুল। কারণ সে নিজেকে একঘরে করে ফেলছিল। যে দলটির সঙ্গে তার শারীরিক পরিবর্তন ঘটছিল তারা সকলে একটি কালো গুহায় আশ্রয় নিল। লাল উর্দিপরা মানুষেরা সে গুহায় একদিন ঢুকে পড়ল। তাদের হাতের অস্ত্র থেকে লাল টকটকে আলো বেরোয়। ওর দলের একজন ওই অস্ত্রধারীদের দঙ্গলে একদিন ঢুকে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোর রশ্মিতে তার শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আলোর ওই রশ্মির সামনে যা পড়ে তাই কেটে টুকরো হয়ে যায়। তারপর আরেকদিন তার দলের আরেকজন খুন হয়ে গেল। এরপরে আরও একজন। একসময় শুধু সে একা বেঁচে রইল। মানুষের দল তাকে ঘিরে ফেলল, চোখে বিজয় উল্লাস। কিন্তু সে প্রাণভিক্ষা চাইল না। সে তো অমর দুনিয়ার একটা অংশ। আর এটা বেঁচে থাকবে চিরকাল। মানুষ তৃতীয় গ্রহ থেকে পঞ্চম গ্রহে যাবে আর তার মত প্রজাতি আরও জন্ম নেবে। দুনিয়ার বীজ ছড়িয়ে পড়বে। সবশেষে এর খিদে মিটবে।

শেষ যে স্মৃতিটা তার মনে ছিল তা হলো শরীর থেকে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত

হয়ে গেছে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে গেল পিংকি। চাইল চোখ মেলে। বিছানায় একা শুয়ে আছে ও। ঠাণ্ডায় হিম গা। কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে নিল পিংকি। দেখল জিম ব্যালকনিতে নগ্ন গাত্রে একা বসে আছে। চোখ লেকের কালো জলে।

'জিম,' ডাকল পিংকি। 'বিছানায় এসো।'

ওর কথা শুনলেও সাড়া দিল না জিম। চাঁদের আলোয় ওর শরীরটা ভুতুড়ে লাগছে। ওর সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে। পিংকির খুব খিদে পেয়েছে। সে বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরে ঢুকল।

ঘড়িতে রাত বারোটা বাজে। কিন্তু দ্বিতীয় কাঁটাটা নড়াচড়া করছে না। তার মানে ঘড়ি নষ্ট। রাত বোধহয় মধ্য যামিনী পার করেছে বহু আগেই, অনুমান করল পিংকি। আইসবক্স খুলে গরুর মাংসের দুটো স্টেক বের করল। চুলা জ্বালিয়ে প্যানে ছেড়ে দিল মাংসখণ্ড দুটো। বেশিক্ষণ রান্না করার ধৈর্য নেই পিংকির। শুধু মাংসের শীতল ভাবটা আগুনের আঁচে দূর হলেই হলো।

আধ সেদ্ধ মাংস গপাগপ খেয়ে ফেলল পিংকি। জিমকে জিজ্ঞেসও করল না ওর খিদে পেয়েছে কিনা।

ও ওর নিজের খাবার নিজেই জোগাড় করে নিতে পারবে, খেতে খেতে ভাবল পিংকি।

কিছুক্ষণ পরে বেডরুমে ফিরে এসে দেখে জিম ব্যালকনি কিংবা অন্য কোথাও নেই। ঘরের বাইরে চলে এল পিংকি, তাকাল লেকের দিকে। এক জায়গার পানিতে বুদ্বুদ উঠছে। যেন কেউ ডাইভ দিয়েছে।

'জিম?' গলা চড়াল পিংকি।

কোন সাড়া নেই।

'জিম?'

কেউ সারফেসে ভেসে উঠল না।

'সেথিয়া,' ফিসফিস করল পিংকি। শব্দটা উচ্চারণ করার পরে শিরশির করে উঠল গা। কিন্তু যেন নিজের চেতনা ফিরে পেল পিংকি। ঘুরল। পা বাড়াল বাড়িতে। বাথরুমে ঢুকে শাইনিং ফিদারের দেয়া কবচটা গলায় পরল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল ওর, সেই সঙ্গে মনে পড়ল জিমের সঙ্গে লেকের শীতল জলে অবগাহনের স্মৃতি। জিভটা ব্যথা করছে। জিম ওকে কামড়ে দিয়েছিল। নাকি পিংকি চুমু খেতে গিয়ে দু'জনের জিভেই কামড় লাগিয়েছে? ঠিক মনে পড়ছে না।

গতরাতের মত আজও গুলিয়ে উঠল পেট। মাংসটা যেন বমি হয়ে উগরে আসবে। কিন্তু বমি হলো না ওর। বিছানায় শুয়ে পড়ল পিংকি। চাদর মুড়ি দিল। মুণ্ডহীন বাদুড়টাকে মুঠোয় চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। কুৎসিত প্রাণীটার কারণেই হয়তো সেরাতে আর কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখল না পল্লবী কেয়া পিংকি।

বারো

রোববার মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস হয় না বলেই জানে পিংকি। সে ভরসাতেই ও ওখানে চলেছে। আশা করছে এমন কাউকে পেয়ে যাবে যার সাহায্যে প্রফেসর অ্যালান স্পার্কের সঙ্গে কথা বলতে পারবে। প্রফেসর স্পার্ক পয়েন্ট লেকে উল্কাপাতের ওপরে একটা আর্টিকেল লিখেছেন। ওটা পড়ার পরই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী হয়েছে পিংকি। দু'ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে সে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছাল। ওর ভাগ্য ভালই। বিজ্ঞান ভবনে একজন জ্যানিটর এবং দু'জন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলার পরে সরাসরি প্রফেসরের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ মিলে গেল। সম্ভবত সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে ছাত্রদের প্রাইভেট টিউটোরিয়াল ক্লাস নেন প্রফেসর স্পার্ক।

প্রফেসর ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি লম্বা, রোগা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সুন্দর করে ছাঁটা বাদামি গোঁফ, তাঁর ত্রস্ত নড়াচড়ায় একজন বই পোকার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। দেয়ালে ঝোলানো নানা ছবি দেখে অনুমান করা যায় প্রফেসর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং উপভোগ করেছেন একটি চিত্তাকর্ষক জীবন। পিংকিকে অফিসে ঢুকতে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানালেন তিনি, বসতে বললেন ওকে। ভেবেছিলেন পিংকি তাঁর কোন ছাত্রী। পিংকি দ্রুত জানিয়ে দিল সে পয়েন্ট হাইস্কুলের সিনিয়র একজন ছাত্রী এবং *দ্য পয়েন্ট হেরাল্ড* পত্রিকায় লেকের পানি পান করার জন্য কতটা নিরাপদ তা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখছে। প্রফেসর জানতে চাইলেন পিংকি তাঁর নাম কার কাছে শুনেছে। পিংকি সায়েন্স জার্নালে ছাপা প্রফেসরের আর্টিকেলটি তাঁকে দেখাল। এ লেখাটি সে লাইব্রেরি থেকে চুরি করেছে। বিষয়টির প্রতি তাৎক্ষণিক আগ্রহ প্রকাশ পেল প্রফেসর স্পার্কের চেহারায়।

'এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা তোমাকে জানাতে পারি আমি,' বললেন তিনি। 'তবে তোমার নিবন্ধে আমার নাম উল্লেখ করা চলবে না।'

'কেন?' জানতে চাইল পিংকি।

তিক্ত হাসি ফুটল প্রফেসরের মুখে। 'কারণ আমি এ চমৎকার প্রতিষ্ঠানটিতে আমার মাস্টারিটা চালিয়ে যেতে চাই। এবং–আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও আমার স্ত্রীর মতে–পয়েন্ট লেক নিয়ে আমি বড্ড বেশি মাতামাতি করে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছি। গত বসন্তে তোমার স্কুলের ছাত্রদের অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা তো তুমি জানোই। ধারণা করছি, সেজন্যেই তুমি আর্টিকেলটা লিখছ।'

'আমি তখনও পয়েন্ট শহরে আসিনি তবে অসুস্থতার খবর কাগজে পড়েছি।'

'ত্রিশজনেরও বেশি ছাত্রের নানারকম অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল: বমি বমি ভাব, মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা। বিভিন্ন সময়ে অনেকে অজ্ঞান

হয়েও পড়েছে। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞদের তলব করা হয়। এদের মধ্যে ডাক্তার, কেমিস্টসহ অনেকেই ছিলেন তবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কারণ আমি স্থানীয় স্কুল বোর্ডের নেক নজরে ছিলাম না।'

'তারা আপনাকে পছন্দ করত না কেন?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'অনেক আগেই আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম লেকের পাড়ে স্কুল তৈরি করা উচিত হবে না। আমার দুশ্চিন্তাটা ছিল মূলত পানীয় জল নিয়ে। কারণ খাবার পানিটা আসত লেক থেকে। ওই পানি আমার কাছে খাওয়ার অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল।

'কেন?' পিংকির প্রশ্ন।

'এখানেই স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং তাদের ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আমার সংঘাতের সৃষ্টি। আমি একজন ভূ-তাত্ত্বিক। আমি ডাক্তার, বায়োলজিস্ট কিংবা কেমিস্ট নই। লেকের পানি পান করা যাবে কি যাবে না দেখার দায়িত্ব আমার নয় তবু আমি লেক এবং ওখানকার ভূখণ্ডের ওপরে গবেষণা করি। আমার মতামত যখন তাদেরকে জানালাম, তারা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি। বরং বিষয়টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে।'

'লেকের পানিতে সমস্যা আছে এরকম ধারণা কেন হলো আপনার?' জানতে চাইল পিংকি। প্রফেসর ধীরগতিতে মূল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এদিকে খিদে পেয়েছে পিংকির যদিও এখানে আসার আগে পেটপুজো সেরে নিয়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে একের পর এক খাবার খেয়েই চলেছে ও। লক্ষ করেছে পেট ভরা থাকলে মাথাটা আর ব্যথায় দপদপ করে না। পরশু দিনের চেয়ে দশগুণ বেশি মাথা যন্ত্রণা করছে। জিম গতরাতে ওর কী করেছে? ভাবছে পিংকি। ওর জিভ কামড়ে দেয়া ছাড়াও অন্য কিছু একটা নিশ্চয়ই করেছে। পিংকির জিভ ব্যথা করছে।

'পয়েন্ট লেকের উল্কা নিয়ে আমার আর্টিকেলটা তো তুমি পড়েছ,' বললেন স্পার্ক। 'উল্কাটা যখন পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে তখন উল্কার লৌহ আকরিকের গা থেকে ছিটকে পড়া উচ্চস্তরের চৌম্বকীয় উপাদানের কথা আমার লেখায় উদ্ধৃত করেছি। ওই স্কুলের আশপাশে চৌম্বকীয় উপাদানটির প্রভাব বেশ শক্তিশালী। বিশেষ করে লেকের বেডরকে এর অবস্থান তো খুবই ব্যাপক।'

বিরতি দিলেন তিনি। 'উঁচু মাত্রার ভোল্টেজের ইলেকট্রিক তারের আশপাশে যারা বসবাস করে তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে কোন লেখা পড়েছ?'

'না,' বলল পিংকি।

'তারা প্রায়ই মাথাব্যথা এবং শারীরিক ক্লান্তি নিয়ে অনুযোগ করে। তবে সকলে নয়, কেউ কেউ। এরকম কেন হয় এর নানারকম ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি জনপ্রিয় থিওরি হলো তারগুলো থেকে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় তা মানব শরীরের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভারসাম্যকে ব্যাহত করে।'

'তার থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'একটি তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ স্রোত থাকে

তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। এ হলো সাধারণ পদার্থবিদ্যা। পয়েন্ট লেকে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে পানির বিশাল একটি অংশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বকীয় লৌহ আকরিকের বেডরকের ওপর থিতু হয়ে রয়েছে। যখন স্কুলঘর তৈরির প্রস্তাব দেয়া হলো আমি তখন বলেছিলাম যে পানির সঙ্গে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সংস্পর্শ রয়েছে তা ছাত্রদের পান করা উচিত হবে না।'

'পানি কি চুম্বকায়িত হতে পারে?' জানতে চাইল পিংকি।

'এই একটি জায়গায় আমি স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং বিজ্ঞানমনস্কদের সঙ্গে প্রবল তর্কে জড়িয়ে পড়ি। তোমার প্রশ্নের জবাব হলো–ট্রাডিশনাল দিক থেকে চিন্তা করলে–না। কারণ–ম্যাগনেটিক পানি বলে কিছু নেই। চৌম্বকীয় মেরুবৈপরীত্বের জন্য আয়রনের মত কিছু একটা দরকার হবে যা দিয়ে পজিটিভ তৈরি করা যায়। ভাল কথা তুমি কি জানো, একটি গোটা লৌহ শরীর ম্যাগনেটাইজড করতে কী পরিমাণ পোলারাইজড অ্যাটমের দরকার হয়?'

'না, জানি না,' জবাব দিল পিংকি।

'একশোতে একটিরও কম,' বললেন স্পার্ক।

'তাই নাকি?' মাথা ঝাঁকাল পিংকি যেন খুব মোহিত হয়েছে। প্রফেসর যা বলছেন তা শুনতে চিত্তাকর্ষক লাগছে বটে তবে তিনি কোন্‌দিকে এগোচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। পিংকির পেটের ভেতরটা খিদেয় মোচড় দিল। যেন ওকে বলছে, হয় আমাকে খেতে দাও নতুবা আমিই তোমাকে খেয়ে ফেলব।

'এটা হলো পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর,' বলে চললেন স্পার্ক, 'এক মুহূর্তে লৌহ আকরিক অচৌম্বকীয় থাকছে কিন্তু যে মুহূর্তে কতগুলো অণু ঘনীভূত হলো, ওটা পরিণত হলো চুম্বকে। এটা একটা অসাধারণ ফেনোমেনা। সে যাকগে, কী যেন বলছিলাম? ওহ, হ্যাঁ। এরকম একটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেটি বিস্ফোরিত হবার অপেক্ষায়, আমি সেখানকার ছাত্রদের পানি খেতে বারণ করি। যদিও নিজেকে ম্যাগনেটিক করার ক্ষমতা পানির নেই, কিন্তু কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন যা পানিতে ঘটেছিল, এরকম একটি ফিল্ডে পরিণত হওয়া বিস্ময়করই বটে। পানি কী দিয়ে তৈরি? দুটো হাইড্রোজেন অণু আর একটি অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানি তৈরি হয়। পানি যখন চুম্বকে রূপান্তরিত হয় তখনও এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু পানির অণুতে সম্ভবত পরিবর্তন ঘটে।'

'সম্ভবত?' জিজ্ঞেস করল পিংকি। 'ঘটে কি ঘটে না বলুন।'

'ওই পরিবর্তন প্রশ্নসাপেক্ষ। আমার ধারণা ঘটে। মলিকিউল বা অণুগুলো সব নির্দিষ্টভাবে সারিবদ্ধ থাকে এবং এর ফলে অন্য অণুর সঙ্গে পানির প্রতিক্রিয়া ঘটে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা হয়তো আমার মতের বিরুদ্ধেই যাবেন, তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যেসব উদ্ভিদ ওই পানি দ্বারা পুষ্ট সেগুলো ম্যাগনেটিক কন্টেইনারে রাখার পরে হয় মারা গেছে কিংবা নির্জীব হয়ে পড়েছে।'

'তার মানে পানিটার কোন না কোনভাবে পরিবর্তন ঘটেছে,' মন্তব্য করল পিংকি।

'আমিও তা-ই বলছি। তোমাদের স্কুলের ফিজিশিয়ানদের অভিমত আমি

নাকি কল্পবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলছি। তবে পয়েন্ট লেকের মধ্যে একটি ব্যাপার রয়েছে যা হ্রদটিকে এলাকার অন্যান্য লেক থেকে আলাদা করে রেখেছে।'

'কী সেটা?'

'পয়েন্ট লেকে কোন মাছ নেই। কোনদিন ছিলও না। মাছ, পোকামাকড়, জলজ উদ্ভিদ–কিছু নেই।'

'আশ্চর্য তো!' বলল পিংকি। 'এ কথা জানার পরে তো সবার টনক নড়া উচিত ছিল।'

'নড়েনি। যাকগে, আমার কথা শেষ করি। পয়েন্ট লেকের পানির মধ্যে মাত্র একটি জিনিস আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হলো এর ম্যাগনেটিজম। এছাড়াও গোটা লেক ভর্তি রয়েছে অচেনা কিছু ফসিলাইজড মাইক্রোঅর্গানিজম।'

'আর ইউ সিরিয়াস?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'ইয়েস।'

'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি পানি খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। অচেনা কোন মাইক্রোঅর্গানিজমের কথা তো কাগজে পড়িনি।'

'আমি বিষয়টি নিয়ে না লেখা পর্যন্ত তুমি এ সম্পর্কে কোন লেখা পড়ার সুযোগও পাবে না,' উদাস গলায় বললেন স্পার্ক। 'আমি এ বিশেষ শ্রেণীর প্রাণিসত্তা বা অর্গানিজম নিয়ে অন্য যে কারও চেয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করেছি।'

'কিন্তু অন্য কারও চোখে এ প্রাণিসত্তার বিষয়টি ধরা পড়ল না!' অবাক পিংকি। 'পানিতে ভয়ঙ্কর একটি জিনিস রয়েছে অথচ সে পানি ওরা আমাদেরকে পান করতে মানা করেনি, সত্যি আশ্চর্য!'

'অনেকেই অর্গানিজম সম্পর্কে জানে তবে এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা একমাত্র আমিই জানি। কারও ধারণাই নেই এ কত বিপজ্জনক। অবশ্য এেকে কেউ বিপজ্জনক বলে মনেও করেনি।'

'কেন করেনি?' প্রশ্ন করল পিংকি।

'কারণ আমি আগেই বলেছি এটা ফসিলাইজড অর্গানিজম। এটা মৃত। মরা প্রাণিসত্তা দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয় নেই।'

'তাহলে এ প্রাণিসত্তা নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন?' জানতে চাইল পিংকি।

জবাব দিতে ইতস্তত করলেন স্পার্ক। 'এ প্রশ্ন এক রহস্য বা কল্প-বিজ্ঞানের দোর খুলে দেয়। তবে বিষয়টি নির্ভর করবে তুমি এটাকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে চাও।' বিরতি দিলেন তিনি। 'এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জায়গা বা সময় এটা নয়।'

সামনে ঝুঁকে এল পিংকি, 'প্লিজ, বলুন। আপনি না চাইলে আমি এ বিষয়টি আমার নিবন্ধে উল্লেখ করব না।'

'তোমার নিবন্ধেই যদি বিষয়টি রাখতে না চাও তাহলে শুনতে চাইছ কেন?'

'কারণ শুনতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে,' সত্যি কথাটাই বলল পিংকি।

ওর যুক্তি মনঃপূত হলো প্রফেসরের। 'ছাত্রদের ওই ঘটনার এক বছর পরে

তোমার নিবন্ধ লেখার কারণ কী?'

পিংকি স্পার্কের চোখে চোখ রাখল। 'কারণ ছাত্ররা আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেছে।'

একটা ভুরু ওপরে উঠে গেল প্রফেসরের। 'জানতাম না তো!'

'আমরা জানি।'

'ইন্টারেস্টিং,' বললেন স্পার্ক। 'পয়েন্ট হাইতে যে মেয়েটি তার বন্ধুদের গুলি করে মেরে ফেলেছে তার কথা পেপারে পড়েছি। আমাদের আলোচনার সঙ্গে ওই বিষয়টির কি কোন সম্পর্ক রয়েছে?'

'রয়েছে,' জবাব দিল পিংকি।

'বিস্তারিত বলো।'

'আগে আপনি বলুন আপনার কী করে ধারণা হলো এক মৃত অর্গানিজম অস্বাস্থ্যকর হতে পারে।'

'তাহলে তুমি বলবে স্কুলে কী ঘটছে?'

'আমি যা জানি তা বলব,' বলল পিংকি।

'বেশ,' স্পার্ক দরজার দিকে তাকালেন নিশ্চিত হতে যে অন্য রুম থেকে কেউ তাদের আলোচনা শুনছে না।

'অর্গানিজমটি আমাকে ভাবনায় ফেলে দেয় কারণ এর কোন অস্তিত্ব আমি কোন বইতে খুঁজে পাইনি। এর একটি ডিএনএ কাঠামো রয়েছে যা অন্য কারও সঙ্গে মেলে না। আসলে বলা উচিত সাধারণভাবে এর কোন ডিএনএ-ই নেই।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। এটা যদি এতটাই আলাদা রকমের হয়ে থাকে তাহলে গোটা দেশের অর্ধেক জীববিজ্ঞানী কি এর ওপরে হামলে পড়ত না?'

রেগে গেলেন অধ্যাপক। 'এ ক্যাম্পাসে বায়োলজির চারজন ফুল প্রফেসর রয়েছেন। এ অর্গানিজমের বিষয়ে উঁকি দিতে এদের একজনকেও আমি রাজি করাতে পারিনি।'

'আশ্চর্য!'

'তুমি জানো না পয়েন্ট লেকের পানি পান করা উচিত হবে না এ কথা বলতে গিয়ে আমাকে কীরকম নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি আমার কলিগদেরকে অর্গানিজমটি সম্পর্কে বললাম, জানালাম এটি একটি অসাধারণ জিনিস। কিন্তু কেউ কোন আগ্রহই প্রকাশ করল না। তারা আমাকে পাগল ঠাউরেছে। এমন নয় যে বায়োলজিস্টরা মাইক্রোস্কোপে একবার চোখ বুলিয়েই অর্গানিজমের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলো বের করে ফেলতে পারবেন। এজন্য সময়ের প্রয়োজন। আমার কলিগদের গবেষণা করার সে সময় কোথায়? সে যাকগে। যা বলছিলাম। এই বিশেষ শ্রেণীর প্রাণিসত্তার আবাসস্থল কিন্তু একমাত্র পয়েন্ট লেক নয়।'

'কিন্তু আপনি না বললেন এর কথা কোন বইতে লেখা নেই!'

'নেই বটে,' বললেন তিনি। 'তবে আমি এক জায়গায় ওটার সন্ধান পেয়েছি।'

'কোথায়? জিজ্ঞেস করল পিংকি।

‘দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। আন্দেজ পর্বতমালার উঁচুতে।’

জোরে শ্বাস টানল পিংকি। ‘ওখানেও আরেকটি উল্কাপাত হয়েছিল–আপনি আপনার আর্টিকেলে লিখেছেন, না?’

‘হ্যা। ওই হ্রদের নাম লেক কুরো। তবে ওখানে যারা বাস করে সেই রোপানদের কাছে লেকটি লেক সেন্টিয়া নামে পরিচিত।’

‘সেথিয়া,’ ফিসফিস করল পিংকি।

শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল স্পার্কের। ‘কী বললে?’

‘কিছু না।’

‘আমি তোমার কথা শুনে ফেলেছি। তুমি দেখছি রিসার্চের জন্য ভালই পড়াশোনা করেছ। ম্যানটনরা পয়েন্ট লেকের নাম দিয়েছে সেথিয়া বা রক্তস্নান। প্রায় একইরকমের দুটো নাম কেমন অস্বস্তিকর। তবে এর কারণ আমি ঠিক জানি না। আরও অস্বস্তিকর এজন্য যে দুটো হ্রদের ইতিহাসেও কোন তারতম্য নেই। ম্যানটনরা মনে করে পয়েন্ট লেক একটি অশুভ জায়গা। তারা–’

‘আমি গল্পটা জানি,’ বাধা দিল পিংকি।

‘জানাটাই স্বাভাবিক। কাআতুর কথা জানো?’

‘জী, জানি।’

‘শুনলে অবাক হবে রোপানরা একই রকম একটি প্রজাতির কথা বলে যার উৎপত্তি লেক সেন্টিয়া থেকে। ওই প্রজাতির নাম *কালাইর*।’

‘একই নাম!’ চমকে উঠল পিংকি।

‘হ্যা। ব্যাপারটা অদ্ভুত কারণ ম্যানটন এবং রোপানদের ভাষার মধ্যে কোন মিল নেই। দুই জাতি দুই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু দুটো উল্কার কারণে সৃষ্ট লেককে ঘিরে এদের ভাষা হয়ে গেছে একরকম।’

‘কালাইর কী জিনিস?’ জিজ্ঞেস করল পিংকি।

‘কাআতুর মত এরও একই কাহিনী। কিংবদন্তীর মতে দুটোই শয়তান। তারা শুধু মানুষের মাংস খায়। তারা মানুষকে নিজেদের মত বানিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে।’

‘তারা কি উড়তে পারে?’

‘এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না,’ বললেন স্পার্ক।

‘কালাইর কি মানুষের রূপ নিয়েছিল?’ পিংকির প্রশ্ন।

একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন স্পার্ক। ‘কালাইর সম্পর্কে আমি যদ্দূর জানি মিথ বলে মূল কালাইর এ পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল না।’

‘কোন্ গ্রহ থেকে ওরা এসেছে?’ জানতে চাইল পিংকি।

‘আমরা কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক অনুমান থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।’

‘তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি কী জানেন তা-ই বলুন।’

কাঁধ ঝাঁকালেন স্পার্ক। ‘রোপানরা জ্যোতির্বিদ হিসেবে খুবই উঁচুদরের ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক আগেই তারা জানত সূর্যকে তার গ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে। তাদের বিশ্বাস পঞ্চম গ্রহ থেকে এসেছিল কালাইর।’

‘সেটা কোন্ গ্রহ?’ জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'বৃহস্পতি। কিন্তু কালাইর-এর ওখান থেকে আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। গ্যাসে মোড়া বিশাল এক গ্রহ বৃহস্পতি। এর আবহাওয়া ভয়ানক বিষাক্ত এবং এর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড এমনই ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড চাপে সবকিছু গুঁড়িয়ে যায়। ওই গ্রহে জীবনের কোন অস্তিত্বই নেই। তবে...' থেমে গেলেন প্রফেসর।

'তবে কী?'

'এসব গল্পের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মিল খুব কমই থাকে। বরং কল্পনায় মিল খুঁজে পাওয়া যায় অনেক বেশি।'

'তাতে কী? পুরো ব্যাপারটাই তো কাল্পনিক।'

'হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে,' বললেন স্পার্ক।

'ধারণা করছি অতীতে সূর্যের পঞ্চম গ্রহটি বৃহস্পতি নয়, ছিল অন্য কোন গ্রহ।'

'গ্রহগুলো প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে জায়গা বদল করে নাকি?'

হেসে উঠলেন স্পার্ক। 'না। তবে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে রয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জের বলয়। এ কথা সবাই মেনে নিয়েছে যে গ্রহাণুপুঞ্জ হলো প্রকৃত পঞ্চমগ্রহের পরিত্যক্ত অংশ।'

'পঞ্চম গ্রহের কী হয়েছে?'

'কেউ জানে না। কোন কারণে ওটা ধ্বংস হয়ে যায়।'

'কবে?' জানতে চায় পিংকি।

'বেশিরভাগ জ্যোতির্বিদের ধারণা কয়েক কোটি কিংবা কয়েক লাখ বছর আগে এ ঘটনা ঘটে। এ হিসেবটা তাঁরা করেছেন বেশিরভাগ উল্কার পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সময়টাকে ধরে। ধারণা করা হয় আসল পঞ্চম গ্রহটি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে ছোট এবং বড় আকারের প্রাচীন এ উল্কাগুলো পৃথিবীতে আঘাত হানে।'

'আপনি এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'আমি বিশ্বাস করি পঞ্চম গ্রহটির বিস্ফোরণের কারণে আমাদের পৃথিবীর দিকে বিশাল বিশাল প্রস্তর-খণ্ড ছুটে আসে। বেশিরভাগ সাগরে ছিটকে পড়েছিল। অল্প কিছু পাথর জমিনে পড়ে।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল পিংকি। 'আপনার আর্টিকেলে লেখা আছে এক লাখ বছরেরও কম সময় আগে পয়েন্ট লেকের সৃষ্টি। আপনি বললেন একই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকাতেও হ্রদটি গড়ে ওঠে।'

'প্রায় একই সময়ে, হ্যাঁ।'

পিংকি লক্ষ করছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রফেসর কীসের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন পঞ্চম গ্রহটি কোটি কোটি নয়–মাত্র এক লাখ বছর আগে ধ্বংস হয়েছে? আপনার ধারণা এ উল্কা দুটো ওই গ্রহের ধ্বংসাবশেষ থেকে ছুটে এসেছিল?'

প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'তোমার উপলব্ধি ক্ষমতা চমৎকার। হ্যাঁ, আমার ধারণা আমাদের গ্রহের মূল মেটিওরিক বমবারডমেন্টের উৎস অন্য কিছু আর এটা ঘটেছে আমাদের সৌরজগতের কাঠামো তৈরির

কাছাকাছি সময়ে। তবে আমি মনে করি পয়েন্ট লেক এবং লেক কুরো যে উল্কার সাহায্যে সৃষ্টি সে উল্কা এমন এক গ্রহ থেকে এসেছিল যাতে জীবন ছিল।'

প্রায় চেয়ার ছেড়ে পড়ে যাবার অবস্থা হলো পিংকির। সবকিছু কেমন খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। 'মাইক্রোঅর্গানিজমের কারণে?' ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন স্পার্ক। 'হুঁ।'

'কারণ এটাকে দেখে মনে হয় না যে এটা এখান থেকে এসেছে!'

আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন প্রফেসর। 'ঠিক তাই।'

'এতে হতাশ হবার কী আছে?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'তোমাকে সৌরজগতের জীবন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বুঝতে হবে। পৃথিবী ছাড়া, একমাত্র মঙ্গল গ্রহকেই মনে করা হয় যেখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু মহাশূন্যযান ভয়েজার প্রমাণ করেছে ওই গ্রহটি মৃত, ওখানে জীবনের কোন চিহ্ন নেই। আমার শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী বন্ধুগণ এ তত্ত্ব স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানাবেন যে মঙ্গল থেকেও বহুদূরে, আমাদের মূল পঞ্চম গ্রহে জীবনের বিবর্তন ঘটেছিল।'

'কিন্তু ওখানে জীবনের বিবর্তন তো ঘটতেই পারে,' বলল পিংকি।

'আমারও একই মত। যদি উপযুক্ত আবহমণ্ডল থাকে তাহলে মূল পঞ্চম গ্রহের সারফেস বর্তমান পৃথিবীর মতই উষ্ণ থাকার কথা।'

'তাহলে সমস্যাটা কী? ওরা আপনার কথা কেন বিশ্বাস করেননি?'

'কারণটা তো একটু আগেই বললাম–ফসিলাইজড মাইক্রোঅর্গানিজমের এক্সট্রাটেরিসটেরিয়াল অরিজিন রয়েছে।' বিরতি দিলেন স্পার্ক, একটু কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলা। 'আমি আসলে ভুল লোকের কাছে ওই সম্ভাবনাগুলোর কথা বলতে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু আমার কাছে যুক্তিটি তো গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। বিশেষ করে যখন শুধু এ দুটো উল্কার মধ্যে মাইক্রোঅর্গানিজমের খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'তোমার সাপোর্টের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে কোন্ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমার তত্ত্ব যা কিনা আমাকে সমালোচিত করে তুলেছে। পয়েন্ট লেকের পানি হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পান করানো উচিত হচ্ছে না বলে সতর্ক করে দিয়েছিলাম আমি। পয়েন্ট লেক এবং লেক কুরোর মধ্যকার সম্পর্কও দেখিয়েছি আমার প্রকাশিত একটি নিবন্ধে। বলেছিলাম জায়গা আলাদা হলেও দু'স্থানেই একই রকমের মাইক্রোঅর্গানিজমের অস্তিত্ব রয়েছে। যদিও নিবন্ধে এ লেক দুটোর কথা আমি উল্লেখ করিনি। স্কুল লোকেশনের সমর্থকরা, বিশেষ করে যে ঠিকাদার স্কুল তৈরি করতে যাচ্ছিল সে আমার এসব তথ্য তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলে আমি নাকি হাতুড়ে বৈদ্য। মহাশূন্য থেকে সবুজ কীটপতঙ্গ আসবে–এরকম বলে তারা সবাই আমাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করতে থাকে। উল্কার কারণে যে হ্রদের সৃষ্টি এ বিষয়টিও তারা বিশ্বাস করতে চাইছিল না। বলছিল হাস্যকর তত্ত্ব।' একটু থেমে ঠোঁটে হাসি ফোটালেন অধ্যাপক। 'কিন্তু সেই একই ঠিকাদার যখন স্কুলের জন্য ভিত তৈরিতে মাটি খুঁড়ছিল, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি বন্ধ হয়ে যায় তার। লোহার

মত শক্ত মাটি খুঁড়তে গিয়ে নাকের জল চোখের জল এক হয়ে গিয়েছিল বেচারার। শুনেছি ওই প্রজেক্টে অনেক টাকা লোকসান গেছে তার।'

'এক মিনিটের জন্য একটু পেছনে ফিরতে চাই,' বলল পিংকি। 'আপনি বললেন মাইক্রোঅর্গানিজম মৃত ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা ওতে আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু আপনি উৎসাহ বোধ করেছিলেন। কেন?'

'আমার বিশ্বাস উল্কাপতনের ধকল সয়েও অনেক অর্গানিজম বেঁচে গিয়েছিল।

'কেন বিশ্বাস করেন কথাটা?'

'কারণ আমি দুটি লেকের ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করেছি। তবে এগুলোকে নিয়ে যেসব হরর গল্প তৈরি হয়েছে তা আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি না। তবে আমার কেন জানি মনে হয় লেকের পানিতে ভয়ঙ্কর কিছু একটা আছে। ম্যানটন এবং রোপানরা উভয় লেকের পানি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সাম্প্রতিক ইতিহাসও পয়েন্ট লেকের বিপজ্জনক দিকগুলোর কথা তুলে ধরে। উপনিবেশকারীরা এ লেকের পানি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিলিতে লেক কুরোর পানি পান করা সম্পূর্ণ মানা। ওটাকে অসুস্থতার ডিপো হিসেবে দেখানো হয়। কেউ ওই লেকের ধারেকাছেও বাস করে না। আর দুটি হ্রদের কোনটিতেই মাছের "ম"-ও নেই। তবে তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস কর এসব সমস্যার জন্য অর্গানিজম কিংবা ম্যাগনেটিজম দায়ী কিনা, আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। যদি প্রশ্ন কর অর্গানিজম পঞ্চম গ্রহ থেকে এসেছে কিনা, জবাবে বলব আমি জানি না। এগুলো সবই কৌতূহল উদ্দীপক তত্ত্ব। তবে একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানি: যেসব ছেলেমেয়ে পয়েন্ট লেকের পানি বেশি বেশি পান করেছে তারাই অসুস্থ হয়েছে।'

'বেশি বেশি পান করার কারণ কী?' জিজ্ঞেস করল পিংকি।

'গত গ্রীষ্মে ভয়ানক গরম পড়েছিল। ফুটবল টিম এবং চিয়ারলিডার স্কোয়াডের সদস্যদের প্রচণ্ড তাপের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। তাই প্রবল তৃষ্ণায় তারা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি পানি পান করেছে এবং অসুস্থ হয়েও পড়েছে।'

'ঠিক বলেছেন,' এ বিষয়টি আগে চিন্তা করেনি পিংকি। এখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যাচ্ছে। 'তাহলে এখানকার পানি দূষণের জন্য দুটি সম্ভাব্য কারণ দায়ী—ম্যাগনেটিজম এবং অর্গানিজম।'

'হুঁম,' বললেন প্রফেসর।

'দুটো কি একসঙ্গে কাজ করতে পারে?'

'তোমার প্রশ্নটি ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনি বললেন পয়েন্ট লেকের পানিতে শক্তিশালী চুম্বক রয়েছে যা উদ্ভিদ এবং মাছের জন্য ক্ষতিকর। এরকম কি হতে পারে যে এ পানিতে অর্গানিজম শক্তিশালী হয়ে ওঠে?'

'এরকম চিন্তা তো মাথায় আগে আসেনি! তবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।'

‘কেন?’

‘কারণ এরকম পানিতে জ্যান্ত জিনিস ধারেকাছেও ঘেঁষবে না।’

‘সে জ্যান্ত জিনিস তো আমাদের পৃথিবীর,’ মন্তব্য করল পিংকি।

অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসলেন স্পার্ক। ‘তোমার আইডিয়া দুটো একসঙ্গে মেলাতে আমি অনীহা প্রকাশ করছি।’

‘কেন? বিস্ফোরিত হওয়া একটি গ্রহ থেকে যদি এখানে অর্গানিজম এসে থাকে তাহলে পয়েন্ট লেকের পানি তো তাদের জন্য বাড়িঘরের মত। হয়তো পঞ্চম গ্রহের সারফেসের পুরোটাই ছিল চুম্বক দিয়ে তৈরি।’

পিংকির কল্পনাশক্তি দেখে তাজ্জব প্রফেসর স্পার্ক।

‘তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন স্বয়ং ওখানে উপস্থিত ছিলে।’ ঘড়ি দেখলেন তিনি। ‘তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলে ভাল হত, তবে আমার এক ছাত্র এক্ষুণি এসে পড়বে। তুমি বরং আমাকে পয়েন্ট হাইতে কী ঘটছে তার মাজেজা বলে যাও।’

চেয়ার ছাড়ল পিংকি। ভাবছে। জেনিকে ওর মনে হয়েছিল বদ্ধ উন্মাদ–এমনকী ওয়্যারহাউসের ফাটলে শুকনো রক্ত আবিষ্কার করার পরেও। জিম ওর রক্তের সঙ্গে পিংকির রক্ত মিশ্রিত করার পর থেকে রেড মিটের প্রতি লোভ বেড়ে গেছে পিংকির। রেড মিটে অন্য যে কোন খাবারের চেয়ে বেশি পরিমাণে আয়রন থাকে তা ও জানে। ওর শরীরটার কী দশা হতে চলেছে? ও কি ভিনগ্রহের ঘনীভূত প্রকাণ্ড এক মাইক্রোঅর্গানিজমে পরিণত হবে? অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সেরকমই কিছু ঘটতে চলেছে।

জেনির কথা আগে বিশ্বাস করেনি পিংকি। এখন তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করছে।

‘কতগুলো দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে,’ প্রফেসর স্পার্ককে বলল পিংকি। ‘তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমি নিজেই হয়তো একদিন দানবীতে রূপান্তরিত হব। কারণ আমার ভেতরে রাক্ষুসে এক খিদে জন্ম নিয়েছে। সারাক্ষণ শুধু খিদে লাগে। এ মুহূর্তে খিদেয় এমন জ্বলছে পেট, আপনাকে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। জানি আমার কথা পাগলের প্রলাপের মত শোনাচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন দুটো লেকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তখন লোকেও আপনাকে পাগল ঠাউরে হাসি-ঠাট্টা করেছে। কাআতু আর কালাইর-এর গল্প নিছক গপ্পো বলে উড়িয়ে দেবেন না। এর মধ্যে অনেক কিছুই রয়েছে যা সত্য।’

পিংকির কথা শুনে স্তম্ভিত স্পার্ক। ‘তুমি কি নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েছ?’

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হেসে উঠল পিংকি।

‘গতরাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি একজন জ্যোতির্বিদ, পঞ্চম গ্রহ ঘুরে এসে পৃথিবীতে ফিরে আমার বন্ধুদেরকে খেয়ে ফেলেছি। তারপর আমি বাদুড়ের মত বিরাট এক দানবে পরিণত হই এবং আমাকে লেসার গান হাতে একদল লোক তাড়া করে। মামুলী গল্প মনে হচ্ছে, তাই না! আমার নতুন বয়ফ্রেণ্ডটি পয়েন্ট হাই-এর ফুটবল দলে খেলে। কোয়ার্টার ব্যাক। সে ওই দূষিত পানি প্রচুর পান

করেছে। তার নাম জিম ক্লাইন। একে জেনি বার্টন হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে পারেনি। আমিও ওদেরকে সাহায্য করেছিলাম। জীবন বাঁচিয়েছি জিমের। কিন্তু এখন কী মনে হচ্ছে জানেন?' ও সামনে ঝুঁকল। 'মনে হচ্ছে হারামজাদাকে খুন হতে দেয়াই উচিত ছিল।'

'পিংকি–'

'সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, প্রফেসর।' বলল পিংকি। ঘুরে দাঁড়াল। 'আমি এখন যাব। খুব খিদে লেগেছে।'

প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ও। স্পার্ক ওকে বাধা না দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। তাঁর হঠাৎ মনে হয়েছে এ মেয়েকে যেতে বাধা না দেয়াই উচিত হবে।

তেরো

রেডিওতে খবরটা শুনল পিংকি। পাঁচ লাখ ডলারের বিনিময়ে জামিন পেয়েছে জেনি বার্টন। নগুয়েন ঠিকই বলেছিল, জেনির আইনজীবী অসাধ্য সাধন করতে পারে। পিংকি ম্যাকডোনাল্ড'স-এর দোকানে বসে ধুমসী সাইজের তিনটে ম্যাকডোনাল্ড বার্গার খেয়েও খিদে মেটেনি বলে আরেকটার অর্ডার দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় খবরটা শুনতে পেল ও। বছর চোদ্দর একটি ছেলে ওর টেবিলে বসে ছিল হাতে রেডিও নিয়ে। জেনির নামটি রেডিওতে ঘোষিত হতে শুনল পিংকি। তবে ছাড়া পাবার পরে জেনি কোথায় গেছে সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য করল না ঘোষক, শুধু জানাল মেয়েটি তার এলাকাতেই আছে।

জেনির খবরটা শোনার পরে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল পিংকি, চলে এল গাড়িতে। এক্সপ্রেসওয়ে অভিমুখে চলল। জেনি কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে ভাবছিল ও। কেম্পের বাইরে, জঙ্গলাকীর্ণ একটি এলাকায় জেনিদের একটি কেবিন আছে। জায়গাটা মিশিগান ইউনিভার্সিটি এবং পয়েন্ট শহরের মাঝখানে। ওখানে বার দুই গেছে পিংকি। ও ঠিক করল ওই কেবিনে গিয়ে জেনির সঙ্গে কাআতু, ধ্বংস হওয়া পঞ্চম গ্রহ এবং লেকের মাঝখানে সাঁতার কাটার সময় জিম যে ওকে আগ্রাসী চুম্বন করেছিল এ বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করবে। ও আর জেনি মিলে যৌথ শক্তি হবে। দু'জন মিলে একটা দল গঠন করবে। ওরা হয়তো রক্ষা করতে পারবে ধরিত্রী।

কিন্তু সবকিছু চুকেবুকে যাবার পরে জেনি হয়তো আমাকে হত্যা করবে। ভাবল পিংকি।

নুড়ি পাথরের লম্বা ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় জেনিদের পারিবারিক কেবিন। পিংকি গাড়ি থামাল। দেখল কেবিনের দরজা হাট করে খোলা। কেবিনটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে। কাছের পড়শীর বাড়ি আধ মাইল দূরে। ও গাড়ি থেকে নামার পরে মাছি এসে মাথার চারপাশে ভনভন করতে লাগল।

'হ্যালো?' হাঁক ছাড়ল পিংকি। 'জেনি?'

ইয়াল্লা!

কেবিনের দোরগোড়ায় কালো জুতো পরা একটা পা লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। পুরুষ মানুষের পা। এক কদম আগে বাড়ল পিংকি তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুঁচকে উঠল মুখ। মানুষটার অর্ধেকটা শরীর দেখতে পাচ্ছে ও। রক্তের পুকুরে ভাসছে। মারা গেছে লোকটা, গত হপ্তার পার্টির সেই দু'জনের মত। আরেক পা এগোল পিংকি। লোকটির বুকে গোল একটা গর্ত, খুব কাছ থেকে কেউ শটগান দিয়ে গুলি করেছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে, হাঁ করা মুখ। চোখ খোলা। মাছি ছেঁকে ধরেছে লাশ। একে চেনে পিংকি–অফিসার মার্টিন, জেনিকে পাকড়াও করেছিল। নগুয়েনের পুলিস বাহিনীর লোক।

পিংকি ধারণা করল জেনি লোকটাকে খুন করেছে যাতে দানবগুলোকে সে ধাওয়া করতে পারে। কিন্তু কেবিনের দিকে আরেকটু এগোতেই যা দেখল অমন ভয়াবহ দৃশ্য ও জীবনেও দেখেনি।

নীল জিন্স এবং রক্ত মাখা টি-শার্ট পরা জেনি গলায় রশি বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে। তার পায়ে বাদামি চামড়ার বুট; এক পাটি জুতো আলগাভাবে গোড়ালি থেকে ঝুলছে। খসে পড়বে যে কোন সময়। গলার রশিটা এমন শক্তভাবে আটকে আছে, মাংস কেটে ঢুকে গেছে ভেতরে। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। ভিজিয়ে দিয়েছে পরনের কাপড়। গল্পটা কীভাবে সাজানো হয়েছে বুঝতে পারল পিংকি। জেনি ওই পুলিস অফিসারকে গুলি করে হত্যা করেছে। তারপর বিবেকের দংশন সইতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়েছে।

শটগানটি জেনির পায়ের নিচে রাখা হয়েছে। পিংকি নিশ্চিত বন্দুকের ট্রিগারে জেনির আঙুলের ছাপও আছে।

গুঙিয়ে উঠল ও। 'না, জেনি।' চোখ বুজে কেঁদে ফেলল। 'না।'

গল্পটা ও বিশ্বাস করে না। লেকের পানি যারা অতিমাত্রায় পান করেছিল তাদের সম্পর্কে দু'একটি বিষয় ও জেনে গেছে। এদের অসীম খিদে। চোখ খুলল পিংকি। পুলিস অফিসারের বুকের হাঁ করা গর্তের তুলনায় তার শরীরের চারপাশে জমে থাকা রক্তের পরিমাণ খুব বেশি নয়। জেনির ঘাড় এবং গলা যেভাবে ফাঁক হয়ে আছে, রক্ত পড়ে টি-শার্ট ভেসে যাবার কথা। কিন্তু টি-শার্টেও রক্তের দাগ তেমন প্রকট নয়। এর একটাই কারণ হতে পারে–কাআতুরা তাদের নৃশংস কাজ সম্পন্ন করার ফাঁকে দু'এক চুমুক রক্ত পান করার লোভ সামলাতে পারেনি।

কাআতুদের রক্ত পান করার কথা জোর করে মন থেকে ঝেঁটিয়ে দিল পিংকি। প্রিয় বান্ধবীকে এভাবে কড়িকাঠে ঝুলে থাকতে দেয়া যায় না। রান্নাঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এল ও। রাখল জেনির পায়ের নিচে। গলার ফাঁস খুলে বান্ধবীকে নিচে নামিয়ে আনতে হলে আগে শরীরটাকে তুলে ধরতে হবে। কাজটা পারবে কিনা ভেবে সন্দেহ হলো পিংকির। হয় কারাগারে থেকে জেনির ওজন কমে গিয়েছিল নতুবা পল্লবী কেয়ার গায়ে ভর করেছে আসুরিক শক্তি। নইলে কী করে সে জেনির লাশ এক হাতে জড়িয়ে ধরে পুরো ওজনটা নিজের

ওপর নিয়ে অপর হাতে গলার ফাঁস অমন স্বচ্ছন্দে খুলে ফেলতে পারল? জেনিকে পাঁজাকোলা করে চেয়ার থেকে নেমে পড়ল পিংকি। বসল মেঝের কার্পেটে। সুন্দরী জেনি–পিংকি সবসময় তার প্রিয় বান্ধবীর ঝলমলে কালো চুল আর আয়ত সবুজ দু'চোখের দিকে ঈর্ষা নিয়ে তাকিয়েছে। পিংকি ওর মুখে নিজের মুখ চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর চোখের জলে ধুয়ে যেতে লাগল রক্তাক্ত মুখ।

তুমি সত্যি খুব সাহসী মেয়ে। একা ওদের পিছু নিয়েছিলে। কারও সাহায্য চাওনি। যখন তোমাকে থামিয়ে দেয়া হলো, তুমি কাউকে নালিশ করনি। তুমি সত্যি অসাধারণ ছিলে। পৃথিবীর মানুষ তোমার নিন্দে করবে জানি কিন্তু তুমি আমার চোখে সবসময় মহিয়সী একটি মেয়ে হিসেবে বেঁচে রইবে। আমি তোমার মত নই, তোমার মত কোনদিন হতেও পারব না। কিন্তু কসম খোদার, তোমার শুরু করা কাজটা আমি শেষ করবই। রক্তচোষা দানব দলের সব ক'টাকে কবরে না শুইয়ে দেয়া পর্যন্ত আমি থামব না।

'জেনি!' কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গেল পিংকির। ওর গা কাঁপছে। তবে শুধু শোক নয়, গা কাঁপার পেছনে অন্য একটি কারণও আছে। ওর ভয়ানক খিদে পেয়েছে। মৃত বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে আছে ও, ওর সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী, কিন্তু তারপরও মনের ভেতর উদগ্র একটা ইচ্ছে জাগছে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে, মুখ হাঁ করে এক কামড়ে...

'না, আমি মরে গেলেও তা করব না!' চিৎকার দিল পিংকি।

জেনিকে ও ছাড়ল না। ওর মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো এখনও পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি যে বান্ধবীকে এভাবে ফেলে রেখে কেবিন ছেড়ে পালিয়ে যাবে। চোখ বুজল পিংকি। আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল জেনির ঘাড়ের কাটা দাগ। তারপর রক্তমাখা আঙুল তুলে নিয়ে চেপে ধরল নিজের ঠোঁটে। ঝিন্‌ন্‌ করে উঠল সারা গা। গোটা শরীরে বয়ে গেল একটা শিহরণ। চরম আনন্দ লাভের মত সে রোমাঞ্চ। সুখময় একটা অনুভূতি নিয়ে ফোঁস করে শ্বাস ফেলল পিংকি। জেনির ক্ষতস্থান স্পর্শ করল আবার, হালকাভাবে, সম্মানের সঙ্গে। আবার আঙুল ছোঁয়াল ওষ্ঠে। রক্তের নোনতা স্বাদটা যেন অমৃত। ক্ষুধার্তের মত চুষতে লাগল। কামড়াচ্ছে আঙুলের ডগা। রক্তের শেষ বিন্দুটাও ওর চাই।

পিংকি আঙুল চুষতে চুষতে খেয়াল করেনি কখন নিজের হাত কামড়াতে শুরু করেছে।

'পিংকি।' ডাক দিল একটি কণ্ঠ।

চমকে গিয়ে চোখ মেলে চাইল পিংকি। ঘরে ঢুকেছে লেফটেনেন্ট নগুয়েন। আশ্চর্য তো, লোকটার গাড়ির আওয়াজ টের পায়নি পিংকি। ও হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দ্রুত মুছে নিল মুখের রক্ত।

কিছু মনে করবেন না, আমি আমার বান্ধবীর রক্ত পান করছিলাম।

'হ্যালো,' বলল পিংকি।

রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যে একবার নজর বুলিয়ে জোর করে চোখ বুজল নগুয়েন। যখন চোখ খুলল, মুখখানা খড়ি মাটির মত সাদা হয়ে গেছে। পিংকির

পাশে এসে দাঁড়াল সে। ওর দিকে তাকাল।
‘এখানে কী ঘটেছে?’ জিজ্ঞেস করল সে।
‘জিম ক্লাইন এসেছিল এখানে,’ জবাব দিল পিংকি।
‘তুমি ওকে দেখেছ?’
‘না।’
‘তাহলে কী করে জানলে ও এখানে এসেছিল?’
‘এটা একটা লম্বা কাহিনী,’ জেনিকে কোল থেকে নামিয়ে মেঝেয় শুইয়ে দিল পিংকি। ইচ্ছে করছিল বান্ধবীকে বিদায় চুম্বন করে কিন্তু ঘরে লোক থাকায় সম্ভব হলো না। নগুয়েন ওকে সিধে হতে সাহায্য করল। ‘আপনি কি আমার পিছু নিয়েছিলেন?’ জানতে চাইল ও।
‘হ্যাঁ। তুমি টের পেয়েছিলে?’
‘না।’
‘কী হয়েছে বলো আমায়,’ পুনরাবৃত্তি করল নগুয়েন।
পিংকি পুলিস কর্মকর্তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাল। হঠাৎ মনে হলো ওর শিরদাঁড়া বেয়ে শক্তির একটা ঝর্ণা ধারা সোজা ওর মাথায় প্রবেশ করেছে। নিজেকে থাবাযুক্ত একটা চৌম্বক ক্ষেত্র মনে হচ্ছে পিংকির। তবে আশ্চর্যের বিষয়, এই যে ঘটনাটা ঘটল তাতে ওর মোটেই অবাক লাগছে না। যেন ওটা একটা সাইকিক মাসল্, উন্মাদনা শুরু হবার বহু আগে থেকেই ওর সঙ্গে ছিল এবং এ শক্তিকে ও আগে কখনও ব্যবহার করেনি। শক্তিটি ওকে নতুন উপলব্ধি ক্ষমতা এনে দিয়েছে; মনে হচ্ছে সে যেন নগুয়েনের মন নামের বস্তুটি নিজের হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। সে নগুয়েনের চিন্তা-ভাবনাগুলো পড়তে পারছে না বটে তবে ওগুলোকে স্পর্শ করতে পারছে, যেন ওগুলো পদার্থ দিয়ে তৈরি। তার মনে হচ্ছে সে শুধু নগুয়েনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই তাকে দিয়ে যে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারবে।
‘আমি বলতে পারব না,’ নিরস গলায় বলল পিংকি।
চোখ পিটপিট করল নগুয়েন। ‘তোমার হয়েছেটা কী, পিংকি?’
আবার হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছল পিংকি। মুখে এক ফোঁটা রক্ত লেগে ছিল। ‘আমি খারাপ মেয়ে হয়ে গেছি। আমার ধারণা আমি গতরাতে আমার কুমারীত্ব খুইয়েছি। কিছু একটা যে খুইয়েছি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।’ ওর চাউনি যেন নগুয়েনের চোখের মণি ভেদ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে গেল। লোকটার হতভম্ব ভাব, ওকে নিয়ে ভয়, সবকিছুই পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছে পিংকি–নগুয়েন ভীতচকিত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল এক কদম।
‘আমাকে যেতে দিন, নগুয়েন,’ মৃদু গলায় বলল ও। ‘আর আমার পিছু নেয়া বন্ধ করুন। আমার যা করণীয় করতে দিন। যা ঘটছে তা জানার চেষ্টা করলে মারা পড়বেন।’
দরদর করে ঘামছে নগুয়েন। মুখ দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠার শব্দ করল। ‘তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।’
শেষবারের মত কটমটে চোখে পুলিস অফিসারকে দেখল পিংকি। ‘নিজের

ভাল চাইলে আর কিছু বুঝবার চেষ্টা করবেন না।'

কেবিন ত্যাগ করল পিংকি। তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না নগুয়েন।

বাড়ি এসে প্লাস্টিককে দোরগোড়ায় বসে থাকতে দেখল পিংকি। দরজা বন্ধ না করেই চলে এল বাথরুমে। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে যেন চিনতে পারল না। ওর হরিণী কালো চোখে কেমন বুনো দৃষ্টি। জেনির রক্ত লেগে রয়েছে সারা মুখে, নাকে, চুলে।

'খোদা!' গুঙিয়ে উঠল পিংকি। সরে এল আয়নার সামনে থেকে। ছেড়ে দিল শাওয়ার। গরম পানি পুড়িয়ে দেয় গা। কিন্তু গ্রাহ্য করল না পিংকি। বারবার পানির ঝাপটা দিতে লাগল মুখে, সেই সঙ্গে কাঁদতে থাকল। জেনির রক্ত চুষতে গিয়ে কামড়ে নিজের আঙুলের মাংস তুলে ফেলেছিল পিংকি। কাটা জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে। ব্যথা পাবে জেনেও আঙুলগুলো মুঠো করল ও, ঘুসি মারল বাথরুমের দেয়ালে। কট্ করে শব্দ হলো। ও ওদের মত হতে চায় না। কিছুতেই না। ও ওদেরকে হত্যা করবে! প্রথম সুযোগেই খুন করবে!

'অ্যাই, চলে যা!' চাপা আর্তনাদ করল পিংকি। প্লাস্টিক ঢুকে পড়েছে বাথরুমে, পিংকির আঙুল চাটবার চেষ্টা করছে। কুকুরটাকে এর আগে কখনও এমন বন্ধুসুলভ আচরণ করতে দেখেনি পিংকি। জানোয়ারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ওর আজ মন খারাপ। পিংকি নিচু হলো কুকুরটার মাথায় আদর এবং পিঠ চুলকে দেয়ার জন্য। প্লাস্টিক চুলকানি খেতে খুব ভালবাসে। কুকুরটার জিভ থেকে গরুর মাংসের রক্তের গন্ধ আসছে। পিংকি আসার আগে নিশ্চয়ই গরুর হাড়-টাড় চিবিয়েছে। পিংকি মনে মনে বলল, প্লাস্টিক কেন গরুর মাংস খেতে গেল, শুকনো ডগফুড খেলে পারত না?' রক্তের গন্ধটা পিংকিকে কেমন অস্থির করে তুলছে—ও সহ্য করতে পারছে না।

'আমি দুঃখিত,' চিৎকার করে উঠল পিংকি।

ও খপ করে শক্ত হাতে চেপে ধরল কুকুরটাকে। এটাকে আদর ভেবে শরীর দোলাতে লাগল প্লাস্টিক, কুঁইকুঁই ডাকছে। পিংকির হাতের নখ বসে গেল জানোয়ারটার ঘাড়ে। ব্যথা পেয়ে আর্তচিৎকার দিল কুকুর, ওর ভয়ার্ত আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তুলল বাথরুমের দেয়ালে। পিংকি মুখ নামিয়ে আনল প্লাস্টিকের ওপর। এক কামড়ে ছিঁড়ে নেবে গলার নলি...

'পিংকি,' ডাকল একটা কণ্ঠ।

কুকুরটাকে ছেড়ে দিল পিংকি। তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটে পালাল প্লাস্টিক। বেদম হাঁপাচ্ছে পিংকি। মুখ তুলে চাইল। যদিও দরকার ছিল না; কণ্ঠস্বরটা ও চিনতে পেরেছে।

'হ্যালো, জিম,' সাড়া দিল পিংকি।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল জিম ক্লাইন। স্বাস্থ্যবান, তরতাজা এক তরুণ। হয়তো সহস্র বছর সে বেঁচে থাকবে; জানে না পিংকি। ততদিনে হয়তো জিমের পিঠে চামড়ার পাখা গজাবে, হাতের রূপান্তর ঘটবে বেগুনি থাবায়। ওর নখগুলো ইতিমধ্যে আলকাতরা কালো হয়ে গেছে। হাতে দাদু প্রীতম চৌধুরীর চিঠি।

গতকাল সকালে দাদু চিঠিটি লিখে রেখে গেছেন। জিম চিরকুটটি পিংকির হাতে দিল। পিংকি দেখল চিঠিটি টাইপ করা। অবাক লাগল ওর। কারণ দাদু চিঠি হাতে লেখেন, কখনও টাইপ করেন না।

পিংকির চোখে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি দেখে ব্যাখ্যা করল জিম, 'চিঠিটি আমি লিখেছি। তোমার দাদুর নামে।'

দাদুর ঘরের বন্ধ দরজায় চোখ চলে গেল পিংকির। উনি বাইরে গেলে দরজা সবসময় খোলা রেখে যান। মস্করা করে বলেন এ বয়সে তাঁর নাকি লুকোবার কিছু নেই। পিংকির সঙ্গে প্রথম ডেটিং করার পরপরই হয়তো জিম ওর দাদুকে মেরে খেয়ে ফেলেছে।

'বুঝতে পেরেছি আমি,' ফিসফিস করল পিংকি। ওর নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল, কামড় দিয়ে বের করে ফেলল রক্ত। তারপর চুষে খেয়ে ফেলল নিজের রক্ত। জিম ওর কাঁধে হাত রাখল। স্পর্শে কোন উষ্ণতা নেই। এর চেয়ে মস্ত একটা কাঁকড়াও যদি পিংকির গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যেত, এমন ঘিনঘিন করত না শরীর।

'জেনি মারা গেছে,' বলল জিম।

'হুঁ।'

'তুমি এখন আমাদের একজন।'

'জানি।'

'আমরা দলে অনেক ভারী।'

মুখ তুলল পিংকি। 'আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।'

'যখন খুশি।'

'আজ রাতেই পরিচিত হতে চাই,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল পিংকি। 'আমি সবার জন্য এখানে একটি পার্টি দেব।'

চোদ্দ

বাড়িতে, দাদু প্রীতম চৌধুরীর বিছানায় বসে আছে পিংকি। বিকেল তিনটা বাজে। কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে জিম। রাত আটটায় পার্টির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তার আগে পার্টির অতিথিদের জন্য কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে পিংকিকে এবং সে তার ব্যবস্থা করছে। দাদুকে হত্যা করে ঘর পরিষ্কার না করেই চলে গিয়েছিল জিম। বুড়ো মানুষটার ছিন্নভিন্ন শরীরের অবশিষ্টাংশ দেখার দৃশ্যটা পিংকির জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। লাশ পচার গন্ধ কেন পায়নি ভেবে অবাক হয়েছে সে। পরে দেখেছে যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায় সেজন্য দরজার ফাঁক-ফোকরগুলোতে কাপড় গুঁজে দিয়েছে জিম। গতকাল সকালে জর্জ দাদুর ঘরে উঁকি দিলে কী দেখতে পেত ভেবে শিউরে উঠল পিংকি। মিষ্টি জর্জ—ওর সঙ্গে কি আর কোনদিন পিংকির দেখা হবে?

ওর গাল বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরল, তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল জল। দাদুর সঙ্গে ওর দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হয়েছে, কিন্তু বুড়ো মানুষটাকে পিংকি খুব ভালবাসত। বাড়িতে যখন মা-বাবার ঝগড়া চরমে, এই দাদুই ওকে তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল পিংকি। বাবা-মা'র সম্পর্ক এমন তিক্ততায় পৌঁছে গিয়েছিল, বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করত না ওর। প্রীতম চৌধুরী ব্যাপারটা জানার পরে একমাত্র নাতনিকে নিজের কাছে রেখে পড়াশোনা করানোর প্রস্তাব দিলে পিংকির বাবা-মা কেউই তেমন আপত্তি করেননি। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের দাম্পত্য-সংকট একমাত্র মেয়েটিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে। পিংকিও খুশি মনে প্রীতম চৌধুরীর সঙ্গে চলে এসেছিল অখ্যাত এ মফস্বল শহরে। আর বিপত্নীক চৌধুরী সাহেবও পিংকিকে কাছে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। তিনি দারুণ ভালবাসতেন একমাত্র নাতনিকে। পিংকির স্বাধীনতায় কখনওই হস্তক্ষেপ করেননি।

কিন্তু দানবদের কাছে ভালবাসার দাম কী? প্রেম-ভালবাসা তাদের খিদে মেটাতে পারে না, এসব সুকুমার বৃত্তি তাদের কাছে অর্থহীন। এদের অস্তিত্ব পিংকির কাছে মনে হয় একমাত্রিক। আর এরা যে ঘটে খুব বুদ্ধি রাখে তা-ও না। পিংকি তো খুব সহজেই জিমকে বোকা বানাতে পেরেছে। সে নিজেদের কুকুরটাকে মেরে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল বলে জিম ভেবেছে পিংকি ওদের লোক বনে গেছে। সে এখন পিংকিকে বিশ্বাসও করে। আর বিশ্বাসের এ জায়গা থেকেই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। ওদের সবাইকে এবারে একসঙ্গে পাবে পিংকি। জেনি এরকম সুযোগ কোনদিন পায়নি। জেনি হয়তো ধারণাও করতে পারেনি এদের সংখ্যাটা এত বেশি।

পিংকি ঠিক করেছে সবক'টা দানবকে যখন ঘরের মধ্যে পাবে, বাড়িটি উড়িয়ে দেবে সে। ডিনামাইট নেই বলে গ্যাসোলিন দিয়ে সারতে হবে কাজ। প্রোপেন ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না পিংকি। শক্তিতে কুলোবে না। জিমের গাড়ি বাড়ি খেয়েছিল ট্যাংকের গায়ে। কিন্তু তাতে ওটার কোন ক্ষতি হয়নি। তবে পাঁচ গ্যালন বোতলের গ্যাস দিয়ে ট্যাংক উড়িয়ে দেয়ার একটা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। নিশ্চয়ই ওতে বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু ট্যাংকটি বাড়ির বাইরে। আর আজ পূর্ণিমা। কাজেই ট্যাংক উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ওরা নিশ্চয়ই দেখে ফেলবে। বোমা পুঁতে রাখার একমাত্র উপযুক্ত জায়গা হলো বেসমেন্ট। এটি বাড়ির বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। পার্টির সময় কেউ ওদিকে যাবে না।

প্রতি গ্যালন গ্যাসোলিন থেকে কতটুকু ফায়ার পাওয়ার পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে কোন ধারণা নেই পিংকির। তবে অনুমান করল ডজনখানেক পাঁচ গ্যালনের পানির বোতল জোগাড় করে তাতে কানায় কানায় গ্যাস ভরা গেলে বাড়ির সবাইকে ও দিয়ে হত্যা করা সম্ভব। আর একই সময়ে প্রোপেন ট্যাংক বিস্ফোরণ হলে তো সোনায় সোহাগা।

তবে অন্যদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার কোন খায়েশ নেই পল্লবী কেয়ার। জিম ইতিমধ্যে তার নিজের রক্ত দিয়ে দূষিত করে ফেলেছে পিংকির লোহু।

জিমের রক্ত শরীরে ঢুকেছে বলেই এমন পিশাচী স্বভাব হয়ে যাচ্ছে পিংকির। রক্তটাই এজন্য একশোভাগ দায়ী। কারণ পিংকি তো আর অন্যদের মত লেকের পানি পান করেনি। তবে ওর পরিণতি হয়তো শেষতক অন্যদের মতই হবে। কিন্তু ও নিজেকে একটা সুযোগ দিতে চায়। শরীরে খিদে চাগিয়ে উঠলেও ও ইচ্ছেটা দমন করার চেষ্টা করবে। আর বোমার সলতেতে আগুন ধরিয়ে নিজেও পুড়ে মরার কথা ভাবতে চাইছে না পিংকি।

ওর একটা ফিউজ বা সলতে দরকার। অন্তত দু'মিনিট ধরে জ্বলে এমন কোন সলতে।

কিন্তু অব্যবহৃত কোন সলতে পেল না পিংকি। নিজেরই একটা বানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু কী দিয়ে বানাবে? লম্বা রশি গ্যাসোলিনে চুবিয়ে নিলে চলবে না। সাঁ সাঁ করে রশিতে আগুন ধরে যাবে এবং পিংকি নিরাপদ স্থানে যাবার আগেই বিস্ফোরিত হবে বোমা। তাছাড়া গ্যাসোলিনের গন্ধও তো ছড়াবে। পিংকির ধারণা, মানুষ থেকে দানবে পরিণত হয়ে ওরা দৈহিকভাবে শুধু আসুরিক শক্তির অধিকারীই হয়নি, সাধারণের চেয়ে ওদের ঘ্রাণশক্তিও নিশ্চয়ই বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। বোতলের ছিপি আটকে বাড়ি আনার আগে সবগুলো বোতলের গায়ে লেগে থাকা গ্যাসোলিন অত্যন্ত সাবধানে মুছে ফেলতে হবে ওকে।

ফিউজ তৈরিতে বারুদের দরকার হবে। তবে বারুদেরও রয়েছে তীব্র গন্ধ। অবশ্য বারুদ পোড়ার পরেই গন্ধ ছড়ায়। কার্তুজের মধ্যে রয়েছে বারুদ, শটগানের কার্তুজে এ জিনিস অনেক বেশি পরিমাণে মিলবে। শটগানের কার্তুজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ জোগাড় করা গেলে পিংকি বেসমেন্টের মেঝেতে ওগুলো লম্বা একটা সারি করে ঢেলে রাখবে। তারপর গ্যাসোলিনের ঠিক মাঝখানের বোতলে একটা রশি বাঁধবে এবং বোতলের মাথায় বারুদ ভর্তি একটি কাগজের কাপ রেখে দেবে ও। রশিতে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পরে ওটা পুড়তে পুড়তে কাগজের কাপ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারপর ভিড়িম—মি. এবং মিসেস দানবদের চিহ্নমাত্রও রইবে না।

বেডরুমে রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ এক টুকরো হাসি ফুটল পিংকির মুখে।

প্ল্যানটা করতে পেরে খুশি লাগছে ওর।

আরও ভাল লাগবে ওদেরকে মরতে দেখলে।

পিংকি পার্স নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলো। ইচ্ছে করেই দাদুর বেডরুম পরিষ্কার করেনি—পিশাচদের পার্টিতে রক্তাক্ত শোবার ঘর বাড়তি সৌন্দর্য যোগ করবে। ওদেরকে কী পরিবেশন করবে ভেবে একটু চিন্তায় পড়ল। পরক্ষণে বিষয়টির অযৌক্তিক দিকটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে হেসে উঠল। একদল নররাক্ষস, যাদের খাদ্য শুধুমাত্র একটি জিনিস, তাদেরকে অন্য কিছু পরিবেশন করার চিন্তাটাই হাস্যকর। তাছাড়া পিংকি তো আর তার নিজের কোন বন্ধু-বান্ধবকে পার্টিতে দাওয়াত দিচ্ছে না।

জিনিসপত্র কেনাকাটা করার আগে পেটে কিছু দেয়া দরকার। পিংকি চার

পাউণ্ড ওজনের একটা স্টেক কিনল, মার্কেটের পার্কিং লটে, গাড়িতে বসেই খাবারের অর্ধেক সাবাড় করল। মাথার দপদপে ব্যথা কমল বটে তবে ওকে পুরোপুরি ছেড়ে চলে গেল না। বিষয়টি উদ্বিগ্ন করে তুলল পিংকিকে। বোমা বিস্ফোরণের কবল থেকে যদি রক্ষাও পায়, এ জিনিসের হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে সে?

'যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে,' ফিসফিস করে কথাটা বলে ব্যাগে হাত মুছে ফেলল ও। এ ব্যাগে আরও দুটো স্টেক রেখেছে পিংকি। এক বোতল Tylenol-ও কিনল; গাড়ি ছাড়বার আগে চারটে বড়ি শুকনো মুখে গিলে ফেলল। তবে এতে কাজ হবে কিনা ভেবে সন্দেহ হচ্ছিল ওর। সত্যি কাজ হলো না।

পয়েন্ট হাইস্কুলে পিংকি গেল পাঁচ গ্যালনের পানির বোতল জোগাড় করতে। ছেলেদের গোসলখানার পেছনে ওগুলো ডাঁই করে রাখতে দেখেছে ও অনেকগুলো।

কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে পিংকি সাকুল্যে আটটা খালি বোতল পেল। চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিন ভরা যাবে। পরিমাণটা মন্দ নয়। কিন্তু এতে কি কাজ হবে কে জানে? অন্তত ষাট গ্যালন গ্যাসোলিন লাগবে বলে ওর ধারণা। প্রায় চারটে বাজে–ঘুরে বেড়ানোর সময় নেই। শটগানের কার্তুজ জোগাড় করতে হবে, বেলা পাঁচটার মধ্যে বালটনের বন্দুকের দোকানে ঢুঁ মারতে হবে। তারপরেও বেশ কিছু জিনিস জোগাড় করা বাকি রয়ে যাবে।

চারটা কুড়িতে মল-এ পৌঁছুল পিংকি। বন্দুকের দোকানের কাউন্টারের পেছনে সারি সারি কার্তুজ সাজানো। বন্দুকের গুলি কেনার জন্য বাজে একটা সময় নির্বাচন করেছে ও। মাত্র হপ্তাখানেক আগে ওর বয়সী একটি মেয়ে দুটো ছেলেকে শটগান দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেছে। দোকানদারের চেহারা এমন যেন সদ্য সেনাবাহিনী থেকে এসেছে। মাথায় সোনালি কদমছাঁট চুল, চৌকো কাঁধ, শিরদাঁড়া টানটান। পিংকির কেন কুড়ি বাক্স কার্তুজ দরকার জানতে চাইল সে।

'আমার দাদুর দরকার,' জবাব দিল পিংকি।

'উনি কি তোমার সঙ্গে এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'না।'

'উনি গুলি দিয়ে কী করবেন?'

'টার্গেট-প্র্যাকটিস। গুলি বিক্রি করতে কোন সমস্যা আছে? আমার বয়স আঠারো। আমার জাতীয় পরিচয়পত্র আছে।'

'দেখি,' বলল লোকটা। পিংকি ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাল। দোকানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল লাইসেন্স–মনে হলো ওর নামটা মুখস্থ করছে। 'তুমি শিকাগো থেকে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'গত জুনে এখানে এসেছি,' জবাব দিল পিংকি।

কপালে ভাঁজ পড়ল লোকটার। কী যেন মনে পড়ে গেছে। 'আচ্ছা, তোমার দাদুর নাম কি প্রীতম চৌধুরী?'

হাসল পিংকি, জোর করেই হাসিটি ফোটাতে হলো মুখে।

'জী, আপনি আমার দাদুকে চেনেন?'

লোকটা নিজের হাঁটুতে চাপড় বসাল। 'চিনি না মানে? তোমার দাদু তো খুব ভাল দাবা খেলেন। আমাকে বেশ কয়েকবার দাবায় হারিয়ে দিয়েছেন।'

ঠোঁটে হাসিটি ধরে রাখল পিংকি। কিছু বলল না। লোকটা বকবক করে যেতে লাগল, 'কিন্তু উনি শটগান দিয়ে প্র্যাকটিস করেন জানতাম না তো!'

'হ্যাঁ, দাদুর কিছুদিন হলো শিকারের বাই চেপেছে। তাই প্র্যাকটিস করছেন,' অম্লান বদনে মিথ্যা বলল পিংকি।

'এখানে কিছু হরিণ, খরগোশ আর কাঠবেড়ালী ছাড়া শিকার করার মত জানোয়ার কই?' লোকটা গুলির বাক্সগুলো কাউন্টারের সামনে টেনে নিয়ে এল। মোট কুড়ি বাক্স গুলি। পিংকি সম্পর্কে তার যে সন্দেহ ছিল, চৌধুরী সাহেব ওর দাদু শুনে তা দূর হয়ে গেছে। 'তোমার দাদুকে আমার সালাম দিয়ো। আমার নাম স্যাম। বোলো তার সঙ্গে আরেকবার দাবা খেলার জন্য মুখিয়ে আছি আমি, এবারে নিশ্চয়ই তাঁকে আমি হারিয়ে দেব।'

ডান দিকে ঘাড় কাত করল পিংকি, 'আচ্ছা, বলব।'

স্যামের দোকান থেকে পিংকি একশো ফুট লম্বা রশি, এক বোতল সুপার গ্লু এবং তীক্ষ্ণধার একটি হান্টিং নাইফ কিনল। কার্তুজ খোলার মত তেমন কিছু নেই বাড়িতে, রান্নাঘরের সবগুলো ছুরিই ভোঁতা। তাছাড়া শিকারের ছুরিটা প্রয়োজনে অন্য কাজেও লাগতে পারে।

বালটন শহরে গাড়ি নিয়ে আধঘণ্টা ঘুরে বেড়াল পিংকি কিন্তু প্যাঁচ গ্যালনের আর কোন পানির বোতল পেল না। সুপারমার্কেট থেকে আড়াই গ্যালনের আটটি গ্যালন কিনল ও, সেই সঙ্গে প্লাস্টিকের একটি ফানেল বা চোঙা। গ্যাসোলিন জোগাড় করার বুদ্ধিটা পেয়ে গেছে ও।

পয়েন্ট শহরে তিনটে গ্যাস স্টেশন। পিংকির ক্যামরি গাড়ির ট্যাংকে পনেরো গ্যালন গ্যাসোলিন ধরে। ও ট্যাংক বোঝাই করে বাড়ি ফিরবে তারপর ফানেলের সাহায্যে সরাসরি বোতলে ঢালবে গ্যাসোলিন। শুধু গ্যাস স্টেশনে ফেরার মত তেল রাখবে গাড়িতে। ষাট গ্যালন গ্যাসোলিন মানে চারবার ট্যাংক বোঝাই করতে হবে ওকে। তাহলেই কাজ শেষ।

প্রতিশোধের বাসনা ওকে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করল কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ মড়ার মত ক্লান্ত হয়ে পড়ল পিংকি। অনেক চড়া বাজি ধরেছে ও–কতটা উঁচু বাজি সে ব্যাপারে ওর কোন ধারণা নেই। একটা সম্প্রদায়ের মৃত্যু? মানবজাতির অবসান? খোদা। কত কী ঘটে যেতে পারে। পয়েন্টে ফেরার সময় পিংকি ভাবছিল যদি ওদের কেউ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, সলতের কথা বিস্মৃত হবে ও, সোজা গ্যাসোলিনে আগুন ধরিয়ে দেবে লাইটার দিয়ে এবং এতে সবার আগে ওকে যদি মরতে হয় তো মরবে। আশা করছে জর্জ ওকে মাফ করে দেবে। পিংকি জানে ছেলেটা ওকে সাংঘাতিক মিস করবে। কাজ করতে করতে জর্জের কথা মনে পড়ল ওর, মনে পড়ল জেনির কথাও। দু'জনেই খুব

ভাল—এরকম বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। সাহায্যের জন্য জর্জের কাছে একবার যাবে ভেবেছিল পিংকি। পরক্ষণে চোখ রাঙিয়েছে নিজেকে, ও না প্রতিজ্ঞা করেছে এসবের মধ্যে জর্জকে জড়াবে না! পিংকির কথা ও বিশ্বাস তো করবেই না, শেষে বেঘোরে নিজের জানটাই খোয়াবে।

বাড়ির সবচেয়ে কাছের গ্যাস স্টেশন থেকে গ্যাসোলিন নিয়েছে পিংকি। বাড়ি ফিরে গাড়িটা কতগুলো পাথরের ওপরে দাঁড় করাল। এগুলো জ্যাকের কাজ দেবে। গ্যাস ট্যাংকটার তলা উন্মোচিত হলো। ও পাঁচ গ্যালনের খালি একটা বোতল এনে ট্যাংকের তলার ক্যাপের ঠিক নিচে বসিয়ে দিল। কাজ শুরু করার আগেই চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল পিংকির। একটা সমস্যা আছে। একবার ক্যাপ খোলার পরে, প্রথম বোতলটা ভরে গেলে দ্বিতীয় বোতলটা যখন ভরতে যাবে ওই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে গ্যাসোলিনের প্রবাহ কী করে বন্ধ করবে ও? অনেকক্ষণ ভেবেও এ সমস্যার জুৎসই কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারল না ও। বাড়ির ধারে গ্যাসোলিন পড়ে থাকার বিষয়টি রীতিমত দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল পিংকিকে।

শেষতক ও যা করল তা হলো খুব ধীরে ধীরে খুলল ক্যাপ। ছিপির প্যাঁচ যখন প্রায় খোলা শেষ, ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল গ্যাসোলিন। আরেকটা প্যাঁচ খুলে দিল পিংকি। এবারে আরও সাবধানে কাজ করতে হবে, নিজেকে সতর্ক করল ও। চোঙায় গ্যাসোলিন পড়ে সেখান থেকে ভরতে শুরু করল বোতল। পাঁচটি বোতল ভরে নিতে ওর মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। একটি বোতল ভরে গেলে ট্যাংকের ছিপি আবার আটকে নিল পিংকি, সামান্য কয়েক ফোঁটা তেল মাটিতে পড়তে দিল। এই অতি সামান্য তেলের গন্ধ শুঁকতে হলে দানবদের নেকড়ের মত ঘ্রাণেন্দ্রিয়র প্রয়োজন হবে।

তিনটে বোতল কানায় কানায় ভরে নিল পিংকি। পরের গ্যাস স্টেশনে যাবার মত সামান্য গ্যাসোলিন রাখল ট্যাংকে। গাড়িতে উঠে বসল ও। চলল পরের স্টেশন অভিমুখে। একটা চোখ থাকল রিয়ার ভিউ মিররে, নগুয়েন ওর পিছু নিয়েছে কিনা দেখতে। অবশ্য লোকটা আর ওকে অনুসরণ করবে কিনা সন্দেহ। জেনির কেবিনের দৃশ্যটা নিশ্চয়ই তাকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে—সাধারণ যে কেউ অমন রোমহর্ষক দৃশ্য দেখলে উন্মাদ হয়ে যেত। তাছাড়া কেবিন থেকে আসার আগে পিংকির মনে হচ্ছিল সে নগুয়েনের মস্তিষ্কে একটা গড়বড় বাধিয়ে দিয়েছে। জিমও নিশ্চয়ই শুরু থেকেই পিংকির ওপরে একই শক্তি প্রয়োগ করে আসছিল। হারামজাদাটা ওর জীবন তো ধ্বংস করেছেই পিংকি যাদেরকে ভালবাসত তাদেরকেও সে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। জিমের কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল পিংকি। জিম কি ওর কুমারীত্ব হরণ করেছে? গতরাতে লেকের মধ্যে কি ওরা দু'জনে প্রেম করেছিল? নাকি ঘুমের মধ্যে ওরকম কিছু করে বসেছে পিংকি? ও কি নয়মাস পরে দুই থাবাঅলা দানব-শিশুর জন্ম দেবে?

পিংকি পাঁচ গ্যালনের আটটি বোতলে গ্যাসোলিন ভরেছে। এবারে আড়াই গ্যালনের বোতলের পানি লেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগুলোতে তেল ভরতে

লাগল। তবে গ্যালনগুলোর মুখ ছোট বলে তেল ভরতে একটু সমস্যা হলো।

একটি বোতলে পুরোপুরি গ্যাসোলিন ভরল না পিংকি। অর্ধেকটা ভরা থাকল। গ্যাসোলিন কীভাবে বিস্ফোরিত হয় সে সম্পর্কে অল্পস্বল্প জানে ও। আগুনের শিখাই মূলত অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। গ্যাসোলিন ভর্তি কোন গ্যালনে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠি সরাসরি ফেললে ওটা নিভেও যেতে পারে। আধ-ভর্তি বোতলটা হবে ওর ডিটোনেটর। পিংকি রশি দিয়ে সবগুলো বোতল শক্ত করে বেঁধে নেবে, বারুদ মাটিতে ছিটাতে ছিটাতে গ্যালনের মাথার ওপরে এসে থামবে। সলতের আগুন যখন এখানে এসে পৌঁছাবে–তারপরই বুম বুম! একসঙ্গে সবগুলো বোতল বিস্ফোরিত হবে।

শেষ গ্যাস স্টেশনে তেল নিতে এসে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো পিংকিকে। ঘণ্টা দেড়েক আগে এখান থেকেই ও প্রথম গ্যাসোলিন নিয়ে গেছে। দোকানী জানতে চাইল এত তাড়াতাড়ি ট্যাংকের তেল ফুরোল কী করে।

'আমার গাড়ি বড্ড তেল খায়,' বলে কাটিয়ে দিল পিংকি।

তেল ভরা বোতলগুলো বেসমেন্টে নিয়ে গিয়ে এক কোণে সাজিয়ে রাখতে কোন সমস্যা হলো না পিংকির। ওর গায়ে এখন অনেক শক্তি। তবে ছোট বোতলগুলো বড়গুলোর সঙ্গে ফিট হলো না। ওগুলো একপাশে সরিয়ে রাখল পিংকি। তারপর শটগানের কার্তুজ নিয়ে বসল। ছোট বোতল দিয়ে কী করবে পরে ভাবা যাবে'খন।

কার্তুজ কেটে গান পাউডার বের করতে লাগল পিংকি। কাজ করতে করতে মনে মনে বলল, ওরা সবাই জাহান্নামে যাক। আমি দাদুকে গাছের নিচে কবর দেব। দাদুর বিছানার চাদর-টাদর ধুয়ে ফেলব। রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করব ঘর। ওরা একটা পরিষ্কার বাড়িতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না।

'ওরা এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না,' কঠোর শপথ নিল পিংকি। ওর সলতে তৈরিও শেষ। ছোট একটা বোতল হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল এটাকে কোথায় রাখা যায়।

পনেরো

শূন্য ওয়্যারহাউসে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেফটেনেন্ট নগুয়েন, স্থির চাউনি কংক্রিট মেঝের ধুলোমুক্ত বৃত্তে। তবে সে একা নয়। তার পাশে দাঁড়িয়ে অফিসার উইলিয়ামস ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলেছে মেঝেতে। উইলিয়ামস নতুন ঢুকেছে পুলিস বিভাগে। সবাইকে অনুরোধ করেছে তাকে যেন তার ডাক নাম 'কেনি'

বলে ডাকা হয়। সে মার্টিনের মত চালাক-চতুর নয়। অবশ্য মার্টিনের মত দুর্দান্ত প্রকৃতির পুলিস কর্মকর্তা বিভাগে খুব কমই রয়েছে। কিন্তু অমন সাহসী এবং দুর্দান্ত প্রকৃতির হয়েও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারল না মার্টিন।

নগুয়েন নিজেও জানে না আবার কেন সে ওয়্যারহাউসে এসেছে। পিংকি আর তার বন্ধু এ জায়গাটার প্রতি গুরুত্ব দিতে পইপই করে বলার পরে এই তো গত পরশু, শনিবার সে এখান থেকে ঘুরে গেছে। মেঝের ফাটলে শুকনো রক্তের দাগ দেখেছে নগুয়েন। তবে সে ওই রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও করিয়েছে। জেনি ঠিকই বলেছিল–চারজন আলাদা লোকের রক্ত ছিল ওটা। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে নগুয়েন একটি কম্পিউটার রিপোর্ট পেয়েছে যাতে রক্তের গ্রুপ চারজন নিখোঁজ লোকের সঙ্গে মিলে যায়–এদের দু'জন পুরুষ, দু'জন নারী। এরা সবাই ওয়েস্ট কোস্টে যাচ্ছিল, মদ্যপান করার জন্য বালটনে যাত্রা বিরতি দেয়। নগুয়েন স্মরণ করার চেষ্টা করল জেনি জিম এবং তার বন্ধুদেরকে এ চারজনের পিছু নেয়ার কথা বলেছিল কিনা। জেনি আরও কিছু মন্তব্য করেছিল যা পরে খাপে খাপ মিলে গেছে।

জেনি এও বলেছিল ওরা দানবের সঙ্গে বসবাস করছে।

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যদি চেঁচাও, কেনি,' বলল নগুয়েন, 'বাইরের কেউ কি তোমার চিৎকার শুনতে পাবে?'

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠল কেনি। সে ইতিমধ্যে এ জায়গাটি সম্পর্কে চালু হওয়া কিছু কুসংস্কার সম্পর্কে মন্তব্য করেছে। এসব কুসংস্কার সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না নগুয়েন তবে ওর যখন কাউকে পছন্দ হয় না, তাকে সে রীতিমত ঘৃণা করতে থাকে। জিম ক্লাইন ছোকরাকে প্রথম দর্শনেই তার পছন্দ হয়নি। ছোকরা যদি সত্যি মার্টিনকে হত্যা করে থাকে, এর পরিণাম তাকে ভোগ করতেই হবে। এবং সে পরিণাম হবে খুবই ভয়ানক। তবে নগুয়েন এমনভাবে ঘটনা ঘটাবে যা দেখে মনে হবে না আইন-বিরুদ্ধ কোন কাজ সে করেছে। সবসময়ই কোন না কোন উপায় থাকেই।

'সন্দেহ আছে আমার,' জবাব দিল কেনি উইলিয়ামস, অন্ধকারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'জায়গাটা আয়তনে বিশাল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে হবে আপনাকে।'

হাঁটু মুড়ে বসল নগুয়েন, স্পর্শ করল শুকনো রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কী কারণে সে আবার ওয়্যারহাউসে ফিরে এসেছে। তার দেখার দরকার ছিল আসলে কী নিয়ে সে কাজ করছে। জেনির কেবিনে পিংকির সঙ্গে দেখা হবার পরে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল নগুয়েনের। মার্টিনকে রক্তের পুকুরে ভাসতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল সে। বেচারী মাইক–নগুয়েন মার্টিনের ডাক নামটা জানে। বন্ধুর মুখের ওপর মাছি উড়তে দেখে রীতিমত বেদনাহত হয়েছে নগুয়েন। হঠাৎই তার মনে হয়েছে যেন মাত্র গতকালই সে ফিরে এসেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। অথচ সে ভাবত যুদ্ধ-বিগ্রহ অনেক আগেই পেছনে ফেলে রেখেছে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ নৃশংস ছিল মার্টিনের মৃত্যু। আর এ

ঘটনা ওই যুদ্ধের চেয়েও খারাপ। ভিয়েতনামে শত্রুর একটা নাম থাকত, তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া যেত। তারা সবাই অন্যদের মত ছিল।

সে দেখেছে পিংকি তার বান্ধবী জেনির লাশ কোলে নিয়ে বসে আছে। ধারণা করা হয় আত্মহত্যা করেছে জেনি। এ ঘটনা পরিস্থিতির ওপর অবিশ্বাসের আরেক পোঁচ লেপে দিয়েছে। প্রচুর ভোগান্তি পোহাতে হলেও এসব বিষয়ের একটা ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করত নগুয়েন। কিন্তু পিংকির আচরণের কোন ব্যাখ্যা সে পায়নি। পিংকি তার মৃত বান্ধবীকে স্রেফ কোলে নিয়ে বসে থাকেনি। তাকে স্পর্শ করছিল, কাটা ক্ষত থেকে আঙুলে রক্ত মাখিয়ে তা চুষছিল। এ ব্যাপারটা তো হজম করাই মুশকিল।

'ডিয়ার গড,' ফিসফিস করে বলল নগুয়েন। অসুস্থ লাগছে শরীর, ভয় পেয়েছে সে। মাথার ওপর দিয়ে বুলেটের শিস কেটে যাওয়ার সময়েও সে এমন ভয় পায়নি, পিংকি জেনিকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে নগুয়েনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। আর নগুয়েনের মনে হচ্ছিল তাকে যেন সম্মোহন করছে একটা শকুন। পিংকিকে সে ওভাবে চলে যেতে দিয়েছে ভাবাই যায় না। কিন্তু ওই সময় মেয়েটাকে বাধা দেয়ার কোন অবকাশও তার ছিল না।

আমার পিছু নেবেন না। আমার যা করণীয় তা আমাকে করতে দিন। যা ঘটছে তা যখন জানতে পারবেন, ততক্ষণে আপনি মরে ভূত হয়ে গেছেন।

নগুয়েন তো এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই জানে না। অবশেষে নিজেকে প্রশ্ন করেছে আসলে সে সবকিছু জানতে চায় কিনা। মার্টিনের স্ত্রীকে তাকেই বলতে হয়েছে খুন হয়েছে তার স্বামী। ভিয়েতনামে এরকম দায়িত্ব বহুবার পালন করতে হয়েছে তাকে। নিজেকে পাথর-মানব বানিয়ে মৃত সৈনিকের স্ত্রী বা প্রেমিকাকে খবরটা দিয়েছে নগুয়েন। তারপর প্রতিজ্ঞা করেছে প্রিয় সহকর্মীর হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ধরিত্রীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে শত্রুকে। শত্রুকে সে আসতে দেখেছে এবং তাকে ধ্বংসও করেছে।

কিন্তু এবারে তেমন কিছু ঘটছে না।

প্যান্টের কাপড়ে শুকনো রক্তটা মুছে নিয়ে সিধে হলো নগুয়েন। ঘুরল উইলিয়ামসের দিকে। 'ওই চার ভিক্টিমের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে?'

'এফবিআই তো তাই বলল,' জবাব দিল উইলিয়ামস।

'ওদের বয়স কত?'

'বাইশ থেকে ছাব্বিশ।'

'ব্যুরো কি তদন্ত শুরু করেছে?' জানতে চাইল নগুয়েন।

'এখনও নয়,' জবাব দিল উইলিয়ামস্। 'আপনি তদন্ত করে কী পান তা ওরা দেখতে চাইছে।'

'তুমি না এক মুর্দাফরাশের কথা বলেছিলে?'

উইলিয়ামস ব্যাক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় লেখাটা পড়ে নিয়ে বলল, 'ওর নাম কেন। জেনি বার্টন গত হপ্তায় যে ছেলে-মেয়ে দুটিকে খুন করেছিল তাদের সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

'ওদেরকে তো কবর দেয়া হয়েছে,' বলল নগুয়েন।

'জানি। সে-ও জানে। তবু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। বলছে খুব নাকি জরুরি। আমি কারণটা জানতে চেয়েছিলাম। বলেনি আমাকে। শুধু আপনাকেই বলবে। আজ রাতে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। বলেছে একটু দেরি করে কাজে আসবে।'

'খুব বেশি দেরি করে আসা ঠিক হবে না,' গম্ভীর মুখে বলল নগুয়েন। ওয়্যারহাউসের দরজায় পা বাড়াল। 'এ হতচ্ছাড়া জায়গাটা থেকে চল বেরিয়ে পড়ি, কেনি।'

ওরা আটটার সময় আসতে শুরু করল। একজন একজন করে এল। সবাইকে দোরগোড়ায় অভ্যর্থনা জানাল পিংকি। জানতে চাইল ওরা কিছু খাবে কিনা। কিন্তু পিংকির অভ্যর্থনার জবাবে তারা কিছু বলছে না দেখে এবং তাদেরকে ক্ষুধার্ত মনে না হওয়ায় ক্ষান্ত দিল ও। দরজার কড়া নড়ে উঠছে, পিংকি গিয়ে খুলে দিচ্ছে দরজা। ওরা এক এক করে প্রবেশ করছে। কেউ কোন কথা বলছে না। এরকম অদ্ভুত পার্টি জীবনে দেখেনি পিংকি। ওরা যে যার জায়গায় বসে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে। জায়গার অভাবে অনেকে দখল করল মেঝে। ওদের দেখে গা কেমন ছমছম করছে পিংকির। ওদের চোখগুলো মিশমিশে কালো, দেখে দীর্ঘদিন শীতল গুহায় বাস করা ইঁদুড়ের কথা মনে পড়ে যায়। ওরা যখন ঘরে বসে চারদিকে তাকাচ্ছিল তখনও মনে হচ্ছিল না যে চর্মচক্ষে খুব একটা কিছু লক্ষ করছে। তবে মনে হচ্ছিল ওরা রেডারের মত কী যেন বিচ্ছুরণ করছে। ঘরের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা কম্পন টের পাচ্ছে পিংকি। তবে কম্পনটা কীসের বুঝতে পারছে না।

জেনি এদের সংখ্যা নিরূপণে ভুল করেছিল। ফুটবল দলের অর্ধেক সদস্য এবং চিয়ারলিডাররা সবাই এসেছে পিংকির ঘরে। এদের বাইরে আর কেউ আসেনি।

পিংকি দরজার কাছে মাথা নিচু করে বসে রইল। ওর ভূমিকা যেন অনেকটা বাটলারের মত। কে কী আদেশ দেয় তা শোনার জন্য উৎকর্ণ। ওর পকেটে দুটো বিক লাইটার। টেনশনে হাতের তালু ঘামছে। জিম এখনও আসছে না কেন? ও কেন এত দেরি করছে?

ভয়ানক খিদে পেয়েছে পিংকির। মাথায় অবিরাম দুড়ুম দুড়ুম শব্দটা কি কোনদিনই বন্ধ হবে না?

অবশেষে হাজির হলো জিম ক্লাইন। ওকে দেখে ধড়াশ করে উঠল পিংকির কলজে। একা আসেনি জিম, সঙ্গে জর্জকেও নিয়ে এসেছে। জর্জের মুখে সেই বিখ্যাত নিষ্পাপ হাসি। জিম নিশ্চয়ই ওকে পটিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। জর্জের পেছন পেছন ঢুকল জিম, বন্ধ করে দিল দরজা।

'পিপি,' বলল জর্জ। 'এটা কী করে সম্ভব যে তুমি তোমার পার্টিতে আমাকে দাওয়াত দাওনি?'

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হলো পিংকিকে।

'ও এখানে কেন এসেছে?' প্রশ্ন করল সে জিমকে।
'এসেছে তো কী হয়েছে?' ভাবলেশহীন গলা জিমের।
'পিংক,' বিমূঢ় শোনাল জর্জের গলা।
'ও আমাদের দলের লোক নয়,' কঠোর গলায় জিমকে বলল পিংকি। 'ওকে এখান থেকে বের করে দাও।'
'না,' বলল জিম।
'কেন দেবে না?' গর্জন ছাড়ল পিংকি।
'এক্সকিউজ মি,' বলল জর্জ। 'আমি তোমাদের দলের লোক নই কথাটার মানে কী?'
'ওকে আমাদের দরকার,' বলল জিম।
'কীসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল পিংকি, যদিও প্রশ্নটার জবাব সে জানে এবং এজন্য ভেতরে ভেতরে অসুস্থবোধ করল। জিমের জবাব তার অসুস্থভাবটা বাড়িয়ে তুলল।
'তোমার জন্যে,' বলল জিম।
পিংকি জর্জের হাত খামচে ধরে ওকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল। 'এখান থেকে চলে যাও। আমরা এখানে কোন পার্টি করছি না এবং তোমাকে দাওয়াতও দেয়া হয়নি। তুমি সারাক্ষণ আমার পেছন ঘুরঘুর কর। তোমার যন্ত্রণায় আমি অস্থির। যাও, অন্য কোন মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করো গে।'
'চুপ করো,' বলল জিম।
'হ্যা, চুপ করো,' ঝাঁকি মেরে পিংকির মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জর্জ। কিন্তু ইতিমধ্যে ওর মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে সন্দেহ–ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারল পিংকি। জিম এসে জর্জের কাছ থেকে সরিয়ে নিল ওকে। জর্জ জিমের চেহারায় অশুভ কিছু একটা দেখতে পেয়েছে। ভয় পেলেও ভাবটা গোপন রাখল সে। খেলাচ্ছলে জিমের বুকে আঙুল দিয়ে গুঁতো মেরে বলল, 'কী ব্যাপার? তোমরা এখনও কেউ কিছু খাওনি?'
'এখনও নয়,' বলল জিম। তারপর ডান হাতটা তুলে জর্জের মাথার পাশে সজোরে আঘাত হানল। কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই দেয়ালে ছিটকে গেল জর্জ। বাড়ি খেয়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। অজ্ঞান। জিম ফিরল পিংকির দিকে। আতংকে জমে গেছে মেয়েটা।
'তুমি আজ কিছু খাওনি?' জিজ্ঞেস করল জিম।
দৌড় দিল পিংকি। কোথায় যাচ্ছে নিজেও জানে না। তবে বেশি দূরে যেতে পারল না। তার আগেই একজন ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল মেঝেয়। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল পিংকি, আবার ছুট দেবে, মাথার পাশে প্রচণ্ড জোরে কী যেন এসে বাড়ি খেল। জর্জের মত ও-ও ছিটকে পড়ল দেয়ালে, ওখান থেকে মেঝেয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়নি পিংকি। একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো। ওকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওরা। মোমের মিউজিয়াম অভ হরর থেকে আসা দশ ফুট লম্বা দানব যেন একেক জন। পিংকি টের পেল উষ্ণ তরল বেয়ে পড়ছে মুখের পাশ দিয়ে। হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসল জিম, স্পর্শ করল মাথা।

হাতটা তুলে নেয়ার পরে পিংকি দেখল জিমের আঙুলগুলো লাল। রক্ত মাখা আঙুল মুখে পুরে নিল জিম। চুষছে।

'ও প্রায় রেডি,' বলল সে।

ঠিক তখন দুনিয়া আঁধার হয়ে এল পল্লবী কেয়া পিংকির।

ষোলো

মুর্দাফরাশ কেন তার অফিসের খিড়কির দুয়ারে দেখা করল লেফটেনেন্ট নগুয়েনের সঙ্গে। লোকটাকে দেখে মনে হলো মানুষ নয়, সামনে একটা জিন্দালাশ দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো পেকে সাদা, অস্বাভাবিক লালচে একটা মুখ, কড়া মেকআপ নিয়েছে–কোলনের গন্ধ ভেসে আসছে গা থেকে। মমি করার ফ্লুইডের চেয়ে অন্তত ভাল গন্ধ, মনে মনে বলল নগুয়েন। কেনের মুখটা প্রকাণ্ড, ভেজা ভেজা, ফ্যাকাসে নীল চোখ, যেন কাচ দিয়ে তৈরি। মানুষ কেন যে মুর্দাফরাশের পেশা বেছে নেয় ভেবে পেল না নগুয়েন।

'আপনি এসেছেন বলে খুব খুশি হয়েছি,' দু'হাতে নগুয়েনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বলল কেন। নগুয়েন কিছুক্ষণ আগে তাকে ফোন করে জানিয়েছে সে আসছে। একাই এসেছে ও। কেনি উইলিয়ামসকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। নগুয়েন ওর আর কোন কর্মকর্তাকে হারাতে চায় না।

'নো প্রবলেম,' বলল নগুয়েন, পা রাখল মুর্দাফরাশের ল্যাবে। চোখ ঝলসানো সাদা বাতির নিচে আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে একজোড়া স্টেনলেস স্টিলের টেবিল। দূরের টেবিলে এক বৃদ্ধা মহিলার লাশ শোয়ানো। পরনে বিয়ের সাদা ড্রেস, পায়ে লাল রঙের স্লিপার। কেন বোধহয় মহিলার মেকআপ করছিল, এমন সময় হাজির হয়ে যায় নগুয়েন। বৃদ্ধার কাছে ওকে নিয়ে এল কেন।

'ইনি মিসেস বেভিন,' বলল কেন। 'তিনি স্বামীকে বলেছিলেন মৃত্যুর পরে তাদের বিয়ের পোশাকে আবার দু'জনের পুনর্মিলন ঘটবে স্বর্গে।'

'ওঁর স্বামী বিয়ের পোশাক পরার অনুমতি দিয়েছেন?' জানতে চাইল নগুয়েন।

'তা জানি না। স্বামীটি মৃত। অনেক আগেই মারা গেছেন।'

'আই সী,' বলল নগুয়েন। 'আপনি আমাকে কী দেখাতে ডেকে এনেছেন?'

'এগুলো,' বলল কেন, কোমর-সমান উঁচু একটি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। টেবিলে একজোড়া ধাতব কন্টেনার। সিলিণ্ডার আকৃতির ক্যানেস্তারা দুটো লম্বায় চার ফুট, ব্যাসার্ধে এক ফুট। ডানদিকের কন্টেনারের ঢাকনি খোলার আগেই বোটকা একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নগুয়েনের নাকে। উৎকট একটা গন্ধ। তবে এ গন্ধ অচেনা নয় নগুয়েনের। ভিয়েতনামে থাকাকালীন এ গন্ধটির সঙ্গে বহুবার তার সাক্ষাৎ হয়েছে। এ মৃত্যুর গন্ধ, লাশ পচার দুর্গন্ধ। তবে যুদ্ধক্ষেত্রের পচা গলা লাশের চেয়ে অনেক বেশি বিকট এখানকার গন্ধটা।

'মাই লর্ড,' এক পা পিছিয়ে এল নগুয়েন।

'আপনাকে আগেই সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল কেন। 'লাশ মমি করার আগে শরীর থেকে রক্ত বের করে এ কন্টেনারগুলোতে রেখে দিই আমি। এ কন্টেনারে সেদিনের পার্টিতে খুন হওয়া ছেলে-মেয়ে দুটোর রক্ত রেখে দিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি ওই জোড়াখুনের তদন্ত করছেন।'

'ঠিক শুনেছেন।'

'মেয়েটা কি বলেছে সে কেন কাজটা করেছে?' জিজ্ঞেস করল কেন।

'বিষয়টি এখনও তদন্তাধীন।'

'বুঝতে পারছি,' দ্রুত বলল কেন। 'সে যাকগে, আমি ওই টিনেজার দু'জনের লাশের শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে এ কন্টেনারে রেখেছিলাম। সেটা সোমবারের ঘটনা, ফিউনেরালের আগের দিন। সাধারণত তাৎক্ষণিকভাবে আমি কন্টেনারের রক্ত ফেলে দিই। কিন্তু সেদিন হঠাৎ করে খুব জরুরি একটি কাজে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হয়। কন্টেনারের রক্ত ফেলে দিতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজ মিসেস বেভিনের লাশ নিয়ে কাজ করছি, হঠাৎ মনে পড়ল আমি তো এখনও কন্টেনারের রক্ত ফেলিনি।' কপালে ভাঁজ পড়ল বুড়োর, একটু আগের ঢাকনি খোলা কন্টেনারের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কিন্তু ফেলতে গিয়ে দেখি কন্টেনার রক্ত-শূন্য।'

'কন্টেনারে রক্ত ছিল না?' জিজ্ঞেস করল নগুয়েন।

'নো।'

'হয়তো আপনি আগেই রক্ত ফেলে দিয়েছেন এবং পরে ভুলে গেছেন।'

'এ হতেই পারে না,' দৃঢ় গলা কেনের। কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। 'আমার ধারণা রক্তটা চুরি গেছে। বিষুদবার কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি আমার খিড়কির দুয়ারের তালা ভাঙা।'

'কই, কোন ভাঙা তালা তো দেখলাম না।'

'আমি নতুন তালা লাগিয়েছি। আমি আমার অফিস কখনও অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাই না। একটা লাশ চুরি গেছে তো আমার মুর্দাফরাশের ক্যারিয়ার খতম।'

'আপনি ল্যাব ছেড়ে যাওয়ার সময় আর কোন লাশ কি ছিল এখানে?'

'না।'

'কে রক্ত চুরি করতে পারে?'

হতাশ দেখাল মুর্দাফরাশকে। 'আমি ভাবলাম এ ব্যাপারে আপনি কোন আলোর চিহ্ন দেখাতে পারবেন।'

'দুঃখিত, পারছি না।' খালি কন্টেনারের দিকে কদম বাড়াল নগুয়েন। ধারণা করল ওটা খালি; তবে ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। 'এটা থেকে এমন বিশ্রী গন্ধ আসছে কেন?'

'এ কারণেই আপনাকে আসতে বলেছি। খুন হওয়া ছেলে-মেয়ে দুটোর রক্তের মধ্যে কিছু একটা ছিল।'

'মানে?'

'দেখাচ্ছি আপনাকে,' কেন প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে একজোড়া গ্লাভ বের করে হাতে পরে নিল। তারপর কন্টেনারটা কাত করে ধরল। নগুয়েন ভেতরে গাঢ় সবুজ রঙের শ্যাওলার মত একটা জিনিস দেখতে পেল। ওটা দিয়ে এমন ভয়ানক বিশ্রী গন্ধ আসছে কহতব্য নয়। গন্ধের ঝাপটায় নগুয়েনের চোখ জ্বালা করে উঠল।

সে অজান্তেই এক পা পিছিয়ে গেল।

'কী ওটা?' মুখ কুঁচকে জানতে চাইল নগুয়েন।

'জানি না,' চেহারা অন্ধকার করে জবাব দিল মুর্দাফরাশ। 'আমার চল্লিশ বছরের মুর্দাফরাশের জীবনে এমন জিনিস কোনদিন দেখিনি। ওই ছেলে-মেয়েদের রক্ত দূষিত ছিল, এ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'কীভাবে দূষিত হয়েছে?' প্রশ্ন করল নগুয়েন।

'তা জানি না।'

'কন্টেনারে লেগে থাকা রক্তে হয়তো কোন অর্গানিজমের সৃষ্টি হয়েছে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল কেন। 'না। কন্টেনারে বহুদিন ধরে রক্ত জমা ছিল বলে আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি আমি একজন পারফেকশনিস্ট এবং আমি অমন কাজ কোনদিনই করব না। আমি তরুণ দু'জনের রক্ত ওই কন্টেনারে ঢালবার আগে ওটা খুব ভালভাবে ধুয়ে নিয়েছিলাম। যীশুর কিরে। ওই সময় কন্টেনারে কোন অর্গানিজম ছিল না। তাছাড়া এখানে যা জন্মাচ্ছে তা খুবই অস্বাভাবিক।' ক্যানেস্তারাটি আরেকটু কাত করল কেন, পেছনের খানিকটা অংশ দেখা গেল। সবুজ রঙের জিনিসটা সরু একটা ট্রেইল করে কন্টেনারের পেছনে পৌঁছেছে। ট্রেইলটা দ্বিতীয় কন্টেনারের দিকেও এগিয়েছে। ঝুঁকল নগুয়েন। দেখল ঢাকনি আটকানো দ্বিতীয় কন্টেনারের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সবুজ শ্যাওলা। যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে।

হামাগুড়ি দিয়ে? ওটা তো জন্তু-জানোয়ার নয়।

ওটাকে জন্তু ভাবতেও চায় না নগুয়েন।

'দ্বিতীয় কন্টেনারে কী আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মিসেস বেভিনের রক্ত।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য হবারই কথা,' থমথমে চেহারা মুর্দাফরাশের।

'যেন সবুজ জিনিসটা রক্ত পান করার তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ওদিকে এগোচ্ছে।' সামনে ঝুঁকল সে। 'এ কন্টেনার থেকে যে-ই রক্ত চুরি করে থাকুক না কেন, কাজটা সে করেছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে।'

সতেরো

ভিনগ্রহের দুনিয়ার স্বপ্ন দেখছে পল্লবী কেয়া। যেদিন দুনিয়ার মৃত্যু হলো। সে দিনটির কথা পরিষ্কার মনে আছে দুনিয়ার। হ্যাঁ, নিজের মউতের কথা স্মরণে রয়েছে তার। কারণ দুনিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম। তার কোন জুড়ি নেই। কারও সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সে মারা যাবার পরে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে পারে। পিংকির মনের মধ্যে দুঃস্বপ্নের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে দুনিয়ার মন। ওটা যা দেখে পিংকি তা-ই দেখে। পিংকি ওটার ভয়, আতংক সবকিছু অনুভব করতে পারে। পৃথিবী নামের তৃতীয় গ্রহ থেকে আসা মানুষরা যখন তাদের শক্তিশালী যন্ত্রগুলো দুনিয়ার দিকে তাক করেছিল তখন দুনিয়ার মনের ভীতি স্পষ্ট টের পেয়েছে পিংকি তার দুঃস্বপ্নের মধ্যে।

এ হামলার বিরুদ্ধে প্রায় অসহায় ছিল দুনিয়া। তৃতীয় গ্রহ থেকে আসা রুপোলি রঙের মহাকাশযানগুলোকে প্রথমে সে নিজের গ্রহের সারফেসে অবতরণ করার অনুমতি দেয়নি এবং ওদেরকে সাবধান করেও দেয়া হয়েছিল, তারা জানত দুনিয়ার সারফেস বা উপরিভাগ কী করতে পারে, কীভাবে ইনফেকশন তাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তারা নিজেদেরকে ভক্ষণ শুরু না করা পর্যন্ত তাদের শরীর খেয়ে ফেলতে পারে। প্যারাসাইট বা পরজীবীকে খেতে দিতে হয় নইলে সে নিজেই তার হোস্টকে খেয়ে ফেলতে শুরু করে। এ প্যারাসাইট মৃত প্রায় রক্তের জীবন্ত আয়রন খেতে পছন্দ করে—তাকে পোলারিটি এবং ম্যাগনেটিজম আনার জন্য খেতে হয়। আর এগুলোর সঙ্গে দুনিয়ার মনের সংযোগ রয়েছে। রূপান্তরের জন্য শুধু প্যারাসাইট দ্বারা আক্রান্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। তাতে বড় জোর একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, তার বেশি কিছু নয়। আসল ব্যাপারটি অর্থাৎ ম্যাগনেটিজম ঘটে যখন ভিক্টিমের রক্তের পোলারিটি একটি নির্দিষ্ট লেভেল বা 'ফেজ ট্রানজিশন'-এ গিয়ে পৌঁছায়, তখন। তখন শিকার এবং শিকারী এক হয়ে যায়। আর একবার কোন মানুষের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটলে সে তার রক্তের সাহায্যে অন্যদেরকেও বদলে দিতে পারে। আর এ কাজটা সে খুব দ্রুত করতে পারে। নিজের রক্ত দিয়ে গোটা এক গ্রহ সে দখলে নিতে পারে।

কিন্তু এ লোকগুলো প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য দুনিয়ার কোষগুলো তাদের শরীরে প্রবেশের কোন সুযোগ তাকে দেবে না। তারা আকাশের অত্যন্ত উঁচুতে আলোর একটা বিদারণ পাঠিয়েছে। ওটা দুনিয়ার সংস্পর্শে আসা মাত্র বিস্ফোরিত হয়েছে। বিদীর্ণ করে দিয়েছে জমিন, তৈরি করেছে প্রকাণ্ড এক জ্বালামুখ যেখানে দুনিয়ার একটি সেল বা কোষও বেঁচে থাকতে পারেনি। তারপর, বিস্ফোরিত জ্বালামুখের ধারে ধীরেসুস্থে অবতরণ করেছে মহাকাশযানগুলো। ওখানে নামার পরে তারা তাদের মেশিন ব্যবহার শুরু করে।

দুনিয়া প্রথমে পুরো ব্যাপারটি লক্ষ করেছে। যারা তার গ্রহের এমন দশা করেছে তাদের আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত তার তেমন কিছু করার ছিলও না। লোকগুলো দ্রুত কাজ শুরু করে। তারা যে জিনিসটি বানাতে শুরু করেছিল তা একদিনের মধ্যে একটি আকৃতি পেয়ে যায়। তবে দিনের শেষেও শেষ হয় না কাজ, দুনিয়া অপেক্ষা করছিল কখন অস্ত যাবে সূর্য এবং সে তার ক্ষুধার্ত বাহিনীকে পাঠিয়ে দেবে। ওরা এল হাজারে হাজারে। যুগযুগ ধরে দুনিয়া তাদেরকে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, শুধু তৃতীয় গ্রহের লোকদের চক্ষুর আড়ালেই নয়, দূর দূরান্তের নক্ষত্র থেকে যারা এসেছিল তারাও ওদের কোন সন্ধান পায়নি। দূরের গ্রহ থেকে আসা লোকজন দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে পুরোপুরি বদলে যায়। তাদের পেটে শুধু খিদে। এবং তারা দুনিয়ার কথা মাফিক সব কাজ করে দেয়।

আরও একবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল তৃতীয় গ্রহের মানুষদের। তারা কখনও ঘুমাত না এবং হামলার আশংকা দেখলেই শক্তিশালী লাল ও সবুজ রঙের এনার্জি রশ্মি ছুঁড়ে মারত। এ রশ্মির আঘাতে দুনিয়ার পায়ে হাঁটা এবং উড়তে জানা সেনা-সামন্তরা ঝাঁকে ঝাঁকে নিহত হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মনুষ্য সৃষ্ট প্রকাণ্ড জ্বালামুখের ধারে পড়ে ছিল লাখ লাখ খণ্ডিত দেহ। দুনিয়ার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে ওইসব কাটা হাত-পা এবং ডানাগুলো টুকরো হওয়া শরীর নিয়েই শত্রুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল। কিন্তু মানুষ ওগুলোর ওপরেও গুলিবর্ষণ করে এবং ধ্বংস করে দেয় দুনিয়ার একসময়ের সবচেয়ে সুরক্ষিত শক্তি।

কিন্তু এ সংঘর্ষ চলাকালীন একটি লোক অসাবধানে চলে আসে জ্বালামুখের সীমানার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুনিয়া, লোকটার রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় তার বীজ। হামলার শিকার হয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে লোকটা, তার আর্তনাদে সাবধান হয়ে যায় অন্যরা। তবে লোকটাকে রক্ষা করতে তারা ছুটে আসেনি; বরং তার ওপর নির্দয়ের মত চালিয়ে দেয় এনার্জি রশ্মি। তবে লোকটা নিহত হবার পূর্বমুহূর্তে দুনিয়া এক ঝলক তার মনের ভেতরটায় উঁকি দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং বুঝতে পেরেছিল মানুষগুলোর হাতে যে যন্ত্রটি রয়েছে তা দিয়ে দুনিয়াকে ওরা ধুলোয় পরিণত করতে পারবে। ওটা আসলে একটা দানব বোমা। ওরা এসেছে দুনিয়াকে হত্যা করতে। তারা ওকে খুন করতে চায় কারণ দুনিয়া রূপান্তরিত যাদেরকে তৃতীয় গ্রহে ফেরত পাঠিয়েছিল তারা মানব জাতিকে ধ্বংস করেছে। এখন যে লোকগুলোকে দেখছে দুনিয়া, তারা তৃতীয় গ্রহের রক্ষা পাওয়া স্বল্পসংখ্যকদের কয়েকজন। তৃতীয় গ্রহের বিশাল এক সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না দুনিয়া। অবশ্য তার কিছু করারও ছিল না। কারণ মানুষগুলো ছিল সংকল্পবদ্ধ। দুনিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওরা যন্ত্র বসানোর কাজ শেষ করে ফিরে গেছে নিজেদের মহাশূন্যযানে। দুনিয়া জানত যন্ত্রটি টিক টিক শব্দে চলবে; সে মেশিনের ভেতরকার কলকব্জাগুলোর শব্দ

শুনতে পাচ্ছিল। জানত শুরু হয়ে গেছে কাউন্টডাউন।

তারপর প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমাটি ফাটল। দুনিয়ার শরীরে আঘাত হানল সুচাল ব্যথার একটা ঢেউ। ব্যাঙের ছাতার আকার নিয়ে উদ্ভাসিত হলো আগুন, তীব্র যন্ত্রণায় দুনিয়া তখন কাতরাচ্ছে। লোকগুলো তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেছে; দুনিয়ার শক্ত স্তরে তারা ফাটল ধরাতে পেরেছে। দুনিয়ার শরীর থেকে খসে পড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টুকরোগুলো সবেগে উৎক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। তারপর দুনিয়ার মাঝখানে চাপিয়ে রাখা অবিশ্বাস্য শক্তির চাপ রিলিজ হলো, শক্তির অফুরান আধার নিয়ে বিস্ফোরিত হলো দুনিয়া। আর এজন্য তাকে ভয়াবহ শারীরিক যন্ত্রণা সইতে হলো!

যেভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই চলে গেল ব্যথা।

অদৃশ্য হয়ে গেছে দুনিয়া। মারা গেছে। প্রাণহীন পাথরখণ্ডগুলো শূন্য দিয়ে ছুটে চলল যেখানে একদা বাস করত দুনিয়া।

তবে দুনিয়ার ছোট ছোট কয়েকটি অংশ রক্ষা পেল। ওই টুকরোগুলোয় ছিল দুনিয়ার উপরিভাগের কিছু সেল বা কোষ। তারা শত-শত বছর ধরে নানান সাগরে ভেসে বেড়াতে লাগল, সচেতন তবে উপলব্ধিহীন ক্ষমতা নিয়ে। এদের পেটে আগ্রাসী খিদে, খাওয়া ছাড়া তারা আর কিছু বোঝে না, কিন্তু এ খিদে মেটানোর মত অবস্থা তাদের ছিল না। আর যারা তাদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে সেই মানব সম্প্রদায়ের ওপর জমে ওঠে তীব্র ঘৃণা। তারা শপথ নেয়, যদি সামান্যতম সুযোগও মেলে, তৃতীয় গ্রহের মানুষদের ওপর তারা শোধ নেবে।

শীঘ্রি মনে হলো কয়েকখণ্ড প্রস্তর যেন সুযোগটা পাইয়ে দেবে। ওগুলো যখন ডিগবাজি খেতে খেতে মহাশূন্য ধরে ছুটছে, ওই সময় কয়েকটা টুকরো তৃতীয় গ্রহের খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। তারা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটি আবার পৃথিবী গ্রহের গায়ে আছড়ে পড়ে। অবশ্য বেশিরভাগেরই সলিল সমাধি ঘটে বিশাল সাগরে। এবং ডুবে যায়। তবে দুটি খণ্ড আছড়ে পড়ে জমিনে। দাউ-দাউ জ্বলে ওঠে আগুন। ওতে প্রচণ্ড বেদনা অনুভব করছিল দুনিয়া। মাটির তাপে প্রায় সবগুলো সেল বা কোষ ধ্বংস হলেও অল্প কয়েকটি বেঁচে ছিল। দানবাকৃতির হিমবাহের কারণে ক্রমে ওগুলো নমনীয় হয়ে ওঠে। হিমবাহগুলো ভাসতে ভাসতে অনেক হ্রদ পেরিয়ে যায়–পানির মধ্যেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল সেল বা কোষগুলি। ওখানে, তৃতীয় গ্রহের দুটি ছোট হ্রদে, সেগুলো নিজেদেরকে জোর করে ছড়িয়ে দেয় এবং অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে তাদের আশ্রয় ধ্বংসকারীকে কবে বাগে পাবে এবং তাদের শরীরের রক্ত দূষিত করে তুলে তাদেরকে শেষ করে দেবে। মিষ্টি লাল রক্ত–এটিই একমাত্র জিনিস যা তাদের খিদে পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম।

'পিংকি,' ডাকল জর্জ।

চোখ খুলল পিংকি। বেসমেন্টের সিলিং দেখতে পেল, ওপরের ফ্লোরের তক্তা সরানো, একটি মাত্র বাল্ব উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। রক্তের গন্ধ এসে লাগছে

নাকে, বাতাসে তামার কটু স্বাদ, তার নিচে আয়রনের হালকা মিষ্টি গন্ধ। চোয়াল নাড়ল পিংকি, শব্দ হলো কুট করে। মুখে শুকিয়ে আছে রক্ত। খুলির ভেতরে দুম দুম আওয়াজ। পিংকি উঠে বসার চেষ্টা করল, ব্যথার তীব্র একটা ঢেউ ধাক্কা মারল ওকে।

'উহ,' কাতরে উঠল পিংকি। বুজে ফেলল চোখ। জর্জ ওকে এক মুহূর্তের জন্য ধরে রইল।

'উঠো না,' বলল সে। 'বসে থাকো। এখান থেকে এ মুহূর্তে কোথাও যেতে পারছি না আমরা।'

আবার চোখ মেলে চাইল পিংকি। দেখল রক্তের একটা ডোবার মধ্যে বসে আছে ও। মাথায় একটা হাত চলে গেল ওর। খুলির পেছনটা বিশ্রীরকমভাবে কেটে গেছে। তবে মেঝের সমস্ত রক্ত নিশ্চয়ই ওর নিজের নয়। জর্জের দিকে তাকাল পিংকি। জিমের ঘুসি খেয়ে মুখের একটা পাশ ফুলে উঠেছে জর্জের। কিন্তু কাটাছেঁড়ার কোন চিহ্ন নেই। ওরা পিংকির কী করেছে? ও যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল তখন রক্তের বালতি ঢেলে দিয়েছে গলার মধ্যে? মুখের ভেতরটা বিশ্রী লাগছে পিংকি। কিন্তু মাথার ভেতরে ব্যথাটা এরচেয়ে অনেক গুণ বেশি। ওখানে হাত ছোঁয়ানোই যাচ্ছে না। পিংকিকে শীঘ্রি কিছু খেতে হবে নইলে নিজের মাথা করাত দিয়ে কেটে ফেলতে হবে ওকে।

'কখন জ্ঞান ফিরল তোমার?' জর্জকে জিজ্ঞেস করল পিংকি। ইন করা শার্ট প্যান্টের ভেতর থেকে বের করে মুখ মুছছে।

'অল্পক্ষণ আগে,' জবাব দিল জর্জ। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমাদেরকে এখানে আটকে রেখেছে। ওরা এখনও ওপরে আছে।'

কান পাতল পিংকি। মাথার ওপরে কাঠের তক্তা মচমচ করে উঠল। 'আমি অবাক হচ্ছি না।'

হাত দিয়ে মাথা ঘষল জর্জ। 'এসব হচ্ছেটা কী? টড এবং কেথির মৃত্যুর জন্য ওরা কি আমাদেরকে দায়ী করছে?'

'ওদের মৃত্যু নিয়ে এ মুহূর্তে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না।'

'তাহলে আমাদেরকে আটকে রেখেছে কেন? ওরা সবাই এখানে কী করছে? জিম বলল তুমি নাকি পার্টি দিচ্ছ?'

'এটা কোন পার্টি নয়,' বলল পিংকি।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বলো না কী হচ্ছে?'

'ভিনগ্রহ থেকে আসা ত্রিশজন দানবের হাতে আমরা এখন বন্দি।'

'পিপি?'

'আমি তাই জানি।' সেই মুহূর্তে দুঃস্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল পিংকির। প্রাচীন মানব সভ্যতার ধ্বংস। ওদের তৈরি বোমা। শয়তান দুনিয়ার মৃত্যু। সময় এবং মহাশূন্য অতিক্রম করে যেতে থাকা গ্রহাণুপুঞ্জ এবং দুটো হ্রদে পরজীবী কোষের পুনর্জন্ম। যোগ করল ও, 'আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।'

গোঁ ধরে রইল জর্জ। 'এটা ঠিক হচ্ছে না, পিপি।'

ব্যথায় মুখ কোঁচকাল পিংকি। 'আমি দুঃখিত।'

সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হলো জর্জ, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ওকে। 'তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

ওর হাতটা সরিয়ে দিল পিংকি। 'আমি ঠিক আছি।' জর্জের সাহায্য ছাড়াই সিধে হলো। বন্‌বন্ করে ঘুরে উঠল মাথা, তবে খাড়া হতে গিয়ে পা টলল না। বেসমেন্টে কোন জানালা নেই। বের হবার একটাই রাস্তা–এ বাড়ির দোতলার দরজা। লম্বা পা ফেলে ঘরের কিনারে চলে এল পিংকি। এখানে সে একটি বড় নীল রঙের প্লাস্টিকের তারপুলিনের নিচে গ্যাসোলিনের বোতলগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। বোতলগুলো যথাস্থানে রয়েছে।

কিন্তু ফিউজটা নেই।

নিজের পকেট খুঁজল পিংকি। ওরা লাইটারগুলো নিয়ে গেছে।

'ওই বোতলগুলোয় কী আছে?' জিজ্ঞেস করল জর্জ। ও বোকা নয়। যেভাবে রশি দিয়ে বোতলগুলো বাঁধা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় বোতলে পানীয় জল রাখেনি পিংকি।

'গ্যাসোলিন,' জানাল পিংকি।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল জর্জের। 'ওরা কি আমাদের পুড়িয়ে মারবে?'

'না,' বলল পিংকি। 'আমি ওদেরকে পুড়িয়ে মারব।'

'কেন, ফর গড'স সেক?'

'ফর দ্য সেক অভ গড,' বলল পিংকি। ও ঠিক তখন বুঝতে পারল ওদের আর পালাবার উপায় নেই। ও ভেবেছিল দানবগুলোকে থামাতে পারবে। কিন্তু ওদেরকে থামাতে গেলে ও এবং জর্জ দু'জনেই মারা যেতে পারে। কথাটা মনে হতে বুকটা হু হু করে ওঠে পিংকির। কিন্তু এছাড়া উপায়ও তো নেই। পিংকিকে ভীত চক্ষে দেখছিল জর্জ।

'তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল জর্জ।

'জর্জ,' নরম গলায় বলল পিংকি। 'ওপরে যারা আছে তারা সবগুলো শয়তানের দোসর। জেনি ঠিকই বলেছিল–ওরা নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। তুমি আইনের লোকজনদের বললেও তারা এ কথা বিশ্বাস করবে না। কারণ এ দানবরা দেখতে তোমার-আমার মতই। যদিও ওরা তোমার-আমার মত নয়। ওদের ভেতরে কিছু একটা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে যা ওদের খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ, ওরা মানবতার শত্রু হয়ে উঠেছে, ওরা মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। ওদেরকে থামাবার একটাই উপায়–ওদেরকে হত্যা করা।'

'তুমি দেখছি জেনির মতই কথা বলছ।'

'জেনি মারা গেছে,' হাহাকার করে উঠল পিংকি।

দারুণ চমকে গেল জর্জ। 'কীভাবে মারা গেল?'

'ওরা ওকে হত্যা করেছে।'

জর্জ ওকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল, 'পিংকি?'

'দূরে থাকো,' জর্জকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল পিংকি। ধাক্কাটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। প্রায় উল্টে পড়ে যাচ্ছিল জর্জ। পিংকির মনে পড়ল ওর গায়ে এখন অনেক শক্তি। শক্তিটা যেন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরা কি সত্যি ওর

মুখে রক্ত ঢেলে দিয়েছিল? কার বা কীসের রক্ত? জর্জ ধাক্কা খেয়ে বোকার মত তাকাল পিংকির দিকে।

'তোমার হয়েছেটা কী বলো তো?' আকুতি ঝরল জর্জের কণ্ঠে।

'এ মুহূর্তে নানা ঝামেলায় আছি আমি।' জবাব দিল পিংকি। বেসমেন্টের চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। সবগুলো দেয়াল কংক্রিটের, শুধু একটি বাদে ওটা কাঠের। তবে কাঠের প্যানেলিংয়ের কাজটা অসমাপ্ত রেখে গেছেন ওর দাদু। 'তোমার কাছে দেশলাই আছে?' শান্ত গলায় জানতে চাইল পিংকি।

'না।'

'লাইটার?'

'আমি ধূমপান করি না, পিংকি। তুমি নিশ্চয়ই ওই বোতলগুলোয় আগুন দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার কথা ভাবছ না।'

জর্জের চোখে চোখ রাখল পিংকি। জেনির কেবিনে বসে সেদিন যা ঘটেছিল এবারেও ওর শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে গেল একটা চৌম্বকীয় স্রোত, উঠে এল মাথায় বেরিয়ে গেল চোখ ফুঁড়ে। এ যেন এক অদৃশ্য মাইণ্ড-টুইস্টার–পিংকি আশা করল এবারেও শক্তিটি কাজ করবে।

'আমি তা-ই ভাবছি, জর্জ,' মৃদু গলায় বলল পিংকি। 'এবং ঠিক সে কাজটাই এখন আমি করব। তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমার কাজে বাধা দিতে এসো না। আমি চাই না তুমি আমার কাজে নাক গলাও।'

হঠাৎ জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল জর্জ–দরদর করে ঘামছে। 'না, তুমি এ কাজ করতে পারো না।'

'আমি পারি। এবং আমি করব। বললাম না নাক গলাতে আসবে না।' উড প্যানেলিং থেকে এক টুকরো কাঠ ভেঙে নিল পিংকি। দু'হাত দিয়ে চাপ দিতেই মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে গেল তিন ফুট লম্বা কাঠখণ্ড। এক খণ্ডের মাথাটা সুচাল বর্শার আকার পেয়েছে। কিনারে রাখা বোতলগুলোর দিকে এগিয়ে গেল পিংকি। একটা গ্যালনে তীক্ষ্ণমুখযুক্ত কাঠের টুকরোটা ঢুকিয়ে দিল। ফুটো হয়ে গেল বোতল। গলগল করে তেল পড়তে লাগল মেঝেয়।

'পিপি,' ব্যাঙের গলায় পেছন থেকে ডাকল জর্জ, নিজের জায়গায় পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নড়াচড়ার শক্তি নেই।

'শাট আপ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

'থামো।'

'ওরা যখন থামবে কেবল তখনই আমি থামব।' বলল পিংকি। ঝুঁকে গজালের মত কাঠের টুকরোটা গ্যাসোলিনের ক্রমবর্ধমান পুকুরের মাঝখানে খাড়া করে বসিয়ে দিল। বাঁ হাত দিয়ে গজালের মুখটা শক্ত মুঠোয় ধরল। ওপরতলার দানবগুলো নিশ্চয়ই কোনদিন বয় স্কাউট কিংবা গার্ল স্কাউটদের প্রশিক্ষণ নেয়নি। তাই পিংকির মত কৌশল তাদের জানা নেই। ওরা ওর লাইটার কেড়ে নিয়েছে তো কী হয়েছে–আগুন জ্বালতে পিংকির একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। সে খাড়া করা গজাল চেহারার কাঠের টুকরোর সঙ্গে হাতের কাষ্ঠখণ্ডটি আড়াআড়িভাবে জোরে জোরে ঘষতে শুরু করল। ওর গায়ে

শক্তির অভাব নেই—অল্পক্ষণ চেষ্টা করলেই কাঠের সঙ্গে কাঠের ঘর্ষণে জ্বলে উঠবে আগুন। চোখ বুজল পিংকি। শীঘ্রি সবকিছুর ঘটবে অবসান।

কিন্তু দুর্বল ঠেকল শরীর। নিজেকে মৃত্যুর এক ইঞ্চি দূরে নিয়ে এসেছে পিংকি, হয়তো ওর শরীরের মধ্যে বেড়ে ওঠা ভিনগ্রহের অর্গানিজম ওকে এতদূর ঠেলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ওর ভেতরের মানুষের অংশটুকু আর সহ্য করতে পারছে না। ওর বয়স মাত্র আঠারো। ও এত কম বয়সে মরতে চায় না। এবং আত্মহননের পথ ধরে তো নয়ই। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল পিংকির। হাত কেঁপে উঠে কাঠের টুকরো দুটো গ্যাসোলিনের মধ্যে পড়ে গেল।

'আমি পারব না,' গুঙিয়ে উঠল ও।

ও টের পেল জর্জ এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে। কানে কানে বলছে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু জর্জের স্পর্শ স্বস্তি দিল না পিংকিকে। বরং খুলির মধ্যে অসহ্য হাতুড়ির বাড়িগুলো আরও বাড়িয়ে তুলল। ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল জর্জ। ওর গা থেকে ঝলসানো মাংসের গন্ধ আসছে। জিভে জল এসে গেল পিংকির।

'চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করি,' বলল জর্জ।

জর্জকে দেখছে পিংকি—কী সুন্দর একটা ছেলে, ভারী হ্যাণ্ডসাম। কখনও মুখ ফুটে বলেনি ও পিংকিকে ভালবাসে। কেন বলেনি? পিংকি জর্জের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে মাথার একটা পাশ ফুলে গেছে জর্জের। ওখানকার চামড়াও ছিলে গেছে। বুক ভরে দম নিল পিংকি, থেঁতলানো জায়গাটায় বুলিয়ে দিল নরম আঙুল। চেহারা দেখে মনে হলো আরাম পাচ্ছে জর্জ। বুজে এল চোখ। পিংকি দ্রুত হাত তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিল আঙুল। এক ফোঁটা রক্ত লেগে ছিল আঙুলে। রক্তের স্বাদটা ওকে সুখ দিল। ফুলে থাকা জায়গাটা আবার ছুঁল ও। এবারে বসিয়ে দিল নখ।

'উঁহ্!' মাথা সরিয়ে নিল জর্জ। খুলে গেছে চোখ।

'আমি দুঃখিত,' দ্রুত বলল পিংকি। ওর হাতে এখন আরও বেশি রক্ত লেগে গেছে। কিন্তু ওর দিকে জর্জ তাকিয়ে আছে বলে রক্তমাখা আঙুলগুলো চুষতে পারল না পিংকি।

ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জর্জ। 'তোমাকে অন্য রকম লাগছে।'

'তোমাকে খুব হ্যাণ্ডসাম লাগছে।'

'সত্যি?'

'হুঁ,' ঘ্যাসঘেসে শোনাল পিংকির গলা। জর্জের চোখে চোখ। জর্জের চোখের তারার শিরাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ইচ্ছে করছে চোখের শিরা বেয়ে জর্জের মগজের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে ওটা খামচে ধরে। ভাবনাটা এক ধরনের বিজাতীয় আনন্দের সঞ্চার করল পিংকির দেহে। সে সঙ্গে মাথার দপদপানিটাও বুঝি একটু কমিয়ে আনল। এ তীব্র হাতুড়ির বাড়ি থেকে ওকে রক্ষা পেতেই হবে, নইলে ঠিক পাগল হয়ে যাবে পিংকি। 'আমাকে চুমু দাও।' হঠাৎ বলে উঠল ও।

'কী?'
'কিস মি।'
হেসে উঠল জর্জ। 'পিপি, এখান থেকে আমাদের বেরুতে হবে।'
'জানি আমি। আমাকে চুমু খাও।' ওকে খামচে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল পিংকি। 'এক্ষুণি।'
পিংকিকে চুম্বন করল জর্জ। জিমের মত উন্মত্ত চুমু নয়। তবে ওর চুম্বন করার স্টাইলটিও ভারী সুন্দর। ওর ঠোঁটে আস্তে কামড় দিল পিংকি। বিযুক্ত হলো জর্জ। ওর মুখে রক্ত। আরে, রক্ত এল কোত্থেকে। তবে রক্ত মাখা ঠোঁটে জর্জকে দেখতে ভালই লাগছে। রক্তটা ও না মুছলেই খুশি হবে পিংকি। কিন্তু হাত দিয়ে রক্ত মুছে ফেলল জর্জ।
'তুমি আমাকে কামড়ে দিয়েছ,' বলল জর্জ, হাতের উল্টো পিঠে চোখ।
'আমি দুঃখিত,' হাঁপাচ্ছে পিংকি। 'লেগেছে?'
'না। তবে–'
'আমাকে আবার চুমু খাও।'
'না, পারব না।'
'অবশ্যই পারবে,' জর্জের মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরল পিংকি, মুখ টেনে আনল নিজের কমলাকোয়া অধরোষ্ঠে। জর্জের ঠোঁট চুষতে লাগল বুভুক্ষের মত। জর্জ নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। শক্ত করে ওকে ধরে আছে পিংকি। দারুণ সুখকর একটা অনুভূতি জাগছে পিংকির। ওরা গ্যাসোলিনের পুকুরের মধ্যে বসে আছে। কটু গন্ধটা জর্জের অসহ্য লাগলেও পিংকি একদমই গ্রাহ্য করছে না। ওর ভেতরে কোথাও একটা সতর্ক-ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টাটা ওকে বলছে ও যা করছে তা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু সতর্ক-ঘণ্টা পাত্তা পেল না পিংকির মস্তিষ্কে অনবরত বাড়ি দিতে থাকা হাতুড়ির কাছে। ওর পেটে খিদের আগুন। এ আগুন ওর সমস্ত সুকুমার অনুভূতিগুলো পুড়িয়ে ফেলল। আবার চোখ ফেটে কান্না এল পিংকির। ও তো জর্জকে চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু জর্জ কেন ওর কথা শুনল না? সমস্ত দোষ আসলে জর্জের।
'পিংকি!' আর্তনাদ করে উঠল জর্জ। ধাক্কা মেরে নিজেকে মুক্ত করল পিংকির বাহুর কঠিন বন্ধন থেকে। হাঁপাচ্ছে বেদম। ঘন-ঘন চোখের পলক ফেলছে। ওর মুখের অর্ধেকটা রক্তে মাখামাখি। 'কী হয়েছে তোমার?'
গলায় আবেগ নিয়ে বলল পিংকি, 'আমি তোমাকে চাই। ভীষণভাবে চাই।'
জোর করে মুখে হাসি ফোটাল জর্জ। 'কিন্তু তুমি তো আমার দম বন্ধ করে ফেলেছিলে।'
হাসার চেষ্টা করল পিংকি। 'আমি তোমাকে আদর দিয়ে দম বন্ধ করে ফেলতে চাই। তবে ব্যথা পেলে দুঃখিত।'
'আচ্ছা, দুঃখ পেতে হবে না।'
'হবে না?'
'না।' পিংকির গালের এক ফোঁটা অশ্রু মুছে দিল জর্জ।
'তুমি ভয় পেয়েছ। তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ম্যায় হুঁ না!'

'সত্যি?'

হাসল জর্জ। 'সত্যি, পিপি। দানব বলে কিছু নেই।'

'থ্যাঙ্ক গড।' জর্জের হাতে চুমু খেল পিংকি। তারপর ওর ঘাড়ের পেছনে হাত রাখল, আঙুলের ডগা দিয়ে খুলির নিচের অংশ হালকা ম্যাসেজ করে দিতে লাগল। আরামে আবার চোখ বুজে এল জর্জের। ওই চোখ আর খোলা দেখতে চায় না পিংকি। সে সামনে এগিয়ে এল। মুখ হাঁ করে আরেকবার চুম্বন করল জর্জকে। এবারে চুম্বন হলো অনেক বেশি গভীর। এত নিবিড় পিংকির মনে হলো সে জর্জের শরীরের ভেতরে ঢুকে গেছে, ওর একটা অংশ বনে গেছে। দু'জনের হৃৎপিণ্ড উল্লাস এবং আনন্দে যেন একত্রে স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

পিংকি জর্জের মাথার পেছনে হাতের চাপ বাড়াল।

'আই লাভ ইউ, জর্জ,' ফিসফিস করল ও।

তোমাকে আমি সবসময় ভালবাসব। জনম জনম আমি তোমারে বাসিব ভাল।

তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে জর্জের মাথাটা দু'হাতে ধরে মোচড় দিল পিংকি।

ঘাড়ের হাড় মট করে ভেঙে যাওয়ার পরিষ্কার শব্দ হলো।

জর্জ ওর গায়ে নেতিয়ে পড়ল।

আর শ্বাস নিচ্ছে না সে।

যেন ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা, ভাবছে পিংকি।

জর্জের মুখের ওপর পড়ে থাকা চুলগুলো আলতো করে সরিয়ে দেয় ও। ঘুমাক। ও যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমিয়ে থাকুক।

পিংকি জর্জের গালে চুমু খেল। 'ভালবাসি তোমায়।' বলল সে।

তারপর হাঁ করল মুখ। বুজল চোখ।

শুরু করল সে। ভুলে গেল জগৎ-সংসার।

আহ, স্বাদটা কী দারুণ!

আঠারো

বালটন শহরে উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছে লেফটেনেন্ট নগুয়েন। সে জানে তার করণীয় কী। পিংকির বাড়ি যাবে সে, জেনির গল্পটা নিয়ে কথা বলবে। নগুয়েনের ধারণা পিংকি এখন জেনির গল্পটা বিশ্বাস করে। এবং বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট কারণও রয়েছে। সে নিজেও গল্পটা বিশ্বাস করার জন্য প্রায় প্রস্তুত। কিন্তু পিংকি তাকে তার কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকতে বলেছে। ওকে হুকুম করেছে, নির্দেশটা নগুয়েনের মস্তিষ্কের গভীরে ঢুকে গেছে। নগুয়েন বুঝতে পারছে পিংকির সঙ্গে কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি কিন্তু একই সঙ্গে এরকমও তার বোধ হচ্ছে মেয়েটার ধারেকাছে ঘেঁষাটাই হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

অবশেষে রেস্ট লন সেমিট্রিতে গাড়ি থামাল নগুয়েন। এখানে টড গ্রীন এবং

কেথি বেকারকে কবর দেয়া হয়েছে। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। গোরস্তানের গেটে তালা মারা। তবে ওর গাড়িতে তালা খোলার যে যন্ত্রটি রয়েছে তা দিয়ে সে সেকেণ্ডের মধ্যে যে কোন সাধারণ তালা খুলে ফেলতে পারবে। গোরস্তানে অনুপ্রবেশ করার সময় কোন পুলিস তাকে দেখে ফেললেও ক্ষতি নেই। ব্যাজ দেখিয়ে বলবে সে নিজের পুলিসি দায়িত্ব পালন করতে এসেছে।

আমি খুন হওয়া ভিক্টিমদেরকে জেরা করতে এসেছি। ওরা হয়তো কোন তথ্য আমাকে দিতে পারবে।

আসলে কেন যে গোরস্তানে এসেছে তা নিজেই জানে না নগুয়েন। তবে সে যখন তালা খুলে ফেলল, ক্যাচকোচ শব্দে আপত্তি তুলে উন্মোচিত হলো কবরস্তানের ফটক, নগুয়েনের মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির করে উঠল। কেউ যেন হিমশীতল একটা হাত রেখেছে ওখানটায়। পল্লবী কেয়ার একশো হাতের মধ্যে যেমন সে ঘেঁষতে চায় না, এখানেও ওর থাকার আদৌ ইচ্ছে নেই। সে এক জীবনে শতাধিক মানুষের মৃত্যু দেখেছে। ভিয়েতকংদের ছোঁড়া রকেটে নিহত সহকর্মীদের ছিন্নভিন্ন লাশের মাঝ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়েও তার বুক কাঁপেনি। কিন্তু এখন, এই গোরস্তানে ঢুকতে গিয়ে তার কলজেটা ধড়াশ ধড়াশ করছে অজানা ভয়ে। সে খোলা গেট দিয়ে ভেতরে পা রেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো শিরদাঁড়ার বরফশীতল হাতটা খপ করে চেপে ধরল ওর হৃৎপিণ্ড। সেই দুই কিশোরের রক্ত থেকে গজিয়ে ওঠা সবুজ শ্যাওলার মত ঘিনঘিনে জিনিসটার কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারছে না নগুয়েন। গত হপ্তায় জিম ক্লাইনের বাড়িতে গুলিতে নিহত ছেলে-মেয়ে দুটোর লাশ দেখে তার খুব খারাপ লাগছিল। এখন মনে হচ্ছে ওদের মৃত্যুতে তার বরং স্বস্তিবোধ করাই উচিত।

টড এবং কেথির সমাধিস্তম্ভ খুঁজে পেতে দেরি হলো না। ছোট কবর, বেদীর ওপরে এখনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফুল পড়ে আছে। কবর দুটি পাশাপাশি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুটো কবরের মাঝখানে, সবুজ ঘাসের ওপরে বসল নগুয়েন। নিজেকে আবার প্রশ্ন করল–আমি কেন এখানে এলাম?

তার মনে হচ্ছিল সে জরুরি কী যেন একটা মিস করে যাচ্ছে।

সে পিংকির হুমকি ভুলতে পারছে না।

আমার পিছু নেয়া বন্ধ করুন। আমার যা করণীয় তা আমাকে করতে দিন। যা ঘটছে তা যখন আপনি জানবেন এবং বিশ্বাস করতে শুরু করবেন, ততক্ষণে আপনি মরে ভূত হয়ে গেছেন।

পল্লবী কেয়া কী করতে চলেছে? জেনির অসমাপ্ত কাজটা শেষ করবে? দানবগুলোকে হত্যা করবে? পিংকিকে সে দেখেছে মুখে লেগে থাকা রক্ত মুছে নিতে। মেয়েটা আসলে কার দলে?

দমকা একটা হাওয়া বইল, কাছের গাছগুলোর ডালপালার মাঝ দিয়ে মৃদু গোঙানির আওয়াজ তুলে চলে গেল। তবে বাতাসটা মরে গেলেও গোঙানির শব্দ থামল না। মনে হলো আর্তনাদের ধ্বনি ভেসে আসছে সমাধিস্তম্ভ থেকে, ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে, যেন তীব্র যন্ত্রণায় কাতর কোন মানুষ গোঙাচ্ছে। জায়গায় বসে রইল নগুয়েন। পাঁজরের গায়ে নিঃশব্দে এবং দ্রুত বাড়ি খাচ্ছে

হৃৎপিণ্ড।

এ গোঙানি বাতাস সৃষ্টি করেনি।

শব্দটা আসছে তার পাশ থেকে।

তার নিচে থেকে।

'রক্ষা করো, লর্ড বুদ্ধ,' ফিসফিস করল নগুয়েন।

সে টড গ্রীনের কবরের দিকে মাথা বাড়াল। মাটির নিচ থেকে সত্যি কাতর ধ্বনিটা ভেসে আসছে কিনা পরখ করতে জমিনে কান পাতল না নগুয়েন। তার আসলে ভয় করছিল–ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু নগুয়েনের মনে হচ্ছিল সে মাটিতে কান পেতে গোঙানির উৎস শুনতে গেলেই জমিন ফেড়ে বেরিয়ে আসবে একটা হাত এবং তাকে টেনে নিয়ে যাবে পাতালের গহীন অন্ধকারে। অথবা হাতটা তার কান ছিঁড়েও নিয়ে যেতে পারে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ট্রান কুয়ান নামে যে নিষ্ঠুর সৈনিকটা ছিল, তার প্রধান শখ ছিল ভিয়েতকংদের হত্যা করে তাদের কান কেটে সংগ্রহ করা। একবার নগুয়েন স্বচক্ষে দেখেছে লোকটা নিজেদের দলের নিহত সহকর্মীদের কান কেটে পকেটে পুরছে। নগুয়েন সবসময় ভয়ে থাকত তার নিজের কান জোড়া না জানি কবে কাটা যায়।

আবার শোনা গেল গোঙানির আওয়াজ।

'যীশাস!' ফিসফিস করল নগুয়েন। ভয় পেলে বা সংকটকালে সে সবসময় বুদ্ধ এবং যীশুর নাম স্মরণ করে।

মাটির নিচ থেকেই গোঙানি ভেসে আসছে। ছয় ফুট মাটির নিচ থেকে। নগুয়েন আপন মনে বলল ওখানে বাক্সের মধ্যে টড গ্রীনের লাশ শুয়ে আছে। কাজেই ওখান থেকে গোঙানির শব্দ আসতেই পারে না। আর আওয়াজটা ঠিক মনুষ্য কণ্ঠের মতও লাগছে না, বরং মনে হচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী, ক্ষুধার্ত কোন জানোয়ার অমন শব্দ করছে।

লাফ মেরে খাড়া হলো নগুয়েন, এক ছুটে কবর থেকে বিশ হাত দূরে সরে গেল। এখান থেকে আর শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। আসলে কোন শব্দই শোনা যায়নি। পুরোটাই ছিল তার কল্পনা, ভাবল নগুয়েন।

তবু কুড়ি কদম এগিয়ে টডের কবরের পাশে এসে দাঁড়াল সে, এবং কানে ভেসে এল সেই অপার্থিব, ভৌতিক আওয়াজ। 'থামো!' মাটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিল নগুয়েন।

থেমে গেল গোঙানি।

ঘুরল নগুয়েন, ছুটল নিজের গাড়ির দিকে। চালু করল ইঞ্জিন, হাই স্পীড তুলে গোরস্তানের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। পল্লবী কেয়ার সঙ্গে তার দেখা করতেই হবে, বলতে হবে কথা। সে পিংকি মানুষ থাকুক আর না-ই থাকুক। হয়তো শেষতক মেয়েটাকে সে হত্যা করতে বাধ্য হবে।

যদি না সে ইতিমধ্যে নিজেই খুন হয়ে গিয়ে থাকে।

উনিশ

তার খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় বেসমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। কী কারণে যেন বেসমেন্টের বাতিটা জ্বলছে না। অন্ধকারেই তাকে আহার করতে হয়েছে। ওপরতলা থেকে আসা আলোর ফলা তার চোখ বিদ্ধ করল বর্শার মত জ্বালা করে উঠল। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা–তার দিকে সবার অপলক দৃষ্টি দলটার সামনে জিম নামে এক তরুণ।

'আমরা এখন মিটিং করব,' বলল জিম নামের তরুণ।

সে সিধে হলো। লক্ষ করল তার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে রক্তে। তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে টুকরো টুকরো মাংস। মাংসগুলো কোত্থেকে পেয়েছে ঠিক মনে নেই তার, তবে খেতে চমৎকার লেগেছে–রক্ত এবং মাংস। তার মনে পড়ছে তার মাথার ভেতরে হাতুড়ি বাড়ির মত শব্দ হত। এখন আর শব্দটা নেই। খুব ভাল কথা। দুমদুম শব্দগুলো তাকে ভীষণ কষ্ট দিত। সে সিঁড়িতে পা বাড়াল।

'আমি তোমাদের মিটিংয়ে যোগ দেব,' বলল সে।

'আগে পরিষ্কার হয়ে নাও,' জিম নামের তরুণ বলল।

'আগে আমি পরিষ্কার হয়ে নেব,' বলল সে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল সে, তারপর আরেক সারি সিঁড়ি বেয়ে একটি ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটি তার নিজের বলে চিনতে পারল সে। এ ঘরের নাম বেডরুম, এ ঘরের মালিক পল্লবী কেয়া পিংকি নামের একটি মেয়ে। পিংকিকে সে চেনে। সে-ই পিংকি। পিংকির শরীরে সে-ই ছিল। এখনও আছে। তবে পিংকির শরীর এবং কাপড়চোপড়গুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। সে ঘরে একা তবে জানে তার করণীয় কী। তাকে যে কাজটি করতে হবে তার নাম গোসল। আর এজন্য গোসলখানা নামে একটি জায়গায় তাকে যেতে হবে। ওটার আরেকটি নাম আছে–বাথরুম। ওটা ওই তো ওখানে। সে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছে। আগে গায়ের রক্ত ধুয়ে ফেলা দরকার।

গোসলখানার পানিটা বেশ গরম, একটু আগে পান করা উষ্ণ রক্তের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। এ মুহূর্তে তার রক্ততৃষ্ণা নেই, তবে পরে তেষ্টা জাগবে। তখন রক্তের প্রয়োজন হবে। তাকে সবসময়ই রক্ত খেতে হবে মাথার ভয়াবহ দপদপানি থেকে মুক্ত থাকার জন্য। মিটিংটি কী নিয়ে তা সে অনুমান করতে পারে। আরও রক্তের জোগান কী করে মিলবে তা নিয়ে বসবে আলোচনা সভা। সে পরিচ্ছন্ন হয়ে যোগ দেবে মিটিংয়ে।

জলের ধারা ধুয়ে দিল রক্ত। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রোব নামে একটি জিনিস দেখতে পেল। গোসল করার পরে পল্লবী কেয়া সর্বদা রোব জড়িয়ে নিত গায়ে, সে-ও রোব পরল। হলুদ রঙের রোব। তার চুল ভেজা। সে আয়নায়

তাকাল। কোন রক্ত লেগে নেই গায়ে। আয়নায় তার দাঁত দেখা গেল। যখন আবার জাগবে রক্ততৃষ্ণা, তখন এ দাঁতগুলো তার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে।

আয়নার সামনে, বাথরুমের কাউন্টারের ওপর একটি জিনিস রাখা আছে। ওকে বলে ছবি। ছবিটি তুলে নিল সে। কয়েকজন লোকের ছবি। মানুষগুলোকে চিনতে পারল সেঃ পল্লবী কেয়া, জেনি বার্টন, জর্জ উইনস্টন। ওরা একে অন্যের হাত ধরে রেখেছে, হাসছে সবাই। ওদেরকে দেখে মনে হচ্ছে–শব্দটা মনে করতে সময় নিল সে, অবশেষে মনে পড়ল–সুখী। সুখী মানুষ, সুখী শরীর। শব্দটা জানে সে তবে অর্থটা জানা নেই। তার মতে সুখী মানে মাথার মধ্যকার বিকট শব্দটা বন্ধ হওয়া এবং রক্ত পান করা। সে ভাবল সে সুখী। সুখী এবং পরিচ্ছন্ন।

কাউন্টারের ওপরে আরও কী একটা জিনিস আছে।

সোনালি রঙ, দেখতে কাআতুর মত, শুধু মাথাটা নেই। কাআতু কী জিনিস সে জানে। সে একজন কাআতু। সে দুনিয়ার একটি অংশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পল্লবী কেয়ার শরীরের আকৃতি বদলে গিয়ে কাআতুতে রূপান্তর ঘটবে। অবশ্য এজন্য তার প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হবে। একজন সম্পূর্ণ কাআতু হতে হলে দরকার প্রচুর রক্ত, অনেকগুলো হত্যা। সে কথাটা জানে। এ তার নিয়তি।

কিন্তু সে বুঝতে পারল না কেন হঠাৎ করে কবচটা গলায় পরে নিল।

হতে পারে এটা তার আরেকটি নিয়তি।

কবচটা গলায় পরার সঙ্গে সঙ্গে দারুণভাবে কেঁপে উঠল তার গোটা শরীর, দুনিয়ার সঙ্গে তার সংযোগ এবং ওখানে যত কাআতু ছিল, নিমিষে সবকিছু দৃশ্যমান হয়ে উঠল তার কাছে। সে দেখতে পেল লাল রঙের ভুতুড়ে একটি ফিতে বৃত্তাকারে জড়িয়ে রেখেছে বাড়িটি এবং ওখানে সকল কাআতু জড়ো হয়েছে। ফিতেটা যেন উড়তে উড়তে চলে গেল আকাশে, প্রবেশ করল মহাশূন্যের গভীরে, চলে গেল সেই সুদূরে যেখানে দুনিয়ার টিকে থাকা কিছু কোষ দুর্ঘটনাকবলিত গ্রহাণুপুঞ্জের অতল আঁধারের মাঝে এলোমেলোভাবে অবস্থান করছে। ওরা তাকে ডাকছে, সে-ও ওদেরকে আহ্বান করছে। ওরা ভীষণভাবে চাইছে সে যেন ওদের অংশ হয়ে থাকে এবং শত্রুর মাঝে ছড়িয়ে দেয় রক্তস্রোত যারা একদা ধ্বংস করেছে দুনিয়া।

কিন্তু তাকে আরও কেউ ডাকছে, এ শরীরের অধিকারী একটি কণ্ঠ। এ হলো পল্লবী কেয়ার কণ্ঠ, তার চিন্তাভাবনাগুলো তাকে ডাকছে। এ পিংকির হৃৎপিণ্ডের শব্দ, শরীরের গভীরে স্পন্দিত হয়ে চলেছে, ধকধক শব্দ করছে, তবে মস্তিষ্কের ভেতরে সেই অবর্ণনীয় যন্ত্রণার মত নয় যা রক্ত না পেয়ে পাগল হয়ে ওঠে, এ শব্দগুলো সে শুনতে পাচ্ছে, শত্রুর অনুভূতি নিয়ে।

কিন্তু শত্রুটা কে?

কে কার ওপর হামলা করেছে?

ওরা আমাদেরকে আক্রমণ করেছে।

আমরা। মানব সম্প্রদায়।

লাল ফিতেটা ভৌতিক বেগুনি রঙ ধারণ করল, পৃথিবীর সীমাহীন পথের

দিকে ক্রমে আবছা হয়ে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ করে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলল পিংকি।

হ্যাঁ, পল্লবী কেয়া। তার মনে পড়ে গেল সে কে, কোত্থেকে এসেছে। সে মানুষ, কাআতু নয়। সে শত্রু নয়। শত্রু হলো ওরা। ওরা সবাই শয়তান। সবক'টা দানব।

'জর্জ,' ফিসফিস করল সে। চোখে অশ্রু জমল তার, আয়নায় দেখতে পাচ্ছে সে। তবে জলধারা গালে গড়িয়ে পড়তে দিল না। জর্জ মারা গেছে–তাকে নিয়ে এখন আর সে ভাবতে চাইছে না। জর্জের কী দশা সে করেছে তা-ও মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিল। এতসব চিন্তা মাথায় থাকলে সে তার কাজই করতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে।

তবে বলা সহজ করা কঠিন। বমি বমি লাগছে তার। টয়লেটে চলে এল সে, হড়হড় করে বমি করল। চিবিয়ে খাওয়া লাল মাংসের টুকরোগুলো বমির সঙ্গে উগরে দিল।

'জর্জ,' উঁউঁ করে কাঁদতে লাগল সে।

মগজে আবার সেই ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল।

এবারে যন্ত্রণাটিকে স্বাগত জানাল সে।

ঘুরল পিংকি, এক ছুটে চলে এল বেডরুমের ক্লজিটের সামনে। পাঁচ গ্যালনের বড় বোতলগুলোর সঙ্গে গ্যাসোলিনের ছোট বোতলগুলো একসঙ্গে রাখতে সমস্যা হচ্ছিল বলে ও আড়াই গ্যালনের আটটি বোতল ক্লজিটে, জামা-কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। দাদুর ছিন্নভিন্ন শরীর কবর দেয়ার পরে আরেকটা ফিউজ জোগাড় করে ওঠার সময় সে পায়নি। তবে ফিউজের দরকার হবে না, এ বোতলগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিলেই হবে। সবগুলো বোমার মত বিস্ফোরিত হবে। পুড়ে ছাই হবে এ বাড়ি, সে সঙ্গে দানবের দল।

পিংকি স্বস্তি নিয়ে দেখল তার গ্যাসোলিনের বোতলগুলো যথাস্থানেই রয়েছে। ওরা এখানে খুঁজতে আসার কথা হয়তো ভাবেনি।

ক্লজিটের দরজা বন্ধ করে দিল পিংকি। ডেস্কে লাইটার খুঁজতে শুরু করল। এবারে ভাগ্য সহায়তা করল ওকে। একটি ব্যাগে তিনটে নতুন লাইটার পেয়ে গেলঃ লাল, সাদা এবং নীল। ও লাল লাইটারটি পছন্দ করল। ব্যাগের প্লাস্টিক ছিঁড়ে বের করে নিল ওটা।

প্লাস্টিক।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যালকনিতে, স্ক্রিন ডোর দিয়ে ভীত চকিত মুখে উঁকি দিচ্ছে। বাড়ি উড়িয়ে দিলে কুকুরটাও তো মারা যাবে ভাবল পিংকি। গোটা মানবজাতিকে দানবের কবল থেকে বাঁচানোর বিনিময়ে একটা কুকুরের জীবন নিশ্চয়ই মূল্যবান নয়। তবে জানোয়ারটার জন্য ওর মায়া লাগল। এর আগে প্লাস্টিককে সে তো প্রায় মেরেই ফেলতে যাচ্ছিল। দ্রুত পা ফেলে স্ক্রিন ডোরের কাছে চলে এল পিংকি, নিঃশব্দে খুলল দরজা। প্লাস্টিক বোধহয় পিংকির আগের ভীতিকর আচরণের কথা ভুলে গেছে। পিংকি ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসতে সে জিভ বের করে চেটে দিতে লাগল মেয়েটির হাত।

'শ্‌শ্‌,' মৃদু গলায় বলল পিংকি। 'এখানে তোর থাকা চলবে না। সাঁতার কাটতে যা।' আঙুল তুলে দেখাল। 'পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সাঁতার কাটো। যাও, প্লাস্টিক। এখান থেকে ভাগো।'

প্লাস্টিক ভাগল না। লেকের পানিতে ঝাঁপ দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। পানি তার দু'চক্ষের বিষ এবং সাঁতার কাটার বিষয়টি সে মোটেই পছন্দ করে না। কুকুরটাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছে পিংকি, এমন সময় বেডরুমের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল জিম। একা। ক্লজিটের দিকে আড়চোখে তাকাল পিংকি। দরজা বন্ধ করেছে সে তবে তালা লাগায়নি।

'আমরা মিটিং শুরু করতে যাচ্ছি,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল জিম।

কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হলো পিংকি। চেহারা এবং কণ্ঠ ভাবলেশশূন্য রাখার চেষ্টা করল। 'আমি আসছি।'

'এখুনি এসো।'

বেডরুমে ঢুকল ও। প্লাস্টিক ব্যালকনিতেই রয়ে গেল। 'আমি পোশাক পরব,' বলল পিংকি।

'যা পরে আছ তাতেই চলবে,' ওকে দেখছে জিম। 'সময় নেই। মিটিং এক্ষুণি শুরু হবে।'

'এক মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলল পিংকি। ভাবছিল কাআতুরা নিজেদের মধ্যে কখনও তর্ক করে কিনা। ডেস্কের খোলা দেরাজ ঘুরে ওর দৃষ্টি স্থির হলো জিমের ওপর। এক বক্স ভোঁতা পেন্সিলের ওপরে সে লাইটারের ছেঁড়া প্যাকেটটা রেখেছে। তবে লাল লাইটারটা বাম হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রেখেছে পিংকি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশা ওর। ডেস্কের দিকে পা বাড়াতে চায় না জিমের দৃষ্টি আকর্ষণ হবার ভয়ে, কিন্তু ডান দিকের টপ ড্রয়ারে সে হান্টিং নাইফটা রেখে দিয়েছে। যেভাবে জিম ওর দিকে তাকাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ছুরিটার শীঘ্রি প্রয়োজন হবে।

'তোমার গলায় ওটা কী?'

জিজ্ঞেস করল জিম।

ধ্যাত! কবচটা।

'কী?' প্রশ্ন করল পিংকি। গলায় সোনার চেইনের স্পর্শ পাচ্ছে ও, চোখ নামিয়ে কবচটা না দেখলেও চলে। ডেস্কের দিকে পা বাড়াল পিংকি।

'তুমি গলায় কী পরেছ?' আবার জানতে চাইল জিম।

'এটা একটা ডেকোরেশন,' জবাব দিল পিংকি। আরেক কদম বাড়ল ডেস্কের দিকে। জিমও ওর দিকে এগিয়ে গেল।

'দেখে মনে হচ্ছে কাআতু।' বলল সে।

'হুঁ।'

'কোথায় পেলে?' জিজ্ঞেস করল জিম।

'কী?'

'কবচটা তোমাকে কে দিয়েছে?' প্রশ্ন করল জিম।

অবশেষে ওটার দিকে তাকাল পিংকি, সোনালি চেইনটা স্পর্শ করে শাইনিং

ফিদারকে মনে মনে একটা ধন্যবাদ দিল। ওকে যদি মরতেই হয় অন্তত মানুষ হিসেবে মরতে পারবে।

'এক ইণ্ডিয়ান,' জবাব দিল পিংকি।

'কবে?' জিম অনেকটা এগিয়ে এসেছে, আর মাত্র দু'কদম দূরে।

'এইমাত্র,' বলল পিংকি।

'বুঝলাম না,' বলল জিম। 'এ ইণ্ডিয়ান থাকে কোথায়?'

'দেখাচ্ছি তোমাকে,' দ্রুত পদক্ষেপে ক্লজিটের সামনে চলে এল পিংকি ডেস্কের পাশ কাটিয়ে। তবে ছুরি নেয়ার জন্য হাত বাড়াল না। ক্লজিটে এক হাত রেখে বলল, 'সে এখানে লুকিয়ে আছে।'

এক লাফে পিংকির পাশে চলে এল জিম, টান মেরে খুলে ফেলল ক্লজিটের দরজা। ঠিক ওই মুহূর্তে এক কদম পিছিয়ে গেল পিংকি, এক টানে খুলে ফেলল ডেস্ক ড্রয়ার, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরল ছুরি। এদিকে গ্যাসোলিনের অতগুলো বোতল দেখে থতমত খেয়ে গেছে জিম। সুযোগটা কাজে লাগাল পিংকি। ছুরিটা তুলে নিল ও। কিন্তু জিম ড্রয়ার খোলার শব্দ পেয়েছে। পাঁই করে ঘুরল সে। আর ঠিক তখন পিংকি ছুরির ক্ষুরধার ফলা বসিয়ে দিল জিমের ঘাড়ে।

'বাঁচাও!' আর্তনাদ করে উঠল জিম। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল ওর কাঁধ। রক্তের রঙ গাঢ়, তাতে খানিকটা সবুজের আভাও রয়েছে। ছুরিটা ঘাড়ে পুরোপুরি গেঁথে গেছে। জিম টলতে টলতে পিছিয়ে গেল, দু'হাত দিয়ে ধরল ছুরির বাঁট। টেনে বের করার চেষ্টা করছে। এ সুযোগটাও হারাল না পিংকি। ওর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি কষাল জিমের দুই উরুর মাঝখানে। ব্যথায় চোখ উল্টে গেল ওর, চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। ঘাড় থেকে ঝর্ণার ধারায় বেরুতে থাকা রক্ত নিমিষে লাল করে দিল মেঝে।

'বাস্টার্ড!' হিসহিস করে উঠল পিংকি।

এক ছুটে বেডরুমের দরজায় চলে এল ও। ধাক্কা মেরে বন্ধ করে দিল কপাট। ওরা ইতিমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে শুরু করেছে। দ্রুত দরজার লক লাগিয়ে দিল পিংকি। তবে এ দরজা ওদেরকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। পিংকির অনুমানই ঠিক। প্রচণ্ড এক ঘুসি পড়ল দরজার গায়ে। কাঠ ফেটে যাবার শব্দ পেল ও।

ক্লজিটের দিকে ফিরে ছুট দিল পিংকি। মেঝেয় চিৎ হয়ে থাকা জিমকে লাফ মেরে ডিঙাল। জিম দুর্বল হাত দিয়ে ওর পা চেপে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। দ্রুত গায়ের বল হারাচ্ছে সে। শরীরের রক্ত তার চারপাশে একটা পুকুর তৈরি করছে।

'বাঁচাও!' গুঙিয়ে উঠল জিম।

ধাক্কার চোটে আবার কেঁপে উঠল দরজা। ওরা যে কোন সময় দরজা ভেঙে ঢুকে পড়বে ঘরে।

ক্লজিট ডোর খুলে গ্যাসোলিনের একটা বোতল হাতে নিল পিংকি। সজোরে ছুঁড়ে মারল মেঝেতে। প্লাস্টিক ফেটে গিয়ে গলগল করে গ্যাসোলিন পড়তে

লাগল। দ্রুত ছড়িয়ে গেল গোটা মেঝেয়। ভিজিয়ে দিল পিংকির রোবের নিচের অংশ। বিক লাইটারটা জ্বালল ও। কমলা রঙের শিখা ছোট একটা সূর্যের মত জ্বলতে লাগল চোখের সামনে। পিংকি তাকাল জিমের দিকে। মারাত্মক আহত জিম ওকে বিষদৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

'তোমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক লাখ বছর অপেক্ষা করেছ,' বলল পিংকি। 'বেহুদাই নষ্ট করেছ সময়। তোমরা ব্যর্থদের দল। তোমরা একটা মৃত পৃথিবী থেকে আসা কতগুলো মড়ার মাথা।' বিরতি দিল ও, শয়তানী হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আশা করি মরার সময় নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।'

ঝুঁকল পিংকি। গ্যাসোলিনের পুকুরের কিনারে ধরিয়ে দিল আগুন। চোখের পলকে লকলকে অগ্নিশিখা ছুটল ক্লজিট লক্ষ করে, গ্রাস করল ওয়ার্ডরোব এবং গ্যাসোলিনের বোতলগুলো। পিংকির বাথরোবেও আগুন ধরে গেছে কিন্তু নেভানোর চেষ্টা করল না ও। বেডরুমের দরজা একদিকে কাত হয়ে গেল, কাঠের ছিলকা ছড়িয়ে প্রচণ্ড একটা মুষ্ঠি গর্ত তৈরি করল কপাটে। ঘুরল পিংকি, দৌড় দিল ব্যালকনির দরজায়।

ভাগ্যিস দরজাটা ও খোলা রেখেছিল।

পিংকি মাত্র দোরগোড়া পার হয়েছে, এমন সময় প্রায় একই সঙ্গে ঘটল দুটো ঘটনা। ভেঙে গেল বেডরুমের দরজা এবং হুড়মুড়িয়ে দানবদের সামনের দলটা ঢুকে পড়ল ঘরে। আহত নেতাকে মাত্র এক ঝলক দেখার সুযোগ পেল তারা। কারণ তক্ষুণি ক্লজিটে রাখা পিংকির বিকল্প বোমা অর্থাৎ গ্যাসোলিনের বোতলগুলো একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো।

যেন দানবের বিরাট হাতের একটা চড় খেল পিংকি এমনই প্রচণ্ড শক ওয়েভের ধাক্কা। ধাক্কার চোটে ব্যালকনি থেকে পড়ে গেল ও। পরমুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দানবীয় হাত আবারও আঘাত হানল। দ্বিতীয় শকওয়েভের ধাক্কায় ছিটকে লেকের ওপরে উঠে গেল পিংকি। তবে ও বুঝতে পারছিল দোতলার বিস্ফোরণের কারণে বেসমেন্টের বোমাটিও বিস্ফোরিত হয়েছে।

একসঙ্গে ষাট গ্যালন গ্যাসোলিনের বিস্ফোরণ ঘটেছে। ওয়াও!

তারপর তৃতীয় শকওয়েভের বাড়ি খেল পিংকি। এ শকওয়েভটির তুলনা হয় না। ধ্বংস ক্ষমতায় আগের দুটি এর কাছে কিছুই না। ভয়াবহ ধাক্কার চোটে আকাশে উড়াল দিল পিংকি, ছুটে চলল চাঁদের দিকে—নক্ষত্রপুঞ্জের বেল্ট অভিমুখে সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে। তবে পিংকি বুঝতে পারছে কী ঘটেছে। বিস্ফোরিত হয়েছে প্রোপেন ট্যাংক। এ বিস্ফোরণের কবল থেকে কারও বেঁচে থাকার কোনই সুযোগ নেই। দানবগুলো নিশ্চয়ই সবগুলো ধ্বংস হয়েছে। ওপরে উঠতে উঠতে অকস্মাৎ নিচের দিকে পতন শুরু হলো পিংকির মাধ্যাকর্ষণের টানে। নিচের কৃষ্ণকালো পানিতে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে ও, যেখান থেকে সব ঘটনার শুরু এবং শেষও ঘটতে যাচ্ছে।

পল্লবী কেয়া পিংকির বাড়ি থেকে দুশো গজ দূরে লেফটেনেন্ট নগুয়েন, এমন

সময় বিস্ফোরণটা হলো। প্রথমে উড়ে গেল দোতলা, তারপর ভেতর থেকে যেন উৎক্ষিপ্ত হলো একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, অবশেষে বাড়ির সাদা ট্যাংকটি খুদে আণবিক বোমার শক্তি নিয়ে বিস্ফোরিত হলো। ব্যাঙের ছাতার মত আগুনের একটা মেঘ উঠে গেল তারার রাজ্যে, নগুয়েন সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে থামাল গাড়ি। মনে হলো এক পলকের জন্য যেন সে দেখতে পেয়েছে একটা জ্বলন্ত শরীর হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে লেকের গায়ে আছড়ে পড়ছে। চোখ পিটপিট করল সে। নাহ্, শরীরটা কোথাও নেই। পানিতে পড়লে শব্দ হত। সেরকম কোন শব্দও সে শোনেনি। তাহলে কি পুরোটাই দৃষ্টিভ্রম?

গাড়ি থেকে নেমে এল নগুয়েন। হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠা রাতের আঁধারের মধ্যে দাঁড়াল। দেখছে দাউ-দাউ জ্বলছে পল্লবী কেয়ার বাড়ি। রেডিওতে সাহায্য চাইল না নগুয়েন। পয়েন্ট শহরের সবাই নিশ্চয়ই বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে। তাছাড়া বাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাক তা-ই সে চায়। ও বাড়ির ভেতরে যারা আছে তারা পুড়ে সব ছাই হোক এটাই তার কামনা। কারণ পল্লবী কেয়া এটাই চেয়েছিল। নগুয়েন জানে পিংকিই ওদেরকে শেষপর্যন্ত ধ্বংস করেছে। তবে ওরা আসলে কী ছিল তা হয়তো কোনদিনই জানতে পারবে না সে। কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ছিল সে ব্যাপারে নগুয়েনের কোন সন্দেহ নেই।

আগুনের কমলা আলোয় মাথা নোয়াল নগুয়েন, জেনি বার্টন এবং পল্লবী কেয়া পিংকির উদ্দেশে স্যালুট ঠুকল।

উপসংহার

তিন মাস পর

পয়েন্ট লেকের তীর ঘেঁষে হাঁটছে লেফটেনেন্ট নগুয়েন। এখান থেকে পল্লবী কেয়ার বাড়িটি খুব বেশি দূরে নয়। যদিও ও-বাড়ি তিন মাস আগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন শীতকাল। পিংকিদের পোড়াবাড়ির যে ধ্বংসস্তূপ এখন দাঁড়িয়ে আছে, সে কালো কংকালটা ঢেকে দিয়েছে বরফের চাদর। দূর থেকে বাড়ির উঁচু একটা খাম্বা আর ব্যালকনির খানকয়েক তক্তা চোখে পড়ে শুধু। একটা ঝড়-ঝাপটা এলে এগুলোও টিকে থাকতে পারবে না। হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাবে। তখন পিংকিদের বাড়ির কোন চিহ্নই আর রইবে না।

নগুয়েন বাড়িটির খুব একটা কাছে গেল না। বাড়িতে আগুন নেভার পরে বত্রিশটি লাশ উদ্ধার করে পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা লাশগুলোর সকলেই ছিল পয়েন্ট হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। কেউ জানত না বিস্ফোরণের সময় পিংকিদের বাড়িতে এতগুলো মানুষ ছিল। লাশগুলো পুড়ে

কয়লা হয়ে যায়। কাউকে চেনার জো ছিল না। তবে পোস্টমর্টেমে তাদের দাঁত পরীক্ষা করে সনাক্ত করা যায় পরিচয়। তালিকায় ছিল জিম ক্লাইন, ল্যারি জুরের, ক্যারল ম্যাকফারল্যাণ্ড সহ আরও অনেক নাম। জর্জ উইনস্টনও মারা গেছে দেখে যারপরনাই দুঃখ পেয়েছিল নগুয়েন। এক্সপার্টরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের সময় শুধু জর্জই ছিল বেসমেন্টে। তার ছিন্নভিন্ন শরীরের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে কবর দেয়া হয়।

তবে পল্লবী কেয়ার কোন সন্ধান মেলেনি।

এমনকী লেকের পানিতেও না। লেকে ডুবুরি নামিয়েও পিংকির কোন খোঁজ পায়নি নগুয়েন।

'যাসনে, মেয়ে,' কুকুরটাকে ডাকল সে। এ কুকুরের মালিক ছিল পিংকি এবং তার দাদু প্রীতম চৌধুরী। বিস্ফোরণের রাতে জানোয়ারটাকে রাস্তায় ঘুরতে দেখে নগুয়েন। গা ভেজা। বিস্ফোরণে তার শ্রবণশক্তির মস্ত ক্ষতি হয়েছে। এখনও ভাল মত শুনতে পায় না প্লাস্টিক। নগুয়েন পিংকির বান্ধবীদের কাছ থেকে কুকুরটার নাম জেনেছে। মাঝে মাঝে সে ওকে নাম ধরে ডাকে। 'পানিতে নামবি না।' হুকুম করল নগুয়েন। 'তেল লেগে যাবে পায়ে।' নিজের এলাকাকে বিদায় জানাতে এসেছে সে। ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাচ্ছে। অনেকেই পয়েন্ট ত্যাগ করছে। এ শহর ক্রমে ভৌতিক শহরে পরিণত হচ্ছে। অতগুলো ছেলে-মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু তাদের পরিবারগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। এ শোক এবং ক্ষতি পূরণ হবার নয়। যে জায়গা প্রতিটি মুহূর্তে সন্তান হারানোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় সেখানে নিঃশ্বাস নেয়ার মত কষ্ট কিছুতে নেই।

তাছাড়া এ শহরে অজানা একটি আতংক ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে। অজানা কোন প্রাণী এ ভীতির উৎস। হঠাৎ হঠাৎ হামলা চালাচ্ছে সে।

অজানা প্রাণীটির হামলার প্রথম শিকার ফিলিপ ফ্রেজিয়ার নামে এক ট্রাক চালক। শহরে বিস্ফোরণ ঘটার মাস দেড়েক বাদে ফিলিপ তার কোম্পানি ট্যাংক চালিয়ে আসছিল। ওটা একটা প্রোপেন ট্যাংকার, আসন্ন শীতের জন্য এলাকার ট্যাংকগুলোতে রিফুয়েলিং-এর জন্য এসেছিল ফিলিপ। হঠাৎ সে হামলার শিকার হয়। কীসে তাকে হামলা করেছিল তা সে জানে না। বলেছে তার ক্যাবের ছাদ থেকে হামলাটা এসেছিল। খুব শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী কিছু একটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণী বা জিনিসটাকে দেখতে পায়নি ফ্রেজিয়ার। পুলিশ তার গল্প বিশ্বাস করেনি। তবে ফ্রেজিয়ার কসম খেয়ে বলেছে সব সত্য।

হামলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে ফিলিপ ফ্রেজিয়ার। তার ট্রাকটি চুরি যায়। তবে চুরি যাওয়া ট্রাক খুঁজে পেতে বেশি সময়ও লাগেনি। ওই দিন সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের ঠিক পরপর, পাহাড়ের ওপরের তেলকূপগুলোয় বিস্ফোরণ ঘটে। ধারণা করা হয় চোর ট্রাক চালাতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে চড়াও হয়েছিল তেলকূপগুলোর গায়ে। সম্ভবত পেছন থেকে এসেছিল ধাক্কাটা, খুদে অয়েল ফিল্ডের মাঝখানে রাখা প্রোপেন ট্যাংক সে ধাক্কা সইতে না পেরে বিস্ফোরিত হয়। দুটো তেলকূপে তাৎক্ষণিকভাবে ধরে যায় আগুন, সাহায্য আসবার আগেই বাকিগুলোও দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। যেন গালফ ওঅরের পরে কুয়েত

অয়েল ফিল্ডগুলো আবার জ্বলতে শুরু করেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে এক্সপার্টদের নিয়ে আসা হয় আগুন নেভাতে। তাদের আগুন নেভাতে অনেক দিন সময় লেগেছে।

পাহাড়ে মোট ছ'টা পাম্পিং অয়েল ছিল। এছাড়াও আরও ছ'টা কুয়ো ছিল যা থেকে পাম্প করা ছাড়াই প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া যেত। মাটির তলে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাপের ফলে আপনা-আপনি কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসত তেল। এ ছ'টি কুয়ো এবং তেল মজুত করার ট্যাংক—সবকিছুই প্রোপেন ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ফুটো হয়ে যায়। তবে তাতে আগুন ধরেনি। ফুটো ট্যাংক থেকে স্রোতের ধারায় তেল গিয়ে পড়তে থাকে পয়েন্ট লেকে। বেশ কয়েকদিন এরকম চলেছে। আগুনের শিখায় লেকের কালো পানি তখন আর দেখা যায় না। তবে আগুন না নেভানো পর্যন্ত তেল পড়ার গতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। ততদিনে পয়েন্ট লেক তেলে মাখামাখি। পানি পরিষ্কার করতে কর্তৃপক্ষের কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আগামী বসন্তে লেকটির পানি সেচে ফেলা হবে।

এসব কারণেই পয়েন্ট বর্তমানে ভৌতিক শহরে পরিণত হয়েছে। কেউ এখানে থাকতে চাইছে না। তবে শহর ছেড়ে যাবার আগে টড গ্রীনের কবরে একবার ঢুঁ মারবে নগুয়েন। ওর কবরের নিচে কী ঘুমিয়ে আছে সে রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করা দরকার। যদিও কাজটা করতে সায় দিচ্ছে না মন। কেমন ভয় লাগে।

'চলে এসো, প্লাস্টিক,' হাঁক ছাড়ল নগুয়েন। তৈলাক্ত তীর ছেড়ে গাছ-গাছালির দিকে পা বাড়াল। কুকুরটা সানন্দে অনুসরণ করল তাকে লেজ নাড়তে নাড়তে। প্রথম প্রথম পিংকি এবং তার দাদুকে খুব মিস করছিল প্লাস্টিক। তবে কুকুররা দ্রুত সবকিছু ভুলে যায়। এজন্য ওরা ভাগ্যবান।

'চল দেখি কোন শিকার-টিকার মেলে কিনা।'

জঙ্গলে প্রবেশ করল নগুয়েন। ওর বুটজুতোর চাপে পায়ের নিচের পাতলা বরফ ভাঙল মুড়মুড় করে। আলো কমে আসছে—কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিমে ডুব দেবে সূর্য। আরও আগে আসা উচিত ছিল তার, ভাবছে নগুয়েন। জমিন এদিকে খাড়া ঢালের চেহারা নিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে। নরম বরফে পাহাড় বাইতে অনেক ঝক্কি। শীঘ্রি হাঁপিয়ে গেল নগুয়েন, বেশ কয়েকবার বিরতি দিতে হলো তাকে। যদিও ওর শরীর একদম ফিট আছে। তবে এসব খোঁজাখুঁজি তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত ক্লান্ত করে তোলে। এ এলাকাকে শুধু বিদায় জানানো নয়, আরেকটি জিনিসের খোঁজেও এসেছে নগুয়েন।

ও মৃত প্রাণী খুঁজছে।

একটু পরে একটা লাশ চোখে পড়ল ওর।

কোথায় খুঁজতে হবে জানা থাকলে তার সন্ধান পাওয়া খুব একটা কঠিন হয় না।

জন্তুটা একটা মাদী হরিণ। খুবলানো শরীর। দাঁত এবং ছুরি ব্যবহার করে ওটার শরীর থেকে প্রায় সমস্ত মাংস তুলে নেয়া হয়েছে। লাশের গায়ের

চারপাশের বরফে রক্তের উজ্জ্বল ছোপ। হরিণীটা শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছে নগুয়েনের দিকে। হয়তো জানতেও পারেনি কীসে ওকে হত্যা করেছে।

ফিলিপ ফ্রেজিয়ারের গল্পটা বিশ্বাস করেছে নগুয়েন।

'নো, গার্ল,' রক্ত চাটতে যেতে থাবা মেরে প্লাস্টিককে বাধা দিল সে। 'ওই খাবারটা ভাল নয়। ওটা খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বি।'

নগুয়েনের দিকে তাকাল প্লাস্টিক, তার কথা যেন বুঝতে পেরেছে। সে অন্য কোন শিকারের জন্য ঘুরল এবং জমে গেল। ওর লেজটা খাড়া হয়ে উঠল। তবে হামলার জন্য লেজ খাড়া করেনি প্লাস্টিক। মৃদু গলায় ককিয়ে উঠল। ভয় পেয়েছে কুকুর।

'কী হয়েছে রে?' ফিসফিস করল নগুয়েন। জঙ্গল সার্চ করল কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই। তবু তার উলেন শার্টের নিচে শরীরটা ঘেমে গেল। তার মনে পড়ছে জিম ক্লাইনের শীতল চোখের চাউনি, পিংকির রক্ত চেটে খাওয়ার দৃশ্য, কেনের গবেষণাগারের সবুজ ফাঙ্গাসের বোটকা গন্ধ, রেস্ট লন গোরস্তানে মাটির নিচের গোঙানির আওয়াজ। ভৌতিক দৃশ্যগুলো যেন কোলাজ হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। নগুয়েনের মনে পড়ল বাড়িটি পুড়ে যাবার সময় লেকের ওপরে জ্বলন্ত একটা মূর্তিকে হাত-পা ছুঁড়তে দেখেছিল সে একপলক। পল্লবী কেয়ার লাশ খুঁজে পায়নি কেউ–কেউ জানে না সে কোথায় গেছে।

হরিণীর মরা চোখের দিকে আড়চোখে তাকাল নগুয়েন। গত দেড়মাসে এ নিয়ে দশ নম্বর জানোয়ারের লাশ সে আবিষ্কার করেছে জঙ্গলের এ অংশে।

এসব স্মৃতি তার ভেতরে প্রশ্ন তৈরি করে।

ওখানে কী আছে? কী ওকে লক্ষ করছে?

কিছু একটা।

তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন–সে কেন সন্ধ্যার সময়ে এ জঙ্গলে এল?

ভীষণ বোকার মত হয়ে গেছে কাজটা।

লেকের দিকে ফিরল নগুয়েন। ওদিক থেকে এসেছে সে। একটা হাত চলে গেল কোটের নিচে রাখা অস্ত্রে। তবে সে ভাল করেই জানে আক্রান্ত হলে এটা ব্যবহার করার সময়ও পাবে না। পিংকির কুকুরটিকে ডাকল সে।

'চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি, মেয়ে।'

কাছের একটা গাছের মগডাল থেকে একজোড়া রক্তচক্ষু লোকটা এবং তার জানোয়ারটাকে চলে যেতে দেখছে। চোখ জোড়ার পেছনে যে মনটা আছে তার ভেতরে জেগে উঠল লোভ। এক মুহূর্তের জন্য ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু ওটা ইতস্তত করল। একটু আগেই ওটা পেট পুরে খেয়েছে। এখনও খিদে পায়নি। তাছাড়া ওই লোকটার মধ্যে কী যেন আছে। আর দশটা সাধারণ মানুষের মত সে নয়। অন্যদেরকে সে যেভাবে হত্যা করেছে একেও সেই একইভাবে ফেলে দেয়া যাবে কিনা জানে না।

প্রাণীটা একটা বেগুনি থাবা তুলে তার কুঞ্চিত গলায় ঝোলানো স্বর্ণের চেইনটি স্পর্শ করল। তারপর চামড়ার ডানাজোড়া নেড়েচেড়ে মোটা ডালটিতে

আরাম করে বসল। সে জানে না মানুষ দেখলেই তার এরকম কেন হয়। গলা কবচটা কোত্থেকে এসেছে সে ব্যাপারে ওটার কোন ধারণা নেই। তার আসলে কিছুই মনে নেই, জানে না সূর্যের পঞ্চম গ্রহ তার জন্মদাতা। অনেক আগেই ও গ্রহের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সে স্রেফ বেঁচে আছে এবং খিদে পেলে শিকার করছে।

কিন্তু ওটা তার ধারালো নখ দিয়ে কবচ স্পর্শ করার পরে সিদ্ধান্ত নিল নাহ্, লোকটার ওপর সে হামলা করবে না। মানুষ হত্যা করা উচিত নয়। কে উচিত নয় সে জানে না। তবে কবচটা ধরে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কেমন ম খারাপের একটা ঢেউ তার মন ছুঁয়ে গেল। বিষয়টি তার আরও পরিষ্কার ক মনে পড়ল। মানুষ তার খাবার নয়। তাই সে মানুষ শিকার করতে পারবে না।

***